পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন বীরাঙ্গনা

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌স বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। গণহত্যার পাশাপাশি নারীদের ধর্ষণ, মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন ও দেশের সর্বত্র ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বিভিন্ন সেনা ক্যাম্প ও পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতন কেন্দ্রগুলো থেকে বহু নারীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সেসময় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এঁদের অনেকেই আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এই নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁদের বীরাঙ্গনা (রণাঙ্গনের বীর নারী) আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৭২ সালের ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধকালীন নির্যাতিত নারীদের এই বীরাঙ্গনা খেতাব প্রদান করে। ১৯৭২ সালেই নির্যাতিত নারীদের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ১৯৭২ সালে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০% পদ মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী অথবা যাদের আত্মীয়-স্বজন শহিদ হয়েছেন এমনসব নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখার আদেশ দেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় পুনর্বাসন কেন্দ্র। সমাজে বীরাঙ্গনা নারীরা চরম অবহেলা আর ঘৃণার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন। শেখ হাসিনার সরকার বীরাঙ্গনা নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির পাশাপাশি অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মতো ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা চালু করেন। বর্তমানে গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৩৯ জন। তাঁদের মহান ত্যাগের জন্য জাতি তাঁদের কাছে চিরঋণী।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

Patient Care Technique-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

নিগার সুলতানা
ডা. আইরিন বিনতে আজাদ
ডা. এম মুস্তাজিব হায়দার
মো: আসলাম পারভেজ
মো: শাওন কবির সিকদার
মো: আমানউল্লাহ
মুহ: আবদুর রাজ্জাক মিঞা (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

ড. নূরে মোজাম্মেল কিরণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)
প্রথম প্রকাশ : **নভেম্বর**, ২০২২

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হাওলাদার অফসেট প্রেস, ১ গোপাল সাহা লেন, সিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানবসম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ২৯টি ট্রেডের মধ্যে ১৩টি ট্রেডের ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

প্রথম পত্র (নবম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	পেশেন্ট কেয়ারে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা	১-১৮
দ্বিতীয়	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিকের প্রাথমিক ধারণা	১৯-৩৮
তৃতীয়	বেসিক হিউমান বায়োলোজি ও এর প্রয়োগ	৩৯-৭৭
চতুর্থ	সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৭৮-১০৩
পঞ্চম	বেসিক লাইফ সাপোর্ট	১০৪-১২০

দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	খাদ্য ও পুষ্টির প্রাথমিক ধারণার প্রয়োগ	১২৩-১৫৪
দ্বিতীয়	হাউজকিপিং এর ধারণা	১৫৫-১৬৬
তৃতীয়	কমিউনিকেশন এন্ড কাউন্সেলিং	১৬৭-২০১
চতুর্থ	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির কেয়ার গিভিং	২০২-২১৩

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

Patient Care Technique-1

প্রথম পত্র

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড: ৮৯১৩

প্রথম অধ্যায়

পেশেন্ট কেয়ারে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা

Health Safety in Patient Care

কর্মক্ষেত্রে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা উভয়ের জন্যই পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য হচ্ছে রোগীর সেবাদানের একটি মূল ভিত্তি। স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ, সহিংসতা এবং হয়রানি থেকে মুক্ত থাকতে কর্মক্ষেত্রে যেসব ক্ষতিকর ও ঝুঁকির উপাদান রয়েছে সেগুলো অপসারণ, হ্রাস বা প্রতিস্থাপন করাই হল একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের পূর্ব শর্ত। এটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রোগীর সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীরা শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি আইন ও বিধি আকারে বাংলাদেশ শ্রম আইন নামে ২০০৬ সালে প্রণয়ন করে পরবর্তীতে যথাক্রমে ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সংশোধিত শ্রম আইন হিসেবে জারি করা হয়েছে। পেশাগত এইসব স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে রোগী ও কর্মক্ষেত্রে অর্পিত কাজগুলো সাফল্যের সাথে চালিয়ে যেতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবো।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কী তা বর্ণনা করতে পারবো।
- OSH নীতি এবং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবো।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা অনুশীলনের দক্ষতা অর্জন করতে পারবো।
- কর্মস্থলে হ্যাজার্ড বা আপদ সনাক্ত করতে পারবো।
- সুরক্ষা লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ সনাক্ত করতে পারবো।
- নসোকোমিয়াল ইনফেকশন বর্ণনা করতে পারবো।
- দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া ও রিপোর্টিং করতে পারবো।
- হাসপাতালে ব্যবহৃত বর্জ্যের বিন/ পাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন ও কালার কোড সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবো।

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানো এবং কর্মক্ষেত্রে ধোঁয়া থেকে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ কৌশল অর্জন এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার পদ্ধতি নিশ্চিত করতে পারবো। জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানবো।

১.১ কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বলতে সাধারণ কিছু কর্মক্রমকে বোঝায় যার মধ্যে রয়েছে গ্লাভস পরা, চোখের সুরক্ষা পরা, ভালো সরঞ্জাম ব্যবহার করা, কোনো কিছু ছিটকে পড়লে তা পরিষ্কার করা, প্রাথমিক চিকিৎসা কিট ব্যবহার করতে পারা ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে যে, এগুলো জানার মধ্যেই শুধু সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে আরও কিছু বিষয় জড়িত।

১.১.১ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার সুবিধা

যখন এক দল কর্মীবাহিনী সত্যিকার অর্থে কাজে নিবেদিত হয় এবং একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরির লক্ষে একত্রিত হয়, তখন এটি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের আঘাত হ্রাস এবং অসুস্থতা নিরসনে অবদান রাখা এবং অর্পিত সুবিধা প্রদান করে থাকে।

১.১.২ কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় করণীয়

একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করার জন্য সমস্ত কর্মচারীদের দ্বারা অনুসরণ করা যেতে পারে এমন কিছু নিরাপত্তামূলক করণীয় রয়েছে। যদিও নিম্নের বিষয়গুলোই একমাত্র করণীয় নয়, বরং সেবাদানকারীরা যাতে তাদের কর্মক্ষেত্রে কম ঝুঁকিতে কাজ করতে পারে তার মধ্যে এগুলোই মূল মৌলিক আদর্শগুলোর অন্যতম। যেমন:

১। **সর্বদা অনিরাপদ অবস্থার রিপোর্ট করা :** কখনও কখনও, কর্মীরা নিজের বা অন্য কেউ সমস্যায় পড়ার ভয়ে তাদের উর্ধ্বতনদের সাথে নির্দিষ্ট ঝুঁকির বিষয় এবং বিপদগুলো জানাতে দ্বিধা বোধ করতে পারে। এটি নিরাপদ কাজের পরিবেশের জন্য অনুকূল নয়। কারণ এটি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা আঘাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই কর্মীকে অন্যান্য সহকর্মীদের এবং নিজেদের রক্ষায় সাহায্য করার জন্য অবিলম্বে ঝুঁকির বিষয়গুলো রিপোর্ট করতে হবে। একবার এই সমস্যা চিহ্নিত হয়ে গেলে, দ্রুত এবং কার্যকরভাবে পরবর্তী ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।

২। **ওয়ার্কস্টেশন বা কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা:** সেবাদানকারীরা তাদের ওয়ার্কস্টেশনের কাছাকাছি অপ্রয়োজনীয় জিনিস থাকলে অথবা ওয়ার্কস্টেশনে কোনো কিছু পড়ে থাকলে তা অবশ্যই সর্বদা পরিষ্কার করবে এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে মিলে কাজ করা লাগলে সেই এলাকাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্যানিটাইজ করতে হবে।

চিত্র ১.১: অনিরাপদ অবস্থার রিপোর্ট করা

চিত্র ১.২: ওয়ার্কস্টেশন পরিষ্কার রাখা

৩। **প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) পরিধান করা:** কাজের সময় কর্মীদের সর্বদা প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) পরা অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়শই কর্মীরা নির্দিষ্ট পিপিই পরতে ভুলে যান, যেমন প্রতিরক্ষামূলক গগলস, হেয়ার নেট ইত্যাদি। কারণ তারা মনে করে যে এটি ছাড়াই তারা দ্রুত কাজটি শেষ করতে পারবে। কর্মীদের নিরাপদ রাখতে এবং তাদের আঘাত বা অসুস্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগত

সুরক্ষামুলক সরঞ্জামগুলো দেওয়া হয়, তাই সর্বদা তাদের কাজের জন্য নির্ধারিত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) যথাযথভাবে পরে নিতে হবে।

৪। কাজের ফাঁকে বিরতি নেয়াঃ কর্মস্থলে দায়বদ্ধতার এবং অতিরিক্ত কাজ করার কারণে কর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই কিছু কিছু কাজ শেষ করার আগে কর্মীদের বিশ্রাম নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজে ফেরার জন্য মাঝে মাঝে বিরতি নেয়া উচিত। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হলে কর্মীরা একটি ঝুঁকির মধ্যে পড়েন এবং হাতের কাজটিতে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারে না, এর ফলে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৫। ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো এড়িয়ে না যাওয়া: কখনও কখনও কর্মীরা একটি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তাড়াহড়ো শুরু করে । এতে তাদের কাজের ধারাবাহিকতার বিচ্যুতি ঘটে। এসময় দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সঠিক উপায়ে কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার ভুলে যেতে পারে। এটি যে কোনো মূল্যে এড়ানো উচিত।

৬। নতুন কর্ম পদ্ধতির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল (Up-to-Date) থাকা: কর্মক্ষেত্রে কোনো নতুন পদ্ধতি বা নতুন সরঞ্জামাদি যুক্ত হলে কর্মীদের সেই ব্যাপারে সর্বদা সচেতন এবং ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে কর্মীদের কী করা দরকার সে সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। কোনো প্রশ্ন বা কিছু জানার থাকলে সুপারভাইজারকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে।

৭। সঠিক দেহ ভঙ্গি (Body Posture) বজায় রাখা: সঠিক দেহ ভঙ্গি বজায় রেখে কাজগুলো সম্পাদন করা কর্মীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারি জিনিস তোলা, এমনকি কম্পিউটারে বসে কাজ করার ক্ষেত্রে এই নিরাপত্তার উপদেশগুলো মেনে চলা উচিত। সঠিক দেহ ভঙ্গি বজায় রেখে কাজ করলে ঘাড়, পিঠ বা কাঁধে ব্যথাসহ সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়।

৮। নতুন কর্মীদের নির্দেশনা প্রদান করা: প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উচিত নতুন কর্মীদের সঠিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার নির্দেশনা দেওয়া। উক্ত সংস্থার নিরাপত্তা নিয়ম এবং এর মানদণ্ড সম্পর্কে অবহিত করলে কর্মস্থলের নিরাপত্তার ভীত আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

১.২ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

১.২.১ পেশাগত স্বাস্থ্য (Occupational Health)

পেশাগত স্বাস্থ্য হল কাজের একটি ক্ষেত্র যেখানে সকল পেশার কর্মীদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার উন্নয়ন ও মান বজায় রাখা নিয়ে আলোচনা করে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) হল জনস্বাস্থ্যের একটি শাখা যেখানে কর্মীদের অসুস্থতার প্রবনতা এবং ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করে এবং সেগুলো প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়।

১.২.২ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ বিধান

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০১৯ (২ নং আইন): পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০১৯ দ্রষ্টব্য।

১.২.৩ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব

বেশিরভাগ কর্মী কর্মক্ষেত্রে দিনে কমপক্ষে আট ঘণ্টা ব্যয় করে, তা হোক কোনো হাসপাতালে রোগীর কাছে, অফিসে কিংবা কারখানায়। তাই কাজের পরিবেশ নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত। সারা বিশ্বে প্রতিদিন কর্মীরা প্রচুর স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, যেমন: ধুলা, গ্যাস, প্রকট শব্দ, কম্পন; চরম তাপমাত্রা ইত্যাদি। অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি (OSH) বা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রাথমিকভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, আঘাত এবং ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শ থেকে কর্মীদের রক্ষা করার উপর আলোকপাত করে। যদিও দুর্ঘটনা

যেকোনো সময় ঘটতে পারে, তবুও নিয়োগকর্তার দায়িত্ব নিশ্চিত করা উচিত যেন দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নেয় এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখা। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে কিছু মূল সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন:

১। এটি কর্মক্ষেত্রে আঘাত এবং অসুস্থতা হ্রাস করে
২। এটি কর্মীদের উৎপাদনশীলতা উন্নত করে
৩। এটি কর্মীদের অনেকদিন একই জায়গায় ধরে রাখতে সাহায্য করে
৪। এটি আঘাতের খরচ এবং শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ হ্রাস করে

চিত্র ১.৩: পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব

১.৩ স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব

স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং এর পরিষেবা, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা, রোগ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এবং জ্ঞানকে স্বাস্থ্য সচেতনতা বলে। স্বাস্থ্য সচেতনতা হল রোগ প্রতিরোধ, দ্রুত সনাক্তকরণ, সঠিক চিকিৎসা ও থেরাপীর জন্য অপরিহার্য এবং কার্যকর স্বাস্থ্য সেবার মূল চাবিকাঠি। একটি রোগ এবং এর লক্ষণগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমন স্ক্রীনিং করা, স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ চেক-আপের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়। আমাদের দেশে রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব বা স্ক্রীনিং এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা গ্রহণে অবহেলা সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুতর বাধা।

১.৪ স্বাস্থ্য ও সেইফটি (OSH) নীতি এবং পদ্ধতি

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা একই সূত্রে গাঁথা হলেও এর প্রকৃতি এবং কার্যক্রম অনেকটা ভিন্ন। তাই এই স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালাটি দুইটি পর্বে উপস্থাপন করা হল:

ক) প্রথম পর্ব- স্বাস্থ্য নীতিমালা; এবং খ) দ্বিতীয় পর্ব-নিরাপত্তা নীতিমালা।

১.৪.১ স্বাস্থ্য নীতিমালা

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩ইং) এর ধারা ৫১ থেকে ৬০ দ্রষ্টব্য।

১.৪.২ নিরাপত্তা নীতিমালা

নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত যন্ত্রপাতি এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারটি অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়, এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো করণীয় বলে গণ্য করতে হবে। যেমন-

১। অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তা: অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি কারখানায় স্বয়ং সম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করা আছে যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করতে হবে।
২। বিভাগ অনুযায়ী আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE)- এর ব্যবহার যেমন: কেমিক্যাল বিভাগ এর জন্য রাবার এপ্রোণ, হ্যান্ড গ্লাভস, কেমিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস ও গামবুট।
৩। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি: সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ নিরাপদভাবে করতে হবে। কোথাও কোনো খোলা তার, ইনসুলিশন টেপযুক্ত তার থাকবে না।
৪। বৈদ্যুতিক বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা
৫। বিভিন্ন স্টোর: প্রতিদিন কাজ শুরুর পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
৬। ভবন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঠামোর নিরাপত্তা
৭। চলমান যন্ত্রপাতিতে বা উহার নিকট কাজ করা (বিধি-৫৭)
৮। বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে তরুণ ব্যক্তিদের নিয়োগ

১.৫ ব্যক্তিগত সুরক্ষার অনুশীলন

সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ কৌশল ও জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কারণ এই সুরক্ষার মাধ্যমে শুধু নিজেকে নয় এর পাশাপাশি রোগী, সহকর্মী এবং সাধারণ জনগণকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

১.৫.১ পারসনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট বা পি পি ই (PPE)

অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ এর ভাষায় ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম বলতে "সংক্রামক পদার্থের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য একজন কর্মী দ্বারা পরিধান করা বিশেষ পোশাক বা সরঞ্জাম" কে বুঝায়। সরঞ্জামটি কেবল সেবা কর্মীদেরই সুস্থ রাখা না, এটি রোগীদের সংক্রমণের কবল থেকেও রক্ষা করে। PPE পরিধানকারী এবং একটি দূষিত পরিবেশের মধ্যে এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক বাধা তৈরি করে এবং রোগের বিস্তার রোধ করে। এই বাধার ফলে বিভিন্ন ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াকে নাক, চোখ এবং মুখের পাশাপাশি ত্বকে অবস্থিত শ্লেষ্মা ঝিল্লিকে সংক্রমিত করতে বাধা দেয়। PPE সাধারণত হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডাক্তারী অফিস এবং গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়।

১.৫.২ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য কতিপয় সাধারণ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষামূলক গিয়ার ব্যবহার করেন। এর মধ্যে রয়েছে মাস্ক, গ্লাভস, চোখের সুরক্ষা এবং পোশাক যেমন গাউন, হেড কভারিং এবং জুতার কভার।

ক। মাস্ক: মাস্ক ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস থেকে নাক ও মুখকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের মাস্ক পাওয়া যায় যেমন কাপড়, N৯৫ এবং সার্জিক্যাল মাস্ক যা বিভিন্ন স্তরের সুরক্ষা প্রদান করে থাকে।

খ। গ্লাভস: দূষিত পৃষ্ঠ বা সংক্রামক রোগীদের থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের রক্ষা করার জন্য গ্লাভস গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা সরঞ্জাম। তাছাড়া, গ্লাভস পরা কর্মীরা রোগীদের ক্ষতকে সংক্রমিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। সামগ্রিকভাবে, গ্লাভস রোগী এবংকর্মী উভয়ের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক বাধা প্রদান করে।

গ। চোখের সুরক্ষা: এটা পরতে হয় তখন, যখন পরিবেশে রক্ত বা অন্যান্য শারীরিক তরলের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকে। কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীদের যত্ন নেওয়া স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য চোখের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভাইরাসটি চোখের মধ্যে থাকা যে কোনোও শ্লেষ্মা ঝিল্লির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

ঘ। প্রতিরক্ষামূলক পোশাক: গাউন, ফেইস শিল্ড এবং জুতার কভার ত্বক এবং পোশাককে শারীরিক তরলের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করে।

চিত্র ১.৪: বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরনজাম

১.৬ কর্মস্থলে আপদ (হ্যাজার্ড) সনাক্তকরণ

১.৬.১ আপদ বা হ্যাজার্ড:

খুব সহজভাবে বলা যায় যে, যার মাধ্যমে জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ বা পরিবেশের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে সেটিই হল আপদ। যেমন: আগুন, বিদ্যুৎ, এসিড ইত্যাদি আমাদের উপকারে ব্যবহার হলেও হঠাৎ করে জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ বা পরিবেশের ক্ষতি করে বসতে পারে। তাই এদেরকে আপদ বা হ্যাজার্ড বলা হয়। অতএব হ্যাজার্ড হলো, যখন কোনো কিছু বা কোনো বিষয় কোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে বা ক্ষতির কারণ হয়। কোনো বিষয় কোনো সম্পদের/পরিবেশের ক্ষতি করে বা ক্ষতির কারণ হয়। উভয় আপদই ঘটতে পারে।

১.৬.২ কর্মক্ষেত্রে প্রধান প্রধান আপদ

কর্মক্ষেত্রসহ সকল জায়গায় মোটামোটিভাবে ৭ প্রকার আপদ লক্ষ করা যায়। যথা:

ক) বস্তুগত বা ফিজিক্যাল আপদ- বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট জড় বস্তু যেমন: ইট, পাথর, বালি, পেরেক, লৌহ খন্ডসহ যে কোনো কিছুই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাই এগুলোকে বস্তুগত বা ফিজিক্যাল আপদ বলে।

খ) রাসায়নিক আপদ- যেকোনো রাসায়নিক পদার্থ বা রাসায়নিক বিক্রিয়া যেমন: এসিড, পেট্রোল, থিনার, আগুন এ সকল কিছুই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

গ) অনুজীব ও জীবাণু আপদ- নোংরা স্থান ও বাসি পচা খাবারে বসবাসকারি অনুজীব যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যামিবা, এন্টামিবা, ভাইরাস এ সব কিছু মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে বিধায় এটি আপদ হিসাবে বিবেচিত। বিভিন্ন রোগ যেমন: ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ব্যক্তি তার কফ, হাঁচি, থুথু যেখানে সেখানে ফেললে রোগের জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পরে। ফলে পাশে বসা কোনো সুস্থ মানুষের নাক বা মুখ দিয়ে এ জীবানু শরীরে প্রবেশের ফলে রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। এ জীবাণু গুলো কোনো পৃষ্ঠের উপর যেমন: টেবিল, দরজার লক, যন্ত্রপাতির হাতল, টাকা প্রভৃতির উপর ২ ঘন্টা বা তার বেশি সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। তাই রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি হাত দিয়ে তার নাক পরিষ্কার করে অথবা মুখে হাত দিয়ে হাঁচি ফেলে সেই হাতে যা স্পর্শ করবে তাতেই জীবাণু লেগে যাবে এবং সুস্থ শরীরে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটবে।

চিত্র ১.৫: রাসায়নীক আপদ

চিত্র ১.৬: বায়োলজিক্যাল বা জীবানু আপদ-এর সাইন

ঘ) মনস্তাত্ত্বিক আপদ-মানসিক চাপ দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বিধায় মানসিক চাপ মনস্তাত্ত্বিক আপদ। প্রচন্ড কাজের চাপ, পারিবারিক অশান্তি বা পীড়নদায়ক পরিবেশ প্রভৃতি কারণে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

ঙ) বিকির্ণ রশ্মি বা রেডিয়েশন আপদ- ওয়েল্ডিং মেশিন থেকে এক ধরনের রশ্মি নির্গত হয় যা চোখের সাময়িক ক্ষতিসহ স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। ইহা বিকির্ণ রশ্মি বা রেডিয়েশন আপদের উদাহরণ।

চ) নয়েজ ও ভাইব্রেশন আপদ- বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি, শীটমেটাল ওয়ার্কশপ এবং কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও মেশিন থেকে প্রচন্ড শব্দ নির্গত হয়। এ শব্দ মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং শ্রবণ শক্তিকে লোপ

করতে পারে। আবার মনুষ্য সৃষ্ট গোলমাল হৈ চৈ হঠাৎ কোনো কর্মীকে অমনোযোগী করতে পারে যা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

ছ) আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড: যখন শরীরের মাংশপেশী একই ধরনের স্ট্রেচ পায় কিন্তু তা পূরণ হওয়ার মত সময় পায়না তখন সে স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যে পরিস্থিতি এমনটা তৈরি করে তাই আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড। যেমন সারাক্ষণ একইভাবে একই অবস্থানে কাজ করা। এই একই অবস্থানে কাজ করার দরুণ শরীরের মাংসপেশী ও হাড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাই এটি আর্গোনোমোকি হ্যাজার্ড। এই হ্যাজার্ডের ফলে মাংসপেশী, হাড়, ব্লাড ভেসেলস, নার্ভ ও অন্যান্য টিস্যুতে আঘাত ও ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং এ ক্ষতের কারণে ব্যথা হয় এমনকি স্থায়ী পঙ্গুও হতে পারে।

চিত্র ১.৭: আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড

জ) যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক আপদ: বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীর ঘূর্ণায়মান অংশের মাধ্যমে কর্মী আহত হতে পারে। তাই এগুলো আপদ। আবার বিদ্যুৎ একটি আপদ। কারণ বৈদ্যুতিক শক পেলে মানুষ আহত কিংবা মারা পর্যন্ত যেতে পারে।

১.৬.৩ আপদ নিয়ন্ত্রণ

আপদ নিয়ন্ত্রণ বলতে বিভিন্ন বস্তুগত বা ফিজিক্যাল, রাসায়নিক, জীবাণু, মনস্তাত্ত্বিক, রেডিয়েশন শব্দদূষন অথবা ভূকম্পন আপদ যেন দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দুর্ঘটনা ঘটলেও কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থাকে বুঝায়।

১.৬.৪ কর্মক্ষেত্রে আপদ নিয়ন্ত্রণের প্রধান প্রধান উপায়

আপদ নিয়ন্ত্রণের প্রধান প্রধান উপায়গুলো নিম্নরূপ-

১। আপদকে কর্মস্থল থেকে দূর করা।
২। আপদকে নিরাপদ বস্তু বা কৌশল দ্বারা প্রতিস্থাপন।
৩। প্রকৌশলগত ব্যবস্থা- প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, ভেন্টিলেশন পদ্ধতি অথবা কার্য প্রক্রিয়ার এমন ভাবে পরিবর্তন ঘটানো যাতে করে দুর্ঘটনা হ্রাস পায়।
৪। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ- শ্রমিক কর্মীদের শ্রম ঘন্টা পরিবর্তন, কাজের নীতি, কলা কৌশল ও অন্যান্য নিয়ম কানুন
৫। কর্মীদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা।

চিত্র ১.৮: কর্মক্ষেত্রে আপদ নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিক স্তর

১.৭ কর্মক্ষেত্রের নিরাপদ ও অনিরাপদ কার্যাভ্যাস

কর্মীদের যেকোনো পেশা বা প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে, একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করতে অবশ্যই যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকতে হবে। এটি সাধারণ শোনালেও কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা উভয়ই বারবার ভুল করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনিরাপদ কাজের পরিস্থিতি একটি দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে যা গুরুতর আঘাত বা এমনকি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

১.৭.১ অনিরাপদ কাজের অভ্যাস

১। প্রশিক্ষণের অভাব, প্রশিক্ষণ বা অনুমোদন ছাড়া সরঞ্জামাদি অপারেটিং করা
২। যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষামুলক সরঞ্জামের
৩। ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম ব্যবহার করা, যেমন পাওয়ার টুল বা মই
৪। সেফটি হ্যাজার্ড সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করতে ব্যর্থতা
৫। অনুপযুক্ত পদ্ধতিতে সরঞ্জাম পরিচালনা, অনুপযুক্ত ওয়ার্কস্টেশন বিন্যাস
৬। অগোছালো হাউস কিপিং, অপর্যাপ্ত আলোতে কাজ করা
৭। আগুনের বিপদ, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা সতর্কতা ব্যবস্থা
৮। একক ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ, নিরাপত্তা চিহ্ন উপেক্ষা করা

১.৭.২ নিরাপদ কাজের অভ্যাস

নিম্নে কতগুলো নিরাপদ কাজের অভ্যাস উল্লেখ করা হল:

১। কর্মীদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া; নিরাপদ আচরণের জন্য কর্মীদের পুরস্কৃত করা
২। পেশাগত চিকিৎসকদের নিয়োগ দেওয়া
৩। সেফটি লেবেল এবং চিহ্ন ব্যবহার করা; জিনিস পরিষ্কার ও গুছিয়ে রাখা
৪। নিশ্চিত করা যে কর্মীদের সঠিক সরঞ্জাম আছে এবং এর কার্যকারীতা পরীক্ষা করা হয়েছে
৫। কাজের মধ্যে বিরতিকে উৎসাহিত করা; কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে নিয়মিত মিটিং করা।
৬। কাজের শুরু থেকেই নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রয়োগ করা
৭। স্টাফ এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে খোলা সংলাপ রাখার ব্যবস্থা উম্মুক্ত রাখা

১.৭.৩ নিরাপদ অপারেটিং পদ্ধতি

নিরাপদ অপারেটিং পদ্ধতি (এসওপি) হল একটি সংস্থার দ্বারা সংকলিত ধাপে ধাপে নির্দেশাবলির একটি সেট যা কর্মীদের জটিল রুটিন কাজ-কর্ম পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

১.৭.৪ জরুরি বহির্গমন

যেকোনো জরুরি অবস্থায় ভবন থেকে নিরাপদে বের হতে যে রাস্তা বা পথ ব্যবহার করা হয় তাকে বহির্গমন পথ বা এক্সিট রুট বলে। প্রয়োজন অনুসারে একটি ভবনের প্রতিটি কক্ষের এক বা একাদিক এক্সিট রুট থাকতে পারে।

বহির্গমন পথের বিধিমালাসমূহ

১। ভবনের প্রত্যেক ফ্লোরে সহজে দৃশ্যমান এক বা একাদিক স্থানে বহির্গমন পথের নকশা দেওয়ালে টানিয়ে রাখতে হব; তিন বা তার চেয়ে কম তলা ভবনের জন্য বহির্গমন পথ সর্বনিম্ন ১ঘণ্টা অগ্নি প্রতিরোধক হতে হবে,
২। চার তলা বা তার চেয়ে বেশী তলা বিশিষ্ট ভবনের জন্য এ পথ সর্বনিম্ন ২ঘণ্টা অগ্নি প্রতিরোধক হতে হবে।
৩। ভবনের প্রতিটি কক্ষ যেখানে ২০ জন বা তার অধিক লোক কাজ করে সেখানে ন্যূনতম ২টি বহির্গমন পথ থাকতে হবে,
৪। বহির্গমন পথ কোনো ব্যক্তির কাজের স্থান থেকে ৫০মিটারের অধিক দূরত্বে হবে না,

৫। বহির্গমন পথের প্রস্থ ১.১৫ মিটার এবং উচ্চতা ২মিটারের কম হতে পারবে না, ভবনের সাথের বহির্গমন সিঁড়িপথ ও বাঁকের শেষ প্রান্ত ভবনের বহিমুর্খী হতে হবে,
৬। বহির্গমন পথের দেওয়াল, ফ্লোর ও সিলিং অগ্নি প্রতিরোধক নির্মাণ দ্বারা তৈরি হতে হবে, বহির্গমন ছাড়া অন্য কোনো কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না,
৭। বহির্গমন পথ বাঁধা মুক্ত থাকতে হবে এবং এ পথের ধারণক্ষমতা কমানো যাবে না,
৮। উক্ত দরজা কখনো তালাবদ্ধ করা যাবে না, বহির্গমনের প্রত্যেক দরজা সুইংগিং ফায়ার ডোর হতে হবে।

বহির্গমন সংকেত বা এক্সিট সাইন – Exit Sign

বহির্গমন সংকেত বা এক্সিট সাইন হলো আলোযুক্ত এমন এক প্রকার সংকেত বা চিহ্ন যা সঠিকভাবে, দ্রুত ও নিরাপদে দুর্ঘটনা প্রবণ স্থান থেকে নিরাপদ স্থানে আসতে সাহায্য করে। তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে সকল বিল্ডিং এ এক্সিট সাইন বা প্রস্থানের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আলোযুক্ত বহির্গমন সংকেত এ ব্যাটারি ব্যাকআপ ও ইমারজ্যান্সি পাওয়ারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটি বহির্গমন পথের সামনে রাখতে হবে। যে সকল স্থান থেকে বহির্গমন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না সেখানে অতিরিক্ত এক্সিট সাইন ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে পথ নির্দেশক সাইন থাকতে হবে।

১.৭.৫ অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম

১। ফায়ার এক্সটিংগুইসার
২। ভাল্ব ও রাইসার
৩। হোস ও আনুষঙ্গিক উপকরণ
৪। আগুন হাইড্র্যান্ট
৫। রিল এবং ক্যাবিনেট

চিত্র ১.১০: একটি অগ্নি নির্বাপক

ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার সহজে মনে রাখার উপায়: (PASS)

চিত্র ১.১১: ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার সহজে মনে রাখার উপায়

ট্যাগিং: ট্যাগিং হল এমন একটি পদ্ধতি যা পেশাদারী কর্মীরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দৃশ্যত পরিদর্শন করার পাশাপাশি লেবেলিং করে কাজের উপযুক্ত করে রাখা। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা নিয়মানুসারে সমস্ত যন্ত্রপাতি কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষম করে রাখার জন্য ট্যাগিং অপরিহার্য। কর্মচারী বা দর্শনার্থীদের ক্ষতি করতে পারে এমন কোনো বিপদ আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন অবশ্যই করণীয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ট্যাগিং করলে সরঞ্জামগুলোর সমস্যা সনাক্ত করা যায়। স্বাস্থ্য সুরক্ষার এটি একটি ভালো অভ্যাস। এর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণও করা হয় এবং ক্ষতির হাত থেকেও যন্ত্রটিকে রক্ষা করা যায়। যন্ত্রপাতির ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন এবং মেরামত করাও অপরিহার্য। ব্যবহার্য সরঞ্জামগুলোর আপডেট রেখে ট্যাগিং পদ্ধতি চলমান রাখা নিরাপদ ও ঝুঁকির হাত থেকে কর্মীকে কাজে আন্তরিক এনে দেয়।

১.৮ নসোকোমিয়াল ইনফেকশন

নসোকোমিয়াল ইনফেকশন হল এমন একটি সংক্রমণ যখন একজন স্বাস্থ্যকর্মী বা রোগী বা স্বজনরা কোনো কারণে হাসপাতালে অবস্থান করার সময় সংক্রমিত হয়। একে হাসপাতাল-অর্জিত সংক্রমণ (Hospital-Aquired Infection) বা স্বাস্থ্য-সেবা সম্পর্কিত সংক্রমণও বলা হয়। নসোকোমিয়াল সংক্রমণের কারণে জীবাণুগুলো হাসপাতালে প্রবেশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যক্তিকে অসুস্থ করে তোলে।

১.৮.১ নোসোকোমিয়াল ইনফেকশনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরনের সাধারণ নোসোকোমিয়াল সংক্রমণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

১। **ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ:** ব্যাকটেরিয়া হল ক্ষুদ্র জীবন্ত জিনিস যা দেখতে খুব ছোট। বেশিরভাগই ক্ষতিকারক নয়, তবে কিছু গুরুতর অসুস্থতার কারণ হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া নসোকোমিয়াল সংক্রমণের সবচেয়ে সাধারণ কারণ। সাধারণ ব্যাকটেরিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে ই. কোলাই এবং স্ট্যাফাইলোকক্কাস প্রভৃতি।

২। **ছত্রাক সংক্রমণ:** ছত্রাক হল জীবন্ত জিনিস, যেমন মাশরুম, মোল্ড। কিছু ছত্রাক ক্ষতিকারক সংক্রামক কারণ হতে পারে। সবচেয়ে যে ছত্রাক নসোকোমিয়াল সংক্রমণ ঘটায় তা হল ক্যান্ডিডা (থ্রোশ) এবং অ্যাসপারগিলাস।

৩। **ভাইরাল সংক্রমণ:** ভাইরাস হল ক্ষুদ্র জীবাণু যা ব্যক্তির প্রাকৃতিক জেনেটিক কোড অনুকরণ করে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরে কৌশলে সেগুলোর কপি তৈরি করে, ঠিক যেমন শরীর অন্যান্য কোষের কপি তৈরি করে। ভাইরাস মারাত্মক অসুস্থতার কারণ হতে পারে। ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট সাধারণ নোসোকোমিয়াল সংক্রমণ হল ইনফ্লুয়েঞ্জা (ফ্লু) এবং শ্বাসযন্ত্রের সিনসিশিয়াল ভাইরাস।

সুরক্ষা লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ

কর্মস্থলে সর্বদাই স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন: পাবলিক ভবন, নির্মাণ সাইট, অফিস, গুদামাগার হাসপাতাল, প্রভৃতি। আমরা প্রতিদিন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার লক্ষণ বুঝার চেষ্টা করি। অনেক সময় এর আকৃতি-প্রকৃতি ও রঙ দেখেই অনুমান করা যায় এটা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। সাধারণত ৫ টি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা চিহ্ন রয়েছে এবং যেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১। **নিষেধাজ্ঞার চিহ্ন:** নিষেধাজ্ঞার চিহ্ন হল এক প্রকারের প্রতীক যা একটি কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ করে। এটির লক্ষ্য এমন একটি আচরণ প্রতিরোধ করা যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য নয়, এলাকা এবং এর অন্যান্য বাসিন্দাদের জন্যও সম্ভাব্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এমন ধারণা সৃষ্টি করা। এটি কখনও কখনও নিষিদ্ধ কার্যকলাপের জন্য সরাসরি আদেশ হতে পারে। এর রঙ হয় লাল, আকার বৃত্তাকার।

চিত্র ১.১১: ক. নিষেধাজ্ঞার চিহ্ন; খ. বাধ্যতামূলক লক্ষণ; গ. সতর্ক সংকেত

২। **বাধ্যতামূলক লক্ষণ:** বাধ্যতামূলক চিহ্ন হল একটি প্রতীক যা একটি ব্যবসা বা শিল্পের সাথে জড়িত বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলো মেনে চলতে সাহায্য করার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মের আদেশ দেয়। এর রঙ নীল ও আকার বৃত্তাকার।

৩। **সতর্ক সংকেত:** বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এই সতর্কতা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলো আকৃতিতে ত্রিভুজাকার। পিকটোগ্রামটি একটি হলুদ পটভূমিতে কালো, ত্রিভুজটির একটি কালো সীমানা রয়েছে।

৪। **নিরাপদ অবস্থার লক্ষণ:** নিরাপদ অবস্থার লক্ষণগুলো বুঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলো আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গাকার। সবুজ পটভূমিতে চিত্রটি সাদা এবং প্রায়শই একটি সাদা সীমানা অংকিত থাকে।

চিত্র ১.১৩: নিরাপদ অবস্থার লক্ষণ

৫। **অগ্নি সরঞ্জাম চিহ্ন:** ফায়ার ইকুইপমেন্ট/ফাইটিং লক্ষণ দেখায় যে, ফায়ার ইকুইপমেন্টটি কোথায় আছে। আগুনের জন্য আমরা কি রঙ মনে করি? লাল। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ চিহ্নের জন্য লাল ব্যবহার করেছি। অফেল, অগ্নি সরঞ্জাম চিহ্নও লাল, কিন্তু এটি একটি ভিন্ন আকৃত। এই চিহ্নগুলো বর্গাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার। পিকটোগ্রামটি একটি লাল পটভূমিতে সাদা এবং একটি সাদা সীমানা থাকে।

১.৯ দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া ও রিপোর্টিং

দুর্ঘটনা রিপোর্টিং হল কর্মক্ষেত্রে কোনো ঘটনা রেকর্ড করার প্রক্রিয়া, যার মধ্যে থাকতে পারে কোনো ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া, আঘাত এবং দুর্ঘটনা ঘটা। এটি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করার পদ্ধতি। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিষ্ঠানে কোনো আক্রমণ চিহ্নিত করতে, অস্ত্রাধিকার দিতে, ধারণ করতে এবং নির্মূল করতে সাহায্য করে। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়ার লক্ষ্য হল সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ঘটনা সম্পর্কে সচেতন এবং সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং ভবিষ্যতে কোনো ঝুঁকি বা অনুরূপ ঘটনাগুলোকে রোধ করতে দ্রুত কাজ করে তা নিশ্চিত করে।

দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া পদ্ধতি

১। ঘটনাস্থলে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করে জরুরি পরিষেবা নিশ্চিৎ করতে হবে।

৩। দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানকারী যদি যোগ্য হয় তবে অবিলম্বে কাজ শুরু করে অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকতে হবে।

৪। সম্ভাব্য গৌণ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্যান্য ব্যক্তির ভীড় সরাতে হবে।

৫। ঘটনাস্থলে মানুষ এবং অবস্থা সনাক্ত করে কেউ তার প্রকৃত ঘটনা জানে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে হবে। কেউ দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তির নাম জানে কিনা তা জানার চেষ্টা করতে হবে। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া ব্যক্তি ঘটনাস্থলে একা থাকলে তার চারপাশে তাকিয়ে সেখানে কে আছে তা লক্ষ্য করতে হবে।

৬। ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়ার জায়গাটিতে নিরাপদ অবস্থার ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্ঘটনার কারণ ও প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। তাৎক্ষণিক জরুরি অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে গেলে, এই অতিরিক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত:

ক। ক্ষতিটি কতটা খারাপ, এটি কতটা খারাপ হতে পারে এবং অতিরিক্ত তদন্ত করার প্রয়োজন আছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে; খ। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অর্থাৎ মালিক এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবার, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং বীমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১.১০ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রতিদিন আমরা নানা ধরনের কাজ করি এবং সেইসব কাজের জন্য বহুরকম জিনিস ব্যবহার করতে হয়। এরপর কাজের শেষে দেখা যায় কিছু কিছু জিনিস আমাদের আর কাজে লাগে না। সেগুলো তখন অব্যবহারযোগ্য বা অপ্রয়োজনীয় বলে আমরা ফেলে দিই। যেমন— খাবারের প্যাকেট, ভাঙাচোরা খেলনা, শিশি বোতল ভাঙা, কেটে যাওয়া বাল্ব ও টিউব লাইট, ময়লা কাগজ ইত্যাদি। এগুলো আমরা বর্জন করি বা ফেলে দিই। এগুলোই হল বর্জ্য পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনে বাতিল সব পদার্থই বর্জ্য । অন্যভাবে বলা যায় যে কোনো কঠিন, তরল কিংবা গ্যাসীয় পদার্থ, যেগুলো আমাদের কোনো কাজে লাগে না অর্থাৎ ফেলে দেওয়া প্রয়োজন , সেগুলোই হল বর্জ্য পদার্থ। বাড়ির মতো কলকারখানা, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালতেও এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় জিনিস বা বর্জ্য পদার্থ বেরোয় এবং তার পরিমাণ অনেক বেশি। আর এগুলোই নোংরা বা আবর্জনা হয়ে বাড়ির আশেপাশে বা রাস্তার ধারে পড়ে থেকে পরিবেশকে দূষিত করে।

১.১০.১ বর্জ্যের প্রকারভেদ

ক। সাধারণভাবে বর্জ্য পদার্থসমূহকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়—কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়।

১। কঠিন বর্জ্য পদার্থ: বর্জ্য পদার্থের মধ্যে কাচ, প্লাস্টিক, টিন, ব্যাটারি, কাগজ, নানারকম ধাতব জিনিস, ছাই, কাপড় বা ন্যাকড়া, টায়ার, টিউব প্রভৃতি কঠিন বর্জ্য পদার্থ।

২। তরল বর্জ্য পদার্থ: এগুলো গৃহস্থালি, কলকারখানা, হাসপাতাল প্রভৃতি থেকে নির্গত হয়, যেমন- মল-মূত্র থেকে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ, বাড়িঘর-কলকারখানা নিঃসৃত নোংরা জল, সাবান ও ডিটারজেন্ট মিশ্রিত জল ইত্যাদি।

৩। গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থ: কলকারখানা ও গাড়ি থেকে নির্গত বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস, যেমন— সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড প্রভৃতি।

খ। বিষক্রিয়ার ভিত্তিতে বর্জ্য পদার্থসমূহকে দুটি বিভাগে ভাগ করা যায়:

১। বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ: এগুলো কঠিন, তরল, গ্যাসীয় ও তেজস্ক্রিয় অর্থাৎ সবরকমই হতে পারে, যেমন— পারদ, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই, অব্যবহৃত কীটনাশক, ভাঙা কম্পিউটার সামগ্রী, ব্যাটারি, নাইট্রিক অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ। এগুলো মানুষ ও পশুপাখির জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

২। বিষহীন বর্জ্য পদার্থ: খাদ্যজাত বর্জ্য, কাচ, ধুলো, কংক্রীটের টুকরো, প্রভৃতি বিষহীন বর্জ্য পদার্থ।

১.১০.২ বর্জ্য পদার্থের উৎস

প্রধানত সাতটি উৎস থেকে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হয়। এগুলো হল:

১। গৃহস্থালির বর্জ্য: বাড়ির দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে যেসব বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলো এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন—শাকসবজি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্ট, মাছ-মাংসের ফেলে দেওয়া অংশ প্রভৃতি।

২। শিল্পবর্জ্য: কলকারখানা থেকে নির্গত কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, অর্ধতরল প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থকে শিল্পবর্জ্য বলা হয়। যেমন—চামড়া কারখানার ক্রোমিয়াম যৌগ, আকরিক নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় নির্গত নানাপ্রকার ধাতু, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি।

৩। কৃষিজ বর্জ্য: কৃষিজাত দ্রব্য থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থকে কৃষিজ বর্জ্য নামে অভিহিত করা হয়। যেমন— আখের ছোবড়া, খড়, ধানের খোসা, নারকেলের ছোবড়া, প্রাণীজ বর্জ্য প্রভৃতি।

৪। পৌরসভার বর্জ্য: শহরের বা পৌর এলাকার বাড়ি, অফিস, বিদ্যালয়, বাজার, রেস্টুরেন্ট, হোটেল প্রভৃতিতে সৃষ্ট বর্জ্যকে পৌরসভার বর্জ্য বলে। এর মধ্যে থাকে শাকসবজির অবশিষ্টাংশ, কাগজ, কাপড়, ডাবের খোলা, প্লাস্টিক, ধাতব টুকরো প্রভৃতি।

৫। জৈব বর্জ্য: প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে যেসব বর্জ্য তৈরি হয়, সেগুলো জৈব বর্জ্য, যেমন-মাংস উৎপাদনকারী কারখানাগুলো থেকে নির্গত প্রাণীজ বর্জ্য, মাছের উচ্ছিষ্ট, ফুল-ফল-সবজি বাগানের বর্জ্য প্রভৃতি।

৬। চিকিৎসা-সংক্রান্ত বর্জ্য: বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা কেন্দ্রের আবর্জনা এই শ্রেণির অন্তর্গত। যেমন: ক) অসংক্রামক বর্জ্য পদার্থ: যেমন ওষুধের ফয়েল, প্লাস্টিক থালা প্রভৃতি। খ) সংক্রমক বর্জ্য পদার্থ: সিরিঞ্জ, সুঁচ, কাঁচি, ব্লেড, তুলো, গজ, রক্ত, ব্যান্ডেজ, অপারেশন সংক্রান্ত আবর্জনা প্রভৃতি।

৭। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য: পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য, যেমন ছাই, ভারী জল, চিকিৎসায় ব্যবহার্য্য তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি।

১.১০.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management)

বর্তমানে এটা প্রমানিত যে, বর্জ্য পদার্থ বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষিত করে। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, এইসব পদার্থকে জীবন থেকে বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং সবসময় চেষ্টা করা দরকার যে, কীভাবে এইসব পদার্থকে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক চক্রের একটি কার্যকরী উপাদান করে নেয়া যায়। এজন্য বর্জ্য পদার্থগুলোকে শুধুমাত্র অপসারণ বা স্থানান্তরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না করে প্রয়োজন মতো এগুলোর পরিমাণ হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। আর এটাই হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management)। প্রকৃতপক্ষে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হল এই তিনটি R, যথা: Reduce (পরিমাণ হ্রাস), Reuse (পুনর্ব্যবহার) ও Recycle (পুনর্নবীকরণ)। অর্থাৎ এই তিনভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায় -

১। বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce): গৃহস্থালি, কলকারখানা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যাতে বেশি বর্জ্য তৈরি না হয়, তাই জিনিসের ব্যবহার কমানো, জিনিস অপচয় না করা, জীবনযাত্রার মান পালটে চাহিদাকে সীমিত রাখা, ব্যবহৃত জিনিস সরাসরি ফেলে না দিয়ে জমিয়ে রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে বর্জ্যের পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

২। পুনর্ব্যবহার (Reuse): কোনো পরিবর্তন না করে বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করলে তাকে বলা হয় পুনর্ব্যবহার। যেমন—ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিস, লেখার সামগ্রী প্রভৃতি তৈরি করা যায়।

৩। পুনর্নবীকরণ (Recycle): এই পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থকে পুনরায় প্রক্রিয়াকরণ বা পুনরাবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। এর ফলে একই দ্রব্য বা নতুন দ্রব্য উৎপাদিত হয়। যেমন- লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীসমূহ ব্যবহারের ফলে অকেজো হয়ে গেলেও পুনরায় গলিয়ে নতুন নতুন লোহা-ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী প্রস্তুত করে ব্যবহার করা যায়।

১.১০.৪ হাসপাতালে ব্যবহৃত বর্জ্যের বিন/ পাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন ও কালার কোড

সাধারণ বর্জ্যের বিন- **সাংকেতিক চিহ্ন:** কালো রঙের বৃত্ত **পটভূমি:** কালো রঙের বর্ডারে সাদা রঙের		**ধারাল বর্জ্যের বিন-** **সাংকেতিক চিহ্ন:** লাল রঙের বৃত্তের ভিতরে সাদা রঙের দুটি হাড়ের উপর মাথার খুলি **পটভূমি:** লাল বর্ডারের উপর সাদা	
সংক্রামক বর্জ্যের বিন- **সাংকেতিক চিহ্ন:** হলুদ রঙের বৃত্তের উপর কালো রঙের তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি **পটভূমি:** হলুদ বর্ডারের উপর সাদা		**পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যের বিন-সাংকেতিক চিহ্ন:** সবুজ রঙের বৃত্তের ভিতরে কালো রঙের তিনটি তীর চিহ্ন **পটভূমি:** সবুজ রঙের বর্ডারের উপর সাদা	

১.১০.৫ চিকিৎসা বর্জ্যের প্যাকেটজাতকরণের সাংকেতিক চিহ্ন

দহনযোগ্য বর্জ্য- **সাংকেতিক চিহ্ন:** বৃত্তের উপর আগুনের শিখা- কালো রঙ **পটভূমি:** হলুদ রঙ		**তেজস্ক্রিয়/ বিকিরণযোগ্য বর্জ্য-** **সাংকেতিক চিহ্ন:** ঘূর্ণায়মান কালো পাখা- কালো রঙ **পটভূমি:** উপরে অর্ধেক হলুদ ও নিচের অর্ধেক সাদা রঙ	
সংক্রামক বর্জ্য **সাংকেতিক চিহ্ন:** দুইটি হাড়ের উপর মাথার খুলি- কালো রঙ **পটভূমি:** সাদা রঙ		**ক্ষয়কারক বর্জ্য-** **সাংকেতিক চিহ্ন:** হাত এবং একটি ধাতুর প্রতি আকর্ষিত দুটি পাত্র থেকে উপচিয়ে পড়া- কালো রঙ **পটভূমি:** উপরে অর্ধেক সাদা রঙ নিচের অর্ধেক ও নিচের অর্ধেক সাদা বর্ডারে কালো রঙ।	
জীবানুযুক্ত বর্জ্য (Infectious substance) সাংকেতিক চিহ্ন: বৃত্তের উপর তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি- কালো রঙ পটভূমি: সাদা রঙ		**অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য** (Other hazardous substance) **সাংকেতিক চিহ্ন:** _ উপরের অর্ধেক অংশে সাদা রঙের পটভূমিতে কালো রঙের সাতটি লম্বা দাগ **পটভূমি:** নিচের অর্ধেক কালো বর্ডারে সাদা রঙ।	

অব-১ সঠিকভাবে PPE পরা ও খোলার পদ্ধতি

পারদর্শীতার মানদন্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান কর।
- ধাপ অনুসারে একটির পর একটি পিপিই পরিধান কর।
- অব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ কর।
- আপনার কাজে সহায়তা করার জন্য একজন সহকর্মী প্রস্তুত রাখুন।
- ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত বর্জ্য (বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ) ধারকে ফেলে দিন।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)/প্রয়োজনীয় ম্যাটারিয়্যালস: একটি পিপিই সেটে থাকে-

১. গাউন, ২. পলি এপ্রোন, ৩. অ্যালকোহল প্যাড, ৪. সু-কাভার, ৫. গ্লাভস ২ জোড়া, ৬. এন-৯৫/ সার্জিক্যাল মাস্ক, ৭. চশমা বা গগলস। ৮. হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ, ৯. বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগ ১০। স্যানিক্রথ

কাজের ধারা:

১। প্রথমে হাত ধুয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে। হাতের ওপরে এবং আঙুলের ফাঁকে, আঙুলের পেছনের উঁচু জায়গা এবং বুড়ো আঙুলের পেছনে ভালো করে পরিষ্কার করে হাতের কবজি একইভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর এক জোড়া গ্লাভস পরে নিতে হবে। এসময় খেয়াল রাখতে হবে, গ্লাভস হাতে ফিট করে কিনা। যার হাতে যেটা ফিট করে সেটাই পরা উচিত। এজন্য আগে থেকেই হাতের মাপ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।	
২। তারপর গাউন পরতে হবে। চেষ্টা করতে হবে গাউন যেন মাটির মধ্যে না লাগে। এজন্য গুটিয়ে গাউন পরতে হবে। গাউনের ক্যাপ আগেই পরা যাবে না।	
৩। এরপর মাস্ক পরে নিতে হবে। মাস্কের বাইরের অংশে হাত লাগিয়ে পরতে হবে। মাস্ক পরার পর নাকের ওপরের সিল করা অংশ হাত দিয়ে চেপে বসাতে হবে, যাতে মাস্ক ভালোভাবে বসে যায়।	
৪। এরপর গগলস পরতে হবে। যারা চশমা পরেন তারা চশমা পরার পর গগলস পরবেন। গগলসের দুইপাশে থাকা ফিতার মতো অংশ ভালোভাবে টেনে নিতে হবে। এতে সেটি ভালোমতো ফিট হয়ে যাবে।	
৫। এরপর গাউনের ক্যাপ দিয়ে মাথা ঢেকে নিতে হবে। গগলসের ওপরে দুটি বাটন আছে। এতে গাউনের ক্যাপ ভালোভাবে বসিয়ে নিতে হবে। অনেকসময় গাউন পরার পর গলার অংশে একটু ফাঁক থাকতে পারে। তখন মাইক্রোপোর দিয়ে জায়গাটি বন্ধ করে দিতে হবে। গাউন পরার পর সু -কাভার পরে নিতে হবে।	
৬। এরপর অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য পলি এপ্রোন গাউনের ওপর পরতে হবে। পলি এপ্রোন পেছনে বেঁধে নিতে হবে।	
৭। এখন আরেকটি গ্লাভস পরতে হবে। অর্থাৎ মোট দুইটি গ্লাভস পরতে হবে। গ্লাভস পরার পর হাতের কবজির অংশ ফাঁকা থাকলে আরেকটি মাইক্রোপোর দিয়ে ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে নিতে হবে।	
৮। রোগীর কাছে যাওয়ার আগেই পিপিই খোলার জায়গা বা ডফিং এরিয়া ঠিক করে নিতে হবে। এজন্য বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগ লাগবে। এই ব্যাগটি একটি বিনের ওপর সাজিয়ে নিতে হবে।	

খ। পিপিই খোলার নিয়ম:

১। পিপিই ব্যবহারের পর ডফিং এরিয়াতে এসে স্যানিক্লথ দিয়ে গ্লাভস এবং সু-কাভার প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এবার সু কাভার খুলতে হবে। পেছন দিক থেকে সু কাভার খুলে বিনে ফেলতে হবে।	
২। এরপর পলি এপ্রোন মাথার পেছন থেকে ধরে সামনে এনে খুলে বাইরের দিকটা ভেতরে ঢুকিয়ে ভাঁজ করে বিনে ফেলতে হবে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে আবার হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে।	
৩। এবার প্রথম গ্লাভসটি খুলতে হবে। গ্লাভসের বাইরের অংশ যেন ভেতরের দিকে থাকে সেভাবে খুলতে হবে। পিপিই খোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে, শরীরে যেন কোনো স্পর্শ না লাগে।	
৪। প্রথমে গাউন ও হাতের মাইক্রোপোর খুলে বিনে ফেলতে হবে। এরপর গাউনের চেইন খুলে মাথার ক্যাপ খুলতে হবে। গাউনের হাত উল্টে ভেতরের দিকে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, গাউনের বাইরের দিকটি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত ও ভেতরের দিকটি পরিষ্কার। গাউন ওপর থেকে এমনভাবে খুলতে হবে যাতে বাইরের অংশটি ভেতরে ঢুকে যায় এবং রোল করে খুলতে হবে যাতে মেঝেতে গাউন স্পর্শ না করে। গাউন বিনে ফেলে দেওয়ার পর অ্যালকোহল প্যাড দিয়ে আবার হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে।	
৫। এরপর গগলস খুলতে হবে। গগলস সামনে একহাত দিয়ে ধরে পেছনে ফিতা খুলে নিতে হবে। এবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে আবার হাত পরিষ্কার করে মাস্ক খুলতে হবে। মাস্ক খোলার সময় একহাত দিয়ে মাস্কের বাইরের অংশ চেপে ধরে আরেক হাত দিয়ে একটি একটি করে ফিতা খুলতে হবে। এবার মাস্কও বিনে ফেলে দিতে হবে।	
৬। আবার অ্যালকোহল প্যাড দিয়ে হাত মুছে সবশেষে দ্বিতীয় গ্লাভসটিও খুলে বিনে ফেলে দিতে হবে। যে বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগে এগুলো ফেলা হল সেটি বন্ধ বা সিল করে দিতে হবে। বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগ বন্ধ করার আগে আরেক জোড়া গ্লাভস ও সার্জিক্যাল মাস্ক পরে নিতে হবে।	
৭। এরপর ব্যাগের মধ্যে ১% হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ ফেলে দিয়ে এই ব্যাগ বন্ধ করার সময় মুখ দূরে রাখতে হবে। ব্যাগে ভালো করে প্যাঁচ দিয়ে পিট দিতে হবে। সতর্কতা হিসেবে ব্যাগের বাইরের দিকেও খানিকটা হাইপোক্লোরাইড স্প্রে করে দিতে হবে। এরপর বিনে (বর্জ্য ধারক) রেখে দিতে হবে, যাতে পরবর্তীতে ক্লিনার এসে এটা নিয়ে যেতে পারে।	
৮। সবশেষে যে মাস্ক ও গ্লাভসটি ব্যবহার করা হবে সেগুলো আরেকটি বায়ো হ্যাজার্ড ব্যাগে ফেলতে হবে।	

কাজের সতর্কতা

১. পিপিই কখনোই কর্মস্থলের বাইরে নেয়া যাবে না; ২. পিপিই দিয়ে শরীরের সব অংশ ঢেকে রাখতে হবে; ৩. দুইজন একত্রে পিপিই পরে নিতে হবে। এক্ষেত্রে একজন অপরজনের উপর নজর রাখা যেতে পারে; ৪. পিপিই খোলার সময় খুব সাবধানে খুলে সেটি ঢাকনা দেওয়া নির্দিষ্ট বিনে রাখতে হবে; ৫. পিপিই খোলার সাথে সাথে লোসল করে নতুন কাপড় পরতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি পিপিই পরা ও খোলার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব-২: অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানো

প্রয়োজনীয় ম্যাটারিয়্যালসঃ প্রযোজ্য নহে।

কাজের ধারা:

১। অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রটি নির্ধারিত স্থান থেকে ক্যারি হ্যান্ডেল ধরে নামাতে হবে।

২। অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রটি নিয়ে আগুনের কাছে গিয়ে সেফটি লক ও সেফটি পিন টান দিয়ে খুলতে হবে।

৩। বাতাসের অনুকুলে দাড়াতে হবে,

৪। বাম হাত দিয়ে ডিসচার্জ পাইপের নলটি আগুনের উৎসের দিকে টার্গেট করে রাখতে হবে।

৫। ডান হাত দিয়ে ক্যারি হ্যান্ডেল ধরে নলটি আগুনের উৎসের দিকে তাক করে রাখতে হবে।

৬। অপারেটিং লিভার চাপ দিয়ে এভাবে আগুনের উৎস টার্গেট করে পাইপের নলটি সুইপ করিয়ে আগুন নিভাতে হবে।

- **কাজের সতর্কতা**

১। বাতাসের অনুকুলে ব্যবহার করা।

২। যথাসম্ভব আগুনের নিকটবর্তী অবস্থান থেকে ব্যবহার করা।

৩। সরাসরি মানুষের শরীরে ব্যবহার না করা।

৪। ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা যাতে শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।

৫। সিওটু (CO_2) ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহারের সময় সতর্কতার সাথে এর ডিসচার্জ হর্ন ধরা। অসতর্কতার কারণে কুল বার্ণ হতে পারে।

৬। বিভিন্ন ধরনের আগুনের জন্য বিভিন্ন রকমের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রয়েছে। ভুল শ্রেণির অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারের ফলে আগুন আরও বাড়তে পারে তাই সঠিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

৭। এই নীতি মনে রাখতে হবে, বেরিয়ে যান, বাইরে থাকুন, ফায়ার সার্ভিসকে খরব দিন।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানোর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝ?
২। ওয়ার্কস্টেশন পরিষ্কার রাখার উপায় লিখ।
৩। পেশাগত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে কি বুঝায়?
৪। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই-এর সাধারণ প্রকারভেদ লিখ।
৫। পারসনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট বা পি পি ই (PPE) কাকে বলে?
৬। আপদ বা হ্যাজার্ড বলতে কি বোঝ?
৭। নিরাপদ অপারেটিং পদ্ধতি কাকে বলে?
৮। জরুরি বহির্গমন কি?
৯। ট্যাগিং পদ্ধতি কি?
১০। নসোকোমিয়াল ইনফেকশন কি?
১১। সংক্রামক বর্জ্য বিনের সাংকেতিক চিহ্ন ও কালার কোড কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় করণীয় কি?
২। সঠিক দেহ ভঙ্গি (Body Posture) বজায় রাখা বলতে কি বুঝ?
৩। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বলতে কি বুঝ? এর গুরুত্ব কি?
৪। স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব কি? লিখ।
৫। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নীতিমালাগুলো কি?
৬। অনুজীব ও জীবাণু আপদ কি? আর্গোনোমিক হ্যাজার্ড কাকে বলে?
৭। কর্মক্ষেত্রে আপদ নিয়ন্ত্রণের প্রধান প্রধান উপায় কি?
৮। কয়েকটি অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম-এর নাম উল্লেখ কর।
৯। ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার সহজে মনে রাখার উপায় কি?
১০। নোসোকোমিয়াল ইনফেকশনের প্রকারভেদ কি কি?
১১। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়া বলতে কি বুঝায়?
১২। বর্জ্যের প্রকারভেদ গুলো কিকি? ধারাল বর্জ্যের বিনের সাংকেতিক চিহ্ন, কালার কোড ও পটভূমি কি রকমের?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানসমূহ উল্লেখ কর।
২। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
৩। কর্মক্ষেত্রে প্রধান প্রধান আপদ মোকাবেলায় করণীয় উল্লেখ কর।
৪। বহির্গমন পথের বিধিমালাসমূহ বর্ণনা কর।
৫। দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়ার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
৬। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R সম্পর্কে বুঝিয়ে লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিকের প্রাথমিক ধারণা

Basic concept of patient care technique

কেয়ারগিভিং বা সেবা প্রদান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৈনন্দিন জীবনের আর দশটি স্বাভাবিক কাজের মতই আমরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে নানারকম কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকি। যেমন, বাবার পরিধেয় কাপড়গুলো পরিষ্কার করে দেওয়া, মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, ওষধ খাওয়ার সময় পরিবারের অসুস্থ কাউকে পানির গ্লাসটি এগিয়ে দেওয়া, কখনো বাবা-মা কিংবা বয়স্ক দাদা-দাদী, নানা-নানীর সাথে খোশগল্পে মেতে উঠা। এভাবেই নানাবিধ পারিবারিক কাজে আমরা প্রায়শই সম্পাদন করে থাকি এগুলো কেয়ার গিভিং বা সেবা প্রদানের অত্যন্ত মৌলিক কিছু কার্যাবলি। কেয়ার গিভিং বা সেবা প্রদান কখনো হতে পারে এরকম স্বাভাবিক পারিবারিক কার্যক্রমকে ঘিরে, আবার কখনো কখনো হতে পারে পরিবারের কারো শারীরিক বা মানসিক হালকা থেকে গুরুতর কোনো সমস্যাকে ঘিরে। পরিবারের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে আমাদের মনোযোগ ও কার্যাবলির মূল লক্ষ্য হয়ে উঠে অসুস্থ প্রিয় মানুষটির শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। এভাবেই আমাদের মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে কেয়ার গিভিং বা সেবা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ যা পরবর্তিতে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে ক্যারিয়ার গড়তে আমাদেরকে অনেক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক কী তা বলতে পারবো
- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিভাষা ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারবো
- পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ অনুশীলন করতে পারবো
- পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক সেক্টরের কর্মপরিধি বর্ণনা করতে পারবো
- পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান ও পেশেন্টের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবো

২.১ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক কি?

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক বলতে সাধারণত কিছু সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণের মাধ্যমে একজন ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের তত্ত্বাবধানে থেকে রোগীদের প্রাথমিক যত্ন ও পরিচর্যা প্রদানের কার্যক্রমকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর যিনি এই প্রাথমিক যত্ন প্রদানের কাজটি সম্পন্ন করে থাকেন তাকে বলা হয় পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান বা কেয়ার গিভার বা সেবা প্রদানকারী। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক বা সেবা প্রদানের এই ধারণাটি আমাদের দেশে তুলনামূলক নতুন, কিন্তু উন্নত বিশ্বে এটি অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান যেকোনো বয়সের পেশেন্ট বা রোগী নিয়ে কাজ করে থাকেন। তবে এই সেবা প্রদানের কাজটি অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটু বেশিই প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ এখন আগের চেয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকছে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোগ ও ব্যাধি। বিশ্বায়নের এই যুগে ক্রমবর্ধমান এই বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সাধারণ সেবা দেওয়ার মত সময় অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের হাতে থাকে না। এই জন্য অসুস্থ রোগী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক বা কেয়ারগিভিং সেবা একটি অপরহার্য্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২.২ স্বাস্থ্য কী?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী, স্বাস্থ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা বা ভালো থাকার (ওয়েলবিং) একটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থা; কেবলমাত্র রোগ কিংবা দুর্বলতা না থাকাই নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সংজ্ঞানুযায়ী, একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের চারটি দিক রয়েছে। যেমন-

১। **শারীরিক:** শরীরের বিভিন্ন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ শারীরিক স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় মানব দেহের গঠন ও কার্যক্রমকে যথাক্রমে এনাটমি ও ফিজিওলজি নামে অবহিত করা হয়। যে ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো আছে তার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রক্রিয়াগুলো ভালোভাবে কাজ করছে বলা যায়। এটি শুধুমাত্র রোগের অনুপস্থিতির কারণেই নয়। নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম পুষ্টি এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম সবই শারীরিক সুস্বাস্থ্যের জন্য অবদান রাখে। শারীরিকভাবে সুস্বাস্থের অধিকারী একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং প্রত্যাহিক জীবনের দৈনন্দিন কর্মকান্ড সাধারণত নিজে নিজেই সম্পাদন করতে পারেন।

২। **মানসিক:** মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যের এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজের সক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, জীবনের স্বাভাবিক চাপের সাথে মোকাবিলা করতে পারে এবং উৎপাদনশীল এবং ফলপ্রসূভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে তার সামাজিক গোষ্ঠী বা কমিউনিটিতে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

৩। **সামাজিক স্বাস্থ্য:** সামাজিক স্বাস্থ্য বলতে সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গঠন ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সংযুক্ত হবার ও অবদান রাখার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত সক্ষমতাকে বুঝায়। এটি বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে আমরা কতটা স্বাচ্ছন্দে মানিয়ে নিতে পারি তার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক সম্পর্ক আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৪। **আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য:** আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য বলতে একটি অতিমানবীয় শক্তির উপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করে বিভিন্ন কর্মকান্ড ও আচরণের মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক বিষয়কে বুঝানো হয়। আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য মানুষের জীবনের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দিকগুলোর মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে।

২.৩ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিভাষা

স্বাস্থ্য সেবায় কাজ করতে গেলে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংক্ষেপিত রূপ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শব্দসমূহ সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। কোনো শব্দ যদি ভুলভাবে ব্যবহার কিংবা ব্যখ্যা করা হয়, এর পরিণতি ভুল বোঝাবুঝি থেকে শুরু করে রোগীর মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। এইজন্য এই সকল শব্দ ও পরিভাষা খুবই সতর্কতার সাথে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার পূর্বশর্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেকোনো শব্দ মূলত দুই, তিন বা তার বেশি অংশে গঠিত। যেমন:

প্রিফিক্স	রুট	সাফিক্স
একটি শব্দাংশ যেটি শব্দমূলের পুর্বে বসে তার অর্থ পরিবর্তন করে থাকে।	রুট হলো একটি শব্দাংশ যেটি শব্দটির মূল অর্থ ধারন করে থাকে। প্রিফিক্স ও সাফিক্সের মাঝের অংশটুকুই হলো মূলত রুট বা শব্দমূল।	সাফিক্স শব্দমূলের পরে বসে এর অর্থ পরিবর্তন করে থাকে। সাফিক্স ও প্রিফিক্স সাধারণত একাকী ব্যবহৃত হয়না।

যেমন: প্রিফিক্স Dys (Difficult) এবং শব্দমূল pnea (breathing) এর সমন্বয়ে আমরা পাই Dyspnea (ডিসনিয়া) যার অর্থ difficulty breathing বা শ্বাসপ্রশাসে জটিলতা। আবার, মাস্ট বা mast (স্তন) শব্দমূল সাফিক্স ectomy (কেটে) এর সাথে সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয় mastectomy, যার অর্থ হলো স্তন অপসারণ করা। এভাবে সচরাচর ব্যবহৃত হয় এরকম কিছু স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সম্পর্কিত কিছু পরভাষার অর্থ বুঝা ও প্রয়োগ করা একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের জন্য অপরিহার্য।

মেডিকেল এরিয়া	শব্দমূল উদাহরণ
Agents of Infection- Fungi	'myc' meaning 'fungus' as in 'mycosis'
Body Fluids- Saliva	'sial' meaning 'saliva' as in 'sialogram'
Body structure or anatomy- regions of the body	'pneumon' meaning 'lung' as in 'pneumonia'
Chemical compounds- sugar	'gluc' meaning 'sugar' as in 'glucose'
Colours	'leuk' meaning 'white' as in 'leukomia'
Physical factors- temperature	'therm' meaning 'heat' as in 'thermometer'

Prefix	Meaning	Prefix	Meaning	Suffix	Meaning
a- or –an	without	hypo-	deficiency	algia	Pain
ab-	away from	inter-	between	cele	Swelling
ad-	towards	intra	inside	dema	Swelling
anti	against	pan-	all	Ectomy	Surgical removal
asthen	weakness or lack	poly	Many	ism	Condition
bi	two	post	After or behind	itis	Inflammation
endo	within	pre	before	osis	Disease or condition
edem-	Swelling	sub	Below	pathy	Disease
epi	upper	Super/supra	Above	Sclerosis	Hardening
hyper	Excessive	trans	Across		

এ সংশ্লিষ্ট কিছু উদাহরণ নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

মূল শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	প্রায়োগিক অর্থ
Tachycardia	ট্যাকিকার্ডিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হৃদস্পন্দন
Bradycardia	ব্র্যাডিকার্ডিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে কম হৃদস্পন্দন
Hypertension	হাইপারটেনশন	স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপ
Hypotension	হাইপোটেনশন	স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তচাপ
Polyuria	পলিইউরিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে প্রশাবের পরিমাণ বেশি হওয়া
Oliguria	অলিগুরিয়া	স্বাভাবিকের চেয়ে প্রশাবের পরিমাণ কম হওয়া
Hyperthermia	হাইপারথার্মিয়া	শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়া
Hypothermia	হাইপোথার্মিয়া	শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যাওয়া
Asthma	এজমা	হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট
Acute	একিউট	রোগের তাৎক্ষণিক তীব্র অবস্থা
Chronic	ক্রনিক	রোগের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা
Lungs	লাংগ্স	ফুসফুস
Heart	হার্ট	হৃৎপিন্ড
Kidney	কিডনি	বৃক্ক
Brain	ব্রেইন	মস্তিষ্ক
Liver	লিভার	যকৃত
Stomach	স্টোমাক	পাকস্থলি

শরীরের অবস্থান বর্ণনা করার জন্য বিশেষ কতগুলো পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন:

- External- বহিঃস্থ, বর্হিভাগ, বাহির
- Internal- অন্তঃস্থ, অভ্যন্তর, ভিতর
- Anterior- সম্মুখাংশ, সম্মুখ, সামনে
- Posterior- পশ্চাদাংশ, পশ্চাৎ, পেছনে
- Lateral- পার্শ্ব, পার্শ্বদিকে
- Distal- দূরবর্তী অংশ, কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে
- Medial- মধ্যবর্তী অংশ, মধ্যরেখার কাছাকাছি
- Proximal- নিকটবর্তী অংশ, কেন্দ্রস্থল অভিমুখে
- Superficial- উপরে বা উপরিভাগে, ভাসমান অংশ
- Deep- ভিতরে বা গভীরে
- Peripheral- প্রান্তীয়, দূরবর্তী

Abbreviation বা সংক্ষেপিত শব্দ:

Abbreviation বা সংক্ষেপিত শব্দ হলো চিকিৎসা সম্পর্কিত পরিভাষার সংক্ষিপ্ত রূপ যেটা কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সময় ও স্থান সেইভ করে। এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য শব্দ সংক্ষেপ ব্যবহার করতে হয়। সঠিক শব্দ জানা না থাকলে অনুমানের উপর ভর করে না লিখে তার পূর্ণ রূপ লেখতে হয় যাতে করে সঠিক যোগাযোগ নিশ্চিত হয়। সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে ওষধ খাওয়াতে গেলে প্রেসক্রিপশনে থাকা নির্দেশনা সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য শব্দ-সংক্ষেপ জানা অতীব জরুরি। বহুল ব্যবহৃত কিছু মেডিক্যাল এব্রেভিয়েশন হলো:

সংক্ষেপিত রূপ	পূর্ণ রূপ	সংক্ষেপিত রূপ	পূর্ণ রূপ
BID	Twice a day	NaCl	Sodium Chloride
TDS	three times a day	DM	Diabetes Mellitus
Ac	before meals	DOB	Date of Birth
Amp	Ampule	ENT	Ear, Nose, Throat
Ant.	Anterior	HTN	hypertension
BMI	Body Mass Index	Hx	history
BP	Blood Pressure	Inj.	Injection
RBS	Random Blood Sugar'	IM	Intramascular
FBS	Fasting Blood Sugar	IV	Intravenous
C.C.	Chief Complaint	SC	Sub cutenous
C/O	Complaints of	Mm of Hg	Milimeters of Mercury
C&S	Culture and Sensitivity	mMol	Mili mole
CBC	Complete Blood Count	Rx	Prescription
Cap.	Capsule	Syr	Syrup
Tab.	Tablet	Tsp	Teaspoon
cc	Cubic Centimeter	RBC	Red Blood Cell
Cm	Centimeter	WBC	White Blood Cell
CNS	Central Nervous System	Mcg	microgram
XR	x-ray	NS	Normal Saline
CXR	chest x-ray	ICU	Intensive Care Unit

২.৪. স্বাস্থ্য সেবা দানকারী দলের সদস্য হিসেবে কাজ করা

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে কাজ করতে হয় একটি হেলথ কেয়ার টীম বা স্বাস্থ্য সেবা দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে। এই দলটি গঠিত হয় ক্লায়েন্ট বা সেবা গ্রহীতা ব্যক্তি, তার পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এবং স্বাস্থ্য সেবা দানকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা পেশাজীবীর সমন্বয়ে।

চিত্র ২.১: স্বাস্থ্য সেবাদানকারী দল

স্বাস্থ্যসেবা দানকারী দলের প্রত্যেকেরই আছে সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের দলীয় উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়নের জন্য অবদান রেখে থাকেন, যা হলো একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রোগীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা প্রদান করা। স্বাস্থ্য সেবা দলের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে 'পেশেন্ট বা রোগী বা ক্লায়েন্ট' এবং বাকি সদস্যরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে থাকে। একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের জন্য স্বাস্থ্য সেবা দলের বিভিন্ন সদস্যদের সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচের ছকে এ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

স্বাস্থ্য সেবাদানকারী দলের সদস্য	প্রধান কর্তব্যসমূহ
ডাক্তার	রোগীর রোগ নির্নয়ের কাজটি করে থাকেন, চিকিৎসা ও ঔষধের নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন, মেডিক্যাল অর্ডার দিয়ে থাকেন এবং মেডিক্যাল কেয়ারের সামগ্রিক কাজটি তদারকি করে থাকেন। একজন ডাক্তারের বিশেষায়িত প্র্যাকটিসের ধরন বহুবিধ হতে পারে যেমন: কার্ডিওলোজিষ্ট, নিউরোলোজিষ্ট, বা ইউরোলোজিষ্ট, সার্জন, সাইকিয়াট্রিষ্ট বা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি।
রেজিস্টার্ড নার্স	রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় হেল্‌থ এসেসমেন্টের কাজ করা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কেয়ার প্ল্যান প্রস্তুত করা ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নার্সিং সেবা প্রদান করা, নার্সিং ও অন্যান্য অধীনস্ত স্বাস্থ্য সেবা সদস্যদের কাজের তদারকি করা। ডাক্তারের ন্যায় একজন নার্সেরও বিশেষায়িত সেবার বিভিন্ন ধরন হতে পারে; যেমন আইসিইউ নার্স, মেনটার হেল্‌থ এন্ড সাইকিয়াট্রিক নার্স, পেডিয়াট্রিক নার্স প্রভৃতি।
ফিজিওথেরাপিষ্ট	শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রিত নড়চড়া বা ব্যায়ামের মাধ্যমে রোগীর শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
স্পীচ থেরাপিষ্ট	রোগীর কথা বলা, চাবানো বা গলধকরণের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
অকুপেশনাল থেরাপিষ্ট	রোগীর প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকান্ড নিজে নিজের সম্পাদন করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট থেরাপি বা কর্মসূচি প্রদান করা।
ডায়েটিশিয়ান	রোগীর চাহিদা ও খাদ্য-পুষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী ডায়েট প্ল্যান করে থাকেন যেটা রোগীকে সেরে উঠতে বা সুস্থ থাকতে সহায়তা করে।
সোশ্যাল ওয়ার্কার	একজন পেশাজীবী যিনি রোগীর প্রাত্যহিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে রোগীকে সামাজিক ও মানসিকভাবে কর্মক্ষম রাখতে ভূমিকা রাখান।
সাইকোলোজিষ্ট	মানসিক রোগ নির্নয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের কাজটি করে থাকেন।
ফার্মাসিষ্ট	ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীকে ঔষধ প্রদানের কাজটি করে থাকেন এবং রোগীকে ওষধ সেবনের পদ্ধতি, এর কার্যকারিতা ও সাইড ইফেক্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হেল্‌থ এডুকেশন দিয়ে থাকেন।
প্যাথোলোজিষ্ট	ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীর রোগ নির্নয়ের জন্য বিভিন্ন ল্যাব টেস্টের কাজটি করে থাকেন এবং রোগ নির্নয়ে ডাক্তারকে সহযোগীতা করে থাকেন।

২.৫ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কর্মক্ষেত্র

একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান স্বাস্থ্য সেবার অনেক জায়গায় কাজ করতে পারেন। সেবার ধরন অনুযায়ী এগুলো অনেক রকমের হতে পারে। সকল সেটিংসেই পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কাজের ধরন মোটামুটি একই রকম। যেমন:

হাসপাতাল বা ক্লিনিক: হাসপাতাল বা ক্লিনিক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কিছু কিছু হাসপাতাল হচ্ছে জেনারেল, যেখানে সবধরনের রোগীকে সেবা দেওয়া হয়। আবার বিশেষায়িত হাসপাতালে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সেবা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ; মেডিসিন, সার্জারি বা অপারেশন সংক্রান্ত, কার্ডিওলোজি বা হৃদযন্ত্র সম্পর্কিত, ইমারজেন্সি বা জরুরি সেবা, ইনটেনসিভ কেয়ার বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র, সাইকিয়াট্রিক বা মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, মেটার্নাল ও চাইল্ড হেলথ বা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রভৃতি।	
ডাক্তারের চ্যাম্বার: ডাক্তারগণ সাধারণত তাদের বিশেষায়িত দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন হাসপাতাল বা ক্লিনিকের পাশাপাশি ব্যক্তিগত চ্যাম্বারেও রোগী দেখে থাকেন। এসকল ক্ষেত্রে রোগীর বিভিন্ন শারীরিক ভাইটাল সাইন বা অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণসমূহ পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়ে থাকে।	
নার্সিং হোম: নার্সিং হোম হল বয়স্ক বা কোনো শারীরিক বা মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের আবাসিক যত্ন প্রদানের একটি সুবিধাস্থল। নার্সিং হোমগুলোকে দক্ষ নার্সিং সেবা কেন্দ্র, দীর্ঘমেয়াদী যত্ন প্রদান কেন্দ্র, ওল্ড হোম, এসিস্টেড লিভিং কেসিলিটি, বিশ্রামের ঘর, নিরাময় হোম হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে। নার্সিং হোমের ধারণাটি আমাদের দেশে এখনো প্রচলিত নয়, তবে উন্নত বিশ্বে এটি বহুল পরিচিত।	
বৃদ্ধাশ্রম বা ওল্ড হোম: ওল্ড হোম হল এমন একটি জায়গা যেখানে বয়োঃবৃদ্ধগণের যত্ন করা হয়, যারা সাধারণত নিজেদের স্বাভাবিক কার্যাবলি শারীরিক দুর্বলতার কারণে আগের মত নিতে পারেন না তাদের পরিচর্যা করা হয়। এ ধরনের সেবাকেন্দ্র আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে।	
হোম কেয়ার সেবিসেস: বর্তমানে অনেক ব্যক্তিই নিজের বাড়িতে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে থাকেন। হোমকেয়ার এজেন্সিগুলো ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের বয়সের মানুষের জন্যই বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে মূলত সার্বক্ষণিকভাবে একজন কেয়ারগিভারের মাধ্যমে রোগী বা ক্লায়েন্টকে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি ডাক্তার বা নার্সের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই ধারণাটি খুবই সাম্প্রতিক হলেও অল্প কদিনেই এর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময়কাল থেকে বহু হোম কেয়ার এজেন্সি এ ধরনের সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করেছে, যেখানে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করার জন্য ব্যাপক সংখ্যক কেয়ারগিভারের চাহিদা রয়েছে।	

ডে-কেয়ার সেন্টার: ডে কেয়ার সেন্টার হলো সাধারণত এমন একটি সেবা প্রদান কেন্দ্র যেখানে কর্মজীবি বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাকে রেখে চাকুরী বা অন্যান্য কাজ করে থাকে। এ ধরনের সেবা কেন্দ্রে বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাদেরকে গোসল করানো, খাবার খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো এরকম নানারকম কাজ সম্পাদন করতে হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে বাচ্চাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি বাচ্চাদের সার্বিক যত্নে কেয়ারগিভার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।	
হস্পাইস কেয়ার সেন্টার: হস্পাইস (বা হস্পিস) কেয়ার সেন্টারে অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন, স্বাচ্ছন্দ ও জীবন মানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সেবা প্রদান করা হয় । এরূপ কোনো কোনো সময় কোনো গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওষধ বা অন্য কোনো উপায়ে রোগ নিরাময় সম্ভব না হলে তার মৃত্যু প্রক্রিয়াটিকে সহজ ও সহনশীল করার জন্য এ ধরনের সেবা প্রদানের পদ্ধতি উন্নত বিশ্বে চালু আছে। আমাদের দেশেও এটির প্রচলন আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে যেখানে প্রচুর সংখ্যক কেয়ারগিভারের প্রয়োজন রয়েছে।	

২.৬ গৃহে রোগীর পরিচর্যা

হোম কেয়ার সেটিংসে অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা দেওয়ার জন্য কেয়ারগিভারকে বিশেষ কিছু বিষয়ে নজর দিতে হয়। বাড়িতে রোগীকে আরাম ও বিশ্রাম দেওয়ার জন্য কোলাহলমুক্ত, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা দরকার। আর সে কারণেই রোগীর জন্য আলো বাতাস পূর্ণ, স্বাস্থ্যসম্মত একটি পৃথক কক্ষের প্রয়োজন হয়। রোগীকে নির্দিষ্ট কক্ষে রেখে তার উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা করতে পারলে রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি, রোগমুক্তি আরোগ্য, আরাম অথবা উপশম করা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

রোগীর কক্ষের সাজসরঞ্জাম: রোগীর কক্ষটি খোলামেলা ও ছিমছাম হলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম রোগীর কক্ষে রাখা উচিৎ নয়। শুধুমাত্র রোগীর উপযুক্ত পরিচর্যা ও প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখতে হয়, যাতে সহজেই তা হাতের কাছে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

- থার্মোমিটার, স্ফিগমোমেনোমিটার, স্টেথোস্কোপ; চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র ও ফাইল
- ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র
- ঔষধ মাপার কাপ (মেজারিং কাপ) ও চামচ; ফিডিং কাপ, গ্লাস, প্লেট ও পানির জগ
- বেডপ্যান, ইউরিনাল, গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যাগ
- ঘড়ি, কলিং বেল, টর্চ লাইট; সহায়ক লাঠি, ক্রাচ কিংবা হুইলচেয়ার; প্রয়োজন হলে
- রুম হিটার ও ওয়াটার হিটার, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি বা ফার্স্ট এইড বাক্স
- বালতি, মগ, সাবান, শ্যাম্পু, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

২.৭ রোগীর কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

রোগীর কক্ষের ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথমে কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। কক্ষের আসবাবপত্র, রোগীর পোষাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, বালিশ, চাদর সবকিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখা দরকার। পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে সহজে রোগ নিরাময় বা আরামদায়ক অবস্থা নিশ্চিত হয়। অপরদিকে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ রোগীর জন্য মোটেও নিরাপদ নয়; এটি রোগীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর। রোগীর ঘর প্রতিদিন ফিনাইল বা ডেটল পানি দিয়ে ভালো করে মুছতে হবে। রোগীর ব্যবহৃত প্লেট, গ্লাস, বেডপ্যান ইত্যাদি সরঞ্জাম প্রতিদিন ডিশ পাউডার ও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে শুকনো করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। কক্ষের দরজা ও জানালায় সাদা ও হালকা রঙের পর্দা ব্যবহার করলে ভালো হয়। পর্দা ব্যবহার করলে বাইরের ধুলাবালি ও কড়া রোদ কক্ষে প্রবেশ করতে পারেনা। রোগীর ব্যবহৃত প্রতিদিনের ময়লা কাপড়গুলো প্রতিদিন ভালোভাবে ধুয়ে শুকাতে হবে। এছাড়া বিছানার চাদর, বালিশের কাভার, মশারি, তোয়ালে বা গামছা, রুমাল ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। দরজা ও জানালার গ্রিল ডেটল পানি দিয়ে মুছতে হবে। রোগীর ব্যবহারের লেপ, তোষক, কম্বল, কাঁথা ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে। রোগির মলমূত্রাদি যথাসম্ভব দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। রোগীর কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম, টয়লেট প্রতিদিন ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে। মেঝে পরিষ্কার ও জীবানুমক্ত রাখতে হবে। রোগীর কক্ষে যেন মশা-মাছির উপদ্রব না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর কক্ষ ও বসবাসের পরিবেশ ভালো হলে তা রোগীর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠার জন্য সহায়ক হয়।

২.৮ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য খাত একটি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বলা হয়ে থাকে, যে দেশের জনগণ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এগিয়ে, সে দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে গতিশীল। হেল্‌থ কেয়ার সিস্টেম বলতে স্বাস্থ্য চাহিদা মেটাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদের একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাকে বুঝানো হয়। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, বিভিন্ন এনজিও ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সরকারি খাতে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এটি বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সামগ্রিক কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। এর অধীনস্ত কয়েকটি অধিদপ্তরের নাম হলো; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মেডিকেল শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর প্রভৃতি। সরকারি খাতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূলত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা: প্রাইমারি বা প্রাথমিক, সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক ও টারশিয়ারি বা প্রান্তিক। এই তিনটি পর্যায়ে আছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে। অনেক সময় স্বাস্থ্য সমস্যার জটিলতার কারণে একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পর্যায়ের সেবাও গ্রহণ করতে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে তিন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। যথা: গ্রাম্য পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে আছে ইউনিয়ন সাব-সেন্টার এবং উপজেলা বা থানা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা হেল্‌থ বা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এরপর, জেলা পর্যায়ে আছে জেলা সদর হাসপাতাল যেগুলোকে বলা হয় মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। জেলা হাসপাতালসমূহের সেবা দানের পরিধি ও ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে একটু বিস্তৃত। আবার টারশিয়ারি বা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে চিত্রের সাহায্যে সহজেই বুঝা যায়:

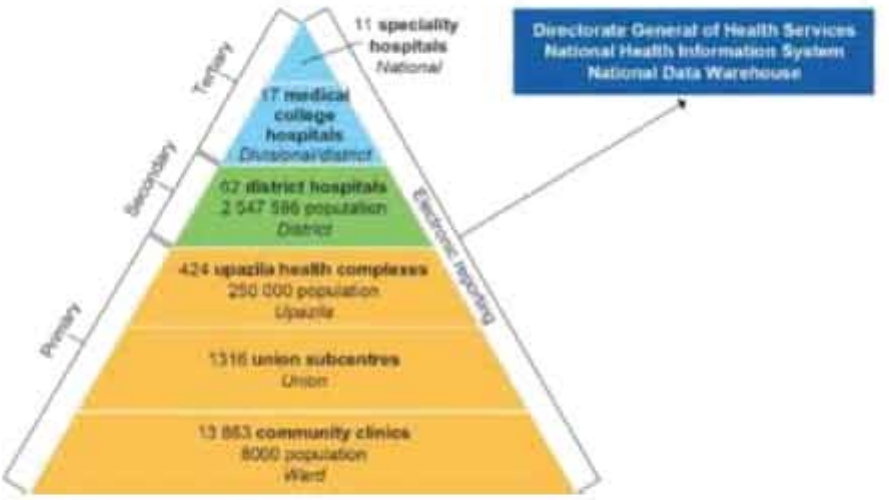

চিত্র ২.২: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পিরামিড

২.৯ হাসপাতালে প্রদত্ত সেবাসমূহ

একটি হাসপাতাল বা ক্লিনিক রোগীর প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে সাধারণত সব ধরনের রোগিকেই চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। একইভাবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গুলোতেও সব ধরনের রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে বিভাগীয় পর্যায়ের বিশেষায়িত বা স্পেশালাইজড হাসপাতালসমূহে নির্দিষ্ট ধরনের রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয় যেমন: জাতীয় মানসিক হাসপাতালে শুধু মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। আবার একইভাবে, জাতীয় কিডনি হাসপাতালে শুধুমাত্র কিডনী রোগী, জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে শুধুমাত্র হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে সেবা দেওয়া হয়। একইভাবে নাক-কান-গলা, ফুসফুস ও শ্বসণযন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি নির্দিষ্ট অঙ্গপান বা অঙ্গ সংশ্লিষ্ট রোগের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত হাসপাতাল রয়েছে। আবার মেডিকেল কলেজ বা জেনারেল হাসপাতালসমূহে বিশেষায়িত রোগীর পাশাপাশি সাধারণ সকল ধরনের রোগীর জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শিটকোর্ড হাসপাতাল প্রভৃতি। নিম্নে একটি বৃহৎ হাসপাতালে যে ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে তার একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

- **ইমার্জেন্সি বা জরুরি বিভাগ**
  যেকোনো সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি পর্যায়ের হাসপাতালেই জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যায় আগত রোগীদের তাৎক্ষনিকভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য ২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সি বা জরুরি বিভাগ চালু থাকে। এখানে সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষক ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স, আয়া, ওয়ার্ডবয় ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী সবসময়ই থাকতে হয়। যেকোনো হাসপাতালের সবচে' ব্যস্ততম বিভাগ হলো এই জরুরি বিভাগ। এখানে বিভিন্ন জরুরি সমস্যা নিয়ে রোগী আসলেও সড়ক বা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরাই বেশি আসেন। এছাড়াও হার্ট এটাক, ব্রেইন স্ট্রোক এধরনের রোগীও এসে থাকেন।
- **বহির্বিভাগ**
  বহির্বিভাগ সেবা একটি হাসপাতালের নিয়মিত সেবাদান পদ্ধতি। এখানে রোগীরা তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসমস্যা নিয়ে এসে টিকেট কাটার পর নির্দিষ্ট ডাক্তারের সাথে কথা বলার জন্য লাইনে অপেক্ষা করে।

সাধারণত যে সকল সমস্যা আপাতত তেমন ইমার্জেন্সি নয় সেগুলোই বহির্বিভাগে দেখানোর উপযোগী। বহির্বিভাগে রোগীর জন্য কোনো শয্যা বা রাত্রিযাপনের ব্যবস্থার প্রয়োজন পরেনা। ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী যদি কোনো রোগীর ভর্তির প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে অন্তঃবিভাগ বা ইনডোর সেবার জন্য ব্যবস্থা নিতে হয়। কিংবা কিছু নির্দেশনা গ্রহণ করে রোগী বাসায় চলে যায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর আবার ফলো আপ ভিজিটে আসেন।

- **অন্তঃবিভাগ বা ইনডোর**
  হাসপাতাল অন্তঃবিভাগ: ভর্তিকৃত রোগীকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এখানে। রোগীর সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ইনডোর বা অন্তঃবিভাগ রয়েছে। যেমন:
  - মেডিসিন বিভাগ- যেখানে শুধু ঔষধ বা ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা পাবে এরকম রোগীকে ভর্তি রাখা হয়।
  - সার্জারি ইউনিটে অপারেশনের রোগীদেরকে রাখা হয়।
  - শিশু বিভাগ অসুস্থ শিশুদেরকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।
  - গাইনি ওয়ার্ডে প্রসুতি এবং গাইনি সমস্যা নিয়ে আসা মায়েদের রাখা হয়।

চিত্র ২.৩: ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে এম্বুলেন্স থেকে রোগী নামানো হচ্ছে

চিত্র ২.৪: একটি বহির্বিভাগ টিকেট কাউন্টার।

চিত্র ২.৫: টারশিয়ারি লেভেল হাসপাতালের মেডিসিন অন্তঃবিভাগ

- **প্যালিয়েটিভ কেয়ার:** এখানে গুরুতর অসুস্থ রোগী যেমন ক্যান্সারে আক্রান্ত গুরুতর অসুস্থ এরকম ব্যক্তিকে রেখে উপশমকারী সেবা বা প্যালিয়েটিভ কেয়ার দেওয়া হয়।
- **অপারেশন থিয়েটার:** ছোট বড় বিভিন্ন স্পেশালিটির অপারেশনের সুবিধাগুলো বড় বড় হাসপাতালে থাকে। বিশেষজ্ঞ সার্জনের নেতৃত্বে তার দল এই কাজগুলো করে থাকে।

এছাড়াও থাকে প্যাথোলজি বিভাগ যেখানে রোগ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন নমুনা পাঠানো হয়। ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট থাকে যেখানে রোগীদের জন্য ওষধ-পত্র পাওয়া যায়। রোগীদের পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার জন্য থাকে ফুড এন্ড ডায়েট ডিপার্টমেন্ট। বড় বড় সরকারি হাসপাতাল গুলোতে অসহায় ও দুঃস্থ রোগীর আর্থিক সহায়তার জন্য থাকে সমাজ কল্যাণ বিভাগ যেগুলো সাধারণত বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন পরিচালিত।

২.১০ হাসপাতালে রোগীকে সেবাদান

যেকোনো হাসপাতালেই রোগীকে সেবাদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি আছে যেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করে যেকোনো ব্যক্তি বা রোগী বাংলাদেশের যেকোনো হাসপাতালে সেবা নেয়ার অধিকার রাখা। কোনো রোগী হাসপাতালে আসলে আনুসঙ্গিক কাজ-কর্ম সারার পর ডাক্তার যখন রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তখনি মূলত চিকিৎসা সম্পর্কিত মূল কাজটি আরম্ভ হয়। চিকিৎসা প্রথমেই রোগীর সমস্যা শুনেন, কিছু প্রশ্ন ও পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেন এবং একটা সাময়িক বা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস করে থাকেন। এর উপর ভিত্তি করে ডাক্তার প্রয়োজন ভেদে বিভিন্ন উন্নত পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। পরিপূর্ণভাবে রোগ নির্নয়ের পরই ডাক্তার নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা দিয়ে থাকেন যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারিত হয়।

রোগীর ইতিহাস গ্রহণ, রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা

একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কর্মস্থলে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের অন্যান্য উপাদান সমূহের পাশাপাশি রোগীর নিরাময় মূলক সেবাসমূহ প্রদান করে থাকেন। তিনি কর্মস্থল-এ অবস্থান করে সাধারণ রোগসমূহ নির্ণয় ও ইহার ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনে রেফার করতে সক্ষম হবেন। সেবা গ্রহীতার অসুবিধা সমূহের জন্য প্রথমে তাকে রোগ নির্ণয় করতে হয়। এই জন্য রোগীর পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে করা হলে রোগ নির্ণয় করা সহজতর হবে। পদক্ষেপ সমূহ উল্লেখ করা হল:

১. রোগীর ইতিহাস গ্রহণ

২. রোগীর শারীরিক পরীক্ষা

(ক) রোগীর সাধারণ পরীক্ষা ও

(খ) রোগীর সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা

৩. ল্যাবরেটরি পরীক্ষা: যখনই রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন তখন সেবা প্রদানকারী রোগের ব্যবস্থাপনা দিবেন। ব্যবস্থাপনা দিতে সমর্থ না হলে তিনি উপযুক্ত কোনো হাসপাতাল/ ক্লিনিক বা চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং পরবর্তীতে রোগীর চিকিৎসার জন্য ফলোআপ করতে হবে।

রোগীর সীমিত নিরাময়মূলক সেবা প্রদান পদ্ধতি:

১) রোগীর ইতিহাস গ্রহণ: হাসপাতালে প্রথম যখন একজন রোগী আসেন তখন চিকিৎসক প্রথমেই রোগীর পূর্ণ ইতিহাস নেন। তার অসুখটি কীভাবে হলো, কখন থেকে হলো, কতদিন ধরে আছে- সম্পূর্ণ ইতিহাসটি তার কাছ থেকে নেওয়া হয়। এগুলোকে বলা হয় রোগীর চীফ কমপ্লেইন বা মূল সমস্যা নেওয়ার পর পারিবারিক ইতিহাস নেওয়া হয়। জানা হয়, তার পরিবারে এ সমস্ত রোগ আছে কি না। এরপর তার অতীত ইতিহাস নেওয়া হয়। এই রোগটি তার আগে কখনো ছিল কি না, সেটি জানা হয়। তার মেডিক্যাল, সার্জিকেল দুটো ইতিহাসই নেওয়া হয়। নারী হলে তার নারীস্বাস্থ্যের ইতিহাসটিও নেওয়া হয়। তার পেশাগত ইতিহাসও নেওয়া হয়। সে ধূমপান করে কি না, মদ্যপান করে কি না, সেগুলোও জানা হয়। অথবা মাদকাসক্ত কি না সেগুলোও জানা হয়। এগুলো নেওয়ার পর জিজ্ঞেস করা হয়, আরো কোনো অসুবিধা আছে কি না।

- **বর্তমান প্রধান অসুবিধা সমূহ:** কি কি অসুবিধা; কতদিন যাবৎ অসুবিধা; অসুবিধা সমূহের ইতিহাস যেমন- অসুবিধার ধরন, কিসে অসুবিধা বাড়ে বা কিসে কমে।
- বিস্তারিত ইতিহাস; অতীত ইতিহাস; পারিবারিক ইতিহাস (পরিবারের অন্যান্যদের এই অসুবিধা আছে কি না); ব্যক্তিগত ইতিহাস (ধুমপান, তামাক, পান, জর্দা বা অন্যান্য; পেশাগত ইতিহাস, খাদ্যাভ্যাস (পানির উৎস, ক্ষদনন্দিন খাবার দাবার ইত্যাদি); মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের ইতিহাস।

২) শারীরিক পরীক্ষা: এরপরের পর্যায় হলো, রিভিউ অব সিস্টেম। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা দেখা হয়। যদি রোগী কাশি নিয়ে আসে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয় অ্যাজমা, ব্রংকাইটিস বা অ্যালার্জি ছিল কি না। রিভিউ অব সিস্টেমের (পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ) ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে যাওয়া হয়। শুরু হয় চোখ দিয়ে। তার চোখে কোনা অসুবিধা আছে কি না। দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ার সমস্যা আছে কি না। তার মাথাব্যথা রয়েছে কি না। তার প্রতিটি সিস্টেম (পদ্ধতি) অনুযায়ী অবস্থা জিজ্ঞেস করা হয়।

- **দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ:** রক্তস্বল্পতা পরীক্ষাবা জন্ডিস, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয়, ইডিমা পরীক্ষা, ওজন মাপ (শিশুদের ও গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে), সায়ানোসিস, স্ফীত লসিকা গ্রন্থি পরীক্ষা

রোগীর সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা: রোগীর প্রধান অসুবিধা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরীক্ষাসমূহ।

উদাহরণ-১: পেটে ব্যথার ক্ষেত্রে - পেট পরীক্ষা করতে হবে; পেটের কোথায় ব্যথা- নাভীর চারদিকে কিংবা তলপেটে; পেট ফুলে আছে কি না, টেন্ডার কিনা ইত্যাদি।

উদাহরণ-২: শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে - বুক পরীক্ষা (ফুসফুস ও হৃৎপিন্ড) করতে হবে।

উদাহরণ-৩: কোনো ক্ষত থাকলে (ক্ষতের পরীক্ষা করা, ক্ষত হতে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না, ক্ষত পরিষ্কার আছে কি না, ক্ষতে কোনো ইনফেকশন সংক্রমণ চিহ্ন আছে কি না, ক্ষতে কোনো বাহ্যিক বস্তু বা Foreign Body আছে কিনা)।

ব্যবস্থাপনা: ব্যবস্থাপনার ৪টি পর্যায়, যথা:

১। সাধারণ ব্যবস্থাপনা যেমন- রোগীর বিশ্রাম ও রোগের কারণ অনুযায়ী খাদ্য নির্ণয়

২। লক্ষণ ও উপসর্গের ব্যবস্থাপনা। যেমন- ব্যথার জন্য ব্যথানাশক বড়ি

৩। নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা- রোগের কারণ নির্ণয়পূর্বক চিকিৎসা প্রদান। যেমন- কৃমিনাশক বড়ি।

৪। জটিলতার ব্যবস্থাপনা। যেমন- কৃমির জন্য যদি ইন্টেসটিনাল অবষ্ট্রাকশন বা অন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে উন্নতর চিকিৎসা প্রদান।

চিকিৎসকগণ এভাবে রোগের ইতিহাস গ্রহণ করার মাধ্যমে উপসর্গসমূহ এবং পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ বিশ্লেষণ পূর্বক সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করে বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসা বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান দিয়ে থাকেন। এই সামগ্রিক কাজটি এক জনের নেতৃত্বে হলেও কাজটি কখনোই একা করা সম্ভব হয়না। নার্স, প্যাথোলোজিষ্টসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী সবাই মিলে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম হিসেবে এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হয়। ডাক্তার, নার্সসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পেশাজীবিদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করে এবং নিজেদের কার্যপরিধিতে উল্লেখিত সেবাসমূহ রোগীদেরকে সুচারুরূপে প্রদান করার মাধ্যমে কেয়ারগিভার এই স্বাস্থ্যসেবা দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

২.১১ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান সাধারণত একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক্তার বা নার্স বা অন্যান্য পেশাদার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে একজন অসুস্থ, আহত বা অক্ষম (ডিসেবল্ড) ব্যক্তিকে প্রাথমিক ও মৌলিক সেবা প্রদানের কাজ করে থাকে। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার একটি বড় অংশ হচ্ছে অসুস্থ, আহত বা অক্ষম ব্যক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান করা যেমন; খাওয়ানো, গোসল করানো, জামা-কাপড় পরিধান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সহায়তা প্রদান করা, টয়লেট ব্যবহার ও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে সহায়তা প্রদান করা প্রভৃতি। এছাড়াও, চিকিৎসকের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী বেসিক হেল্‌থ স্ক্রিনিং (Health Screening) যেমন; ভাইটাল সাইন, শরীরের উচ্চতা ও ওজন প্রভৃতি পরিমাপ করা ও তত্ত্বাবধায়কের নিকট রিপোর্ট করা। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী দল বা হেল্‌থ কেয়ার টিমের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রোগীর ভর্তি ও ছাড়পত্র পূরণ, রোগী স্থানান্তর ও একটি নিরাপদ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতকরণে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশয়ানের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। হোম বেস্‌ড কেয়ারের ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করতে হয় বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। যেহেতু একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে সাধারণত একজন রোগীর সাথে অনেকখানি সময় ব্যয় করতে হয়, তাই রোগীর কোনো বিশেষ পরিবর্তন, অসুবিধা বা অন্যান্য বিষয় প্রথম নজরে আসতে পারে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানেরই। যেমন, রোগীর ঘুমের সমস্যা, ক্ষুদামন্দা হওয়া কিংবা পরের দিনের বিশেষ কোনো কাজ যেমন, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, কিংবা রোগ নির্নয়ের স্যাম্পল বা নমুনা দেওয়ার জন্য প্যাথলজিতে যাওয়া প্রভৃতি। উক্ত কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করার মাধ্যমে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান একজন রোগীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ প্রকাশ পায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হলো, যদিও কাজের ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে এতে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে।

২.১২ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কার্যপরিধি

সেবাগ্রহীতার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান অনেক বিস্তৃত কাজ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে রোগীর বসবাসের পরিবেশের পরিষ্কার পরচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, চিকিৎসা সেবায় সহায়তা করা, দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহায়তা করা, রোগীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা ও ডাক্তারকে জানানো এবং সার্বক্ষণিক সাহচার্য প্রদান করা প্রভৃতি।

- রোগীর কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা; রোগীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা, গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ পরিমাপ করা; সঠিকভাবে রোগীর রেকর্ড বজায় রাখা; চিকিৎসা পরিচালনার সাথে জড়িত স্বাস্থ্যসেবা দলকে সহায়তা প্রদান করা; রোগ নির্নয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের নমুনা সংগ্রহ করা। যেমন: ইউরিন বা প্রশ্রাব, স্টুল বা পায়খানা, স্পুটাম বা থুথু প্রভৃতি।
- প্রাথমিক নার্সিং কর্মকান্ড সম্পাদন করা। যেমন: ওষুধ খাওয়ানো, রক্তের শর্করা পরিমাপ করা, ইনসুলিন প্রদান করা; রোগীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন নিবন্ধিত নার্স বা চিকিৎসককে রিপোর্ট করা; মানসিক সহায়তা প্রদান এবং রোগীদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য গ্রহণ, সাজসজ্জা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সহায়তা করা; রোগীর স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত দলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখা।
- প্রয়োজনীয় যত্নের বিষয়ে রোগী ও তার স্বজনদেরকে তথ্য প্রদান করা।

শারীরিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে সেবা প্রদানের এই কাজগুলো একটু ভিন্নতরও হতে পারে। যেমন:

- একেবারে শয্যাশায়ী রোগীর ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টা পর পর তার অবস্থার পরিবর্তন বা পজিশনিং করানো।
- বিছানা থেকে হইলচেয়ার কিংবা হইলচেয়ার থেকে বিছানায় রোগী স্থানান্তর করা।
- প্রশ্রাব-পায়খানা (টয়লেটিং) ও গোসলে সহায়তা করা। ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্টের নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীর শারীরিক নড়া-চড়া/ব্যায়াম নিশ্চিত করা।
- রোগীকে সাহচর্য দেয়া এবং তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা।

এ সমস্ত কাজ সাধারণত পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান একটি সুনির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী সম্পাদন করে থাকে যেটিকে বলা হয় 'কেয়ার প্ল্যান' বা যত্নের দৈনিক পরিকল্পনা। কেয়ার সুপারভাইজার বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই মূলত এই কেয়ার প্ল্যান প্রণয়ন করে থাকেন। ওল্ড হোম, হস্পিস কেয়ার বা হোম কেয়ার সেটিংস; যেখানেই কাজ করুক না কেন, যত্নের দৈনিক এই পরিকল্পনা প্রায় একই রকম। নিম্নে বৃদ্ধাশ্রম বা ওল্ড হোমের জন্য প্রণীত একটি কেয়ার প্ল্যান প্রদান করা হলো যেখান থেকে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান তার নিয়মমাফিক কাজের তালিকা সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করবে।

২.১৩ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কার্যপরিধির বাইরের কার্যাবলি

কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে অনেক কিছুই শেখার ও করার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু, কোনো কিছু জানলেই তা প্রয়োগ করতে হবে এমনটি নয়। আগে দেখতে হবে উপরে উল্লেখিত কার্যতালিকার মধ্যে অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ন্যস্ত কাজের মধ্যে এটি পড়ে কিনা। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো কেয়ারগিভারের কাজ নয় কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে করে ফেলি, কিংবা করলে রোগীর কোনো ক্ষতি হবেনা বা জবাবদিহিতা করতে হবেনা। নিচে এরকম কিছু কাজের উদাহরণ দেওয়া হলো:

- রোগ নির্নয় করা। এটি কেয়ারগিভারের কোনো অবস্থাতেই করতে যাওয়া ঠিক নয়। এই কাজটি একজন ডাক্তারের। নিজের মত করে, কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে রোগী বা কাউকে কোনো প্রকার ওষধ গ্রহণের উপদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করা যাবে না।

- একজন কেয়ারগিভার হয়তো রোগীর হেল্‌থ স্ক্রিনিং ও ভাইটাল সাইন্‌স পরিমাপের মাধ্যমে কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজটি করে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সেগুলোকে পর্যালোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো বা কাউকে নির্দেশনা দেওয়া যাবে না। এই কাজগুলো সাধারণত ডাক্তার বা নার্সরা করে থাকেন।
- ইনজেকশন প্রদান করা। মনে রাখতে হবে, একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কেবলমাত্র সেল্‌ফ এডমিনিস্টার্ড ইনজেকশন প্রদান করতে পারে, যেমন ইনসুলিন প্রদান করা। কোনো অবস্থাতেই আইভি বা আইএম ইনজেকশন দেওয়া পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কার্যপরিধির মধ্যে পড়েনা।
- ব্লাড স্যাম্পল কালেকশন, ক্যানুলেশন, ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা, স্যালাইন দেওয়া প্রভৃতি কাজ করা যাবে না। এ কাজগুলো নার্স বা ডাক্তাররা করে থাকেন। তবে, উপযুক্ত পেশাদারীর তত্ত্বাবধানে নির্দেশ মোতাবেক সহযোগীতার কাজটি করা যেতে পারে।
- মেডিকেল ইকুইপমেন্ট রোগীর শরীরে প্রবেশ বা অপসারণ করা: পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান সাধারণত রোগীর শরীরে কোনো প্রকার মেডিকেল ইকুইপমেন্ট প্রবেশ বা অপসারণ করতে পারবেনা। যেমন: ক্যাথেটার করা, ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব পরানো বা খুলে ফেলা। এতে মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে।
- ইনভেসিব প্রসিডিউর: কোনো প্রকারেই ইনভেসিব কোনো প্রসিডিউর সম্পাদন করা যাবে না। যেমন: ক্ষত সেলাই করা, সেলাই কাটা, ফোঁড়া কাটা, ক্যানুলা করা প্রভৃতি।

২.১৪ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের পেশাদারিত্ব

কর্মক্ষেত্রে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান একজন পেশাদার কেয়ারগিভার হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই পেশাগত পরিচয় সাধারণত একটি নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন (সনদ) অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তবে, একজন পেশাজীবি কেয়ারগিভার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে কেবল প্রশিক্ষণ ও সনদই যথেষ্ট নয়। পেশাদারিত্ব বলতে সাধারণত নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সঠিক আচরণের মাধ্যমে নিজের সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে সম্পাদন করাকে বুঝানো হয়। একজন কেয়ারগিভার তার আচার-আচরণ, যোগাযোগের দক্ষতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ইতিবাচক মনোভাব প্রভৃতির মাধ্যমে পেশাদারিত্বের গুণাবলি ফুটিয়ে তুলতে পারেন সহজেই। এক্ষেত্রে নিচের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য:

- **কর্তব্যজ্ঞান ও জবাবদিহিতা:** নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। একজন অসুস্থ রোগী নিয়ে কাজ করতে হলে সামান্য অবহেলার কারণে অনেক সময় অনেক বড় সমস্যা হয়ে যেতে পারে, এমনকি রোগীর জীবনও চলে যেতে পারে। তাই, কেয়ারগিভার হিসেবে প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে কর্তব্যজ্ঞান প্রয়োগ করে সম্পাদন করতে হবে। কাজের প্রতি দায়িত্বশীল থেকে নিজেকে জবাবদিহি রাখতে হবে।
- **সময়নুবর্তিতা ও নিয়মানিবর্তিতা:** উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা কেয়ার সুপারভাইজার কর্তৃক নির্দেশিত কেয়ার প্ল্যান অনুযায়ী সময় ও নিয়ম মাফিক কার্যসম্পাদন করতে হবে। এটি কর্মক্ষেত্রে যেকোনো ব্যক্তির পেশাদারিত্বের একটি বড় পরিচয়।
- **সহানুবর্তিতা এবং সহমর্মিতা:** রোগী ও তার স্বজনদের সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মিতাসম্পন্ন হতে হবে। কোনো প্রকারেই বিরক্তি বা ঠাট্টা-মশকরা বা হাসাহাসি করা যাবে না।
- **সততা ও বিবেকবোধ:** একজন কেয়ারগিভারকে অবশ্যই সৎ ও বিবেকবান হতে হবে। কোনোভাবেই রোগীর বা তার স্বজনের কোনোকিছু অসৎ উপায়ে আত্মসাৎ করা যাবে না। নিজের লাভের জন্য অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।

- **নির্ভরযোগ্যতা:** নির্ভরযোগ্যতা বলতে স্বাস্থ্য সেবা দলের কাছে নিজের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করাকে বুঝায়। সহকর্মীদের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কেয়ারগিভারকে কোনো কাজের নির্দেশনা প্রদান করলে সেটি বিশ্বাসযোগ্য ভাবে কেয়ারগিভার সম্পাদন করতে পারবে।
- **গোপনীয়তা:** রোগীর ও তার পরিবারের চিকিৎসা সম্পর্কিয় তথ্যাবলি গোপন রাখা একটি গুরুদায়িত্ব। কোনোভাবে কোড অব কনডাক্টের বাইরে গিয়ে গোপনীয়তা ভঙ্গ করা যাবে না।
- **নম্রতা-ভদ্রতা ও সাহায্যের মনোভাব:** কেয়ারগিভারকে নম্র-ভদ্র ও আচরণে শালীন হতে হবে। সাহায্য করার মনোভাব থাকতে হবে; কেননা কেয়ারগিভিং কাজটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ধৈর্য্যের সাথে সম্পাদন করতে হয়।
- **যোগাযোগের দক্ষতা:** যোগাযোগের দক্ষতা পেশাদারী আচরণের একটি বড় নিদর্শন। সঠিকভাবে মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগের পাশাপাশি নিরপেক্ষ শ্রবন কৌশলও এর অন্তর্ভুক্ত।
- **অর্পিত দায়িত্বের বাইরের কাজ না করা:** কেয়ারগিভার তার কার্যপরিধির বাইরের কাজ করবেনা, প্রয়োজন হলে উপযুক্ত পেশাজীবীকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে।
- **প্রবলেম সলভিং স্কিল্সঃ** কর্মক্ষেত্রে কেয়ারগিভার নানারকম সমস্যার মুখে পড়তে পারে। যেমন; রোগীর শারীরিক অবস্থা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া, কিংবা হঠাৎ করে কোনো ওষধ বা অন্য কোনো সামগ্রীর স্টক ফুরিয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। এধরনের যেকোনো পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় সমস্যা সমাধানের কার্যকর দক্ষতা একজন কেয়ারগিভারের জন্য অপরিহার্য।

২.১৫ পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের আচরণবিধি বা কোড অব কনডাক্ট

- সেবাগ্রহীতা প্রতিটি ব্যক্তিকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে
- নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য, জ্ঞান ও দক্ষতার সীমানা জানতে হবে
- কেবলমাত্র আইনগতভাবে স্বীকৃত কার্যাবলিই সম্পাদন করতে হবে, এর বাইরে নয়
- কেবলমাত্র সেই কার্যাবলিই সম্পাদন কর যেগুলোতে আপনাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- এমন কোনো কাজ করা যাবে না যেটাতে রোগীর ক্ষতি হতে পারে
- নিজের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোনো ঔষধ গ্রহণ করা যাবে না, কেবলমাত্র চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন বা নির্দেশনা অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণ করতে হবে
- চিকিৎসক ও নার্স কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে
- নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পলিসি ও প্রসিডিউর মেনে চলতে হবে
- অর্পিত প্রতিটি কাজ নিরাপদ, আরামদায়ক ও যত্নের সাথে সম্পাদন করতে হবে
- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী দলের উপর অনুগত থাকার চেষ্টা করতে হবে
- একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আচরণ করতে হবে
- রোগীর তথ্যাবলির ক্ষেত্রে 'প্রাইভেসি ও কনফিডেনশিয়ালিটি' বজায় রাখতে হবে
- পেশেন্টের জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করতে হবে
- নিজের প্রয়োজনের চেয়েও রোগীর স্বার্থকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে
- নিজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে নিজেকেই জবাবদিহি রাখতে হবে।

টেবিল: নমুনা কেয়ার প্ল্যান।

সময়	কাজ
সকাল ৬.৩০-৭ টা	সকালে চা বা অন্যান্য পানীয় প্রদান করবেন।
সকাল ৭-৮টা	নিজে পরিপাটি হয়ে মেম্বারদের সাথে কুশল বিনিময় করা এবং মনোযোগ দিয়ে তাঁর সমস্যা শুনবেন। সমস্যাটি তখনই সমাধানযোগ্য হলে সমাধান করবেন, না হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদান করবেন। মেম্বার ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম থেকে উঠাবেন; দাঁত মাজা, হাত মুখ ধোয়া ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করবেন; ইনসুলিন দেবেন ও ওষুধ খাওয়াবেন (ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী), বিছানা তৈরি করে দেবেন, ঘর পরিষ্কার করবেন।
সকাল ৮- ৯:৩০টা	মেম্বারদের নাস্তা ওষুধ খাওয়াবেন।
সকাল ৯:৩০-১১টা	নার্স এবং ফিজিওথেরাপিস্ট তাদের কাজ করবেন এবং কেয়ারগিভারগণ হোম মেম্বারদের হাল্কা নাস্তা পরিবেশন করবেন।
সকাল ১১-দুপুর ১টা	হোম মেম্বারদের গোসল করাবেন, তাদের কাপড় ধোবেন, ফ্লোর পরিষ্কার করবেন, লন্ড্রি সার্ভিস ও রুম ক্লিনিং নিশ্চিত করবেন, ছাদে কাপড় শুকাতে দেবেন, জানলার গ্লাস ও থাই গ্লাস পরিষ্কার করবেন; টেবিল, চেয়ার, আলমারি, শেল্ফ ইত্যাদি পরিষ্কার করবেন; নিজে গোসল করবেন।
দুপুর ১-২টা	মেম্বারদের লাঞ্চ করাবেন, ওষুধ খাওয়াবেন; ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করবেন।
দুপুর ২-৪টা	মেম্বারদের বিশ্রামের সময় এবং কেয়ারগিভারদের ব্যক্তিগত কাজের সময়। এই সময়টায় প্রয়োজনীয় নিজের কাজকর্ম শেষ করবেন।
বিকেল ৪-০: ৪-৩০টা	মেম্বারদের বিকেলের নাস্তা পরিবেশন করবেন।
বিকেল ৪-৫:৩০টা	মেম্বারদের ছাদে পরিভ্রমণ করাবেন, কেউ লাইব্রেরি বা ইনডোরে আগ্রহি হলে তাকে সাহায্য করবেন, শুকাতে দেওয়া কাপড় আনবেন ও মেম্বারকে বুঝিয়ে দেবেন।
বিকেল ৫:৩০-রাত ৮টা	মেম্বারদের সাথে থাকবেন, গল্প করবেন, টিভি দেখবেন। এ সময় মেম্বারদের কোনো কাজ থাকলে সহযোগিতা করবেন।
রাত ৮টা- ৯টা	হোম মেম্বারদের রাতের খাবার খাওয়াবেন, ওষুধ খাওয়াবেন এবং ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করবেন।
রাত ৯- ১০টা	মেম্বারদের সাথে থাকবেন, গল্প করবেন, টিভি দেখবেন, মেম্বারদের বিছানা তৈরি করে দেবেন, জানালা বন্ধ করবেন, দরজা বন্ধ করবেন।
রাত ৯.৩০-১০টা	রাতের প্রয়োজনীয় পথ্য, পানীয় পরিবেশন করবেন।

২.১৬ রোগীর ও নিজের অধিকার

ক্লায়েন্ট বা ব্যক্তি যিনি স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে থাকেন, তার আছে কিছু মৌলিক অধিকার। যেমন:

- সম্মানজনক উপায়ে উপযুক্ত সেবা-যত্ন বা পরিচর্যা পাবার অধিকার
- সেবার ধরন ও তার মূল্য জানার অধিকার; সেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়ার অধিকার এবং সেবাপ্রদানকারী সম্পর্কে জানার অধিকার
- নিজের শারীরিক-মানসিক সমস্যা ও গৃহীত সেবা সংক্রান্ত সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
- সীমাবদ্ধতা এবং অপব্যবহার থেকে মুক্ত থাকার অধিকার
- স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার; অভিযোগ প্রদান ও নিষ্পত্তি পাবার অধিকার
- সেবা কেন্দ্রে ভর্তি, স্থানান্তর ও ছুটির সময়কালীন অধিকার
- ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার অধিকার; মর্যাদা, সম্মান এবং স্বাধীনতার অধিকার

এই মৌলিক অধিকারগুলো স্বাস্থ্যসেবার যেকোনো সেটিংসেই মোটামুটি একই রকম। ওল্ড হোমে এগুলোকে বলা হয় রেসিডেন্ট্স রাইট্স বা প্রবীন নিবাসীর অধিকার। সেবাগ্রহীতা রোগী হলে এগুলোকে বলা যায় পেশেন্ট্স রাইট্স বা রোগীর অধিকার; তেমনি হোম কেয়ারের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ক্লায়েন্ট্স রাইট্স। নিজের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে একজন ক্লায়েন্ট, রোগী বা প্রবীন ও তার পরিবার তাদের চাওয়া-পাওয়া মেটাতে সচেষ্ট থাকতে পারেন। ক্লায়েন্ট ও তার স্বজনদেরকে এসকল অধিকার সম্পর্কে অবহিত এবং রক্ষা করা একজন কেয়ারগিভারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

বৃদ্ধাশ্রমে নিবাসীর অধিকার সংরক্ষণে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের করণীয়

- কোনো অবস্থাতেই একজন বাসিন্দাকে শারীরিক, মানসিক বা মৌখিক নির্যাতন ও যৌন হয়রানী করা যাবে না। এধরনের নির্যাতন, অপব্যবহার বা অবহেলার (abuse) ঘটনা নজরে আসলে তাৎক্ষণিকভাবে তা রেকর্ড ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করতে হবে।
- বাসিন্দাকে সে নামে ডাকুন যেটি তিনি পছন্দ করেন
- সেবা পরিকল্পনায় ক্লায়েন্ট অন্তর্ভুক্ত করা। কখন, কোথায়, কার মাধ্যমে কোনো সেবাটি ঠিক কিভাবে প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে যথাসম্ভব অবহিত করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে; যেকোনো সেবা প্রদানের পূর্বেই ক্লায়েন্টকে সেবা পদ্ধতি, এর সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে সর্বদা ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে
- অপ্রয়োজনীয় কোনো পদ্ধতি রোগীর শরীরে সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকতে হবে; ক্লায়েন্ট কোনো সেবা গ্রহণ করতে সম্মত না হলে তার পছন্দকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। চিকিৎসা বা সেবা প্রত্যাখ্যান করার আইনগত অধিকার ক্লায়েন্টের আছে এবং এধরনের ক্ষেত্রে কেয়ারগিভারের উচিত হবে সম্মান জানানো এবং উর্ধ্বতনকে অবহিত করা।
- একজন বাসিন্দার প্রশ্ন থাকলে নার্সকে বলুন, উদ্বেগ বা চিকিৎসা সম্পর্কে অভিযোগ বা যত্নের লক্ষ্য।
- কোনো কিছু রেকর্ড ও রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে কেয়ারগিভারকে অবশ্যই যত্নশীল ও সত্যবাদি হতে হবে।
- ক্লায়েন্টের কোনো বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা করা যাবে না এবং গোপনীয়তা ভঙ্গ করা যাবে না।
- ক্লায়েন্টের কক্ষে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং প্রস্থানের সময় অবহিত করতে হবে; ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কোনো উপহার বা টাকা গ্রহণ করা যাবে না; কোনো ক্লায়েন্টের গোপন কোনো তথ্য অনুমতি ব্যতিত দেখা ও বিতরণ করা যাবে না।

২.১৭ কেয়ারগিভারের অধিকার

একজন পেশাজীবী হিসেবে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানেরও আছে কিছু মৌলিক অধিকার। যেমন:

- নিজের যত্ন নেয়ার অধিকার; সঠিক খাবার, শারীরিক ব্যায়াম ও যথেষ্ঠ পরিমাণ বিশ্রাম নেয়ার।
- আন্তর্জাতিক শ্রম আইনানুযায়ী কর্মঘণ্টা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার এবং এর বাইরের কোনো অতিরিক্ত সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার।
- কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পাবার অধিকার; যেকোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হওয়ার কিংবা মুক্তি পাওয়ার অধিকার।
- কেয়ার এজেন্সি, কো-ওয়ার্কার, পেশেন্ট পার্টি বা রোগীর স্বজন কর্তৃক অন্যায়ভাবে কোনো নির্যাতনের শিকার হলে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার।
- নিজের পছন্দমত জীবনের সেই দিকগুলো পরিচালনা করার অধিকার যেগুলোর সাথে রোগীর সেবা বা কেয়ারগিভিং কার্যক্রমের কোনো সাংঘর্ষিক সম্পর্ক নেই।

- নিজের অনুভূতির যথাযথ বহিঃপ্রকাশের অধিকার।
- ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখার অধিকার।
- পেশাজীবি সংঘটন করা বা সংঘটনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবার অধিকার।
- ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নতি সাধনের সুযোগ পাবার অধিকার।

২.১৮ দেশ ও বহির্বিশ্বে কেয়ার গিভিং এর সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে কেয়ারগিভারের চাহিদা ব্যাপকহারে বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে করোনা মহামারিতেও এটার গুরুত্ব ব্যাপক হারে উপলব্ধি করা গেছে। উন্নত প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবার ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এটি ৭২.৮ বছর। এর মধ্যে পুরুষের গড় আয়ু ৭১.২ বছর আর নারীর গড় আয়ু ৭৪.৫ বছর (তথ্যসূত্রঃ বিবিএস ২০২০)। উন্নত বিশ্বে গড় আয়ু আরো বেশি। লক্ষণীয় যে, যে দেশের অর্থনীতি যত বেশি উন্নত সে দেশের গড় আয়ু সাধারণত তত বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অতি সম্প্রতি স্বল্প উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। যার ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি গতিশিল হচ্ছে। এর সাথে বেড়ে যাচ্ছে মানুষের গড় আয়ু। এ অবস্থায় বাংলাদেশেও বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধাশ্রম ও হোম কেয়ারের চাহিদা। পাশাপাশি হাসপাতালে দীর্ঘমেয়াদী সেবা লাভ করছে এমন রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই বর্ধিত চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারের বিকল্প নেই। এর সাথে ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বাইরেও কেয়ারগিভার হিসেবে কাজ করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে জাপান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এই চাহিদার শীর্ষে।

দেশ	গড় আয়ু (বছর)
জাপান	৮৩.৭
নরওয়ে	৮২.৪
আয়ারল্যান্ড	৮২.৩
সুইজারল্যান্ড	৮৩.৮
জার্মানি	৮১.৩
অস্ট্রেলিয়া	৮৩.৪
হল্যান্ড	৮২.৩

চিত্র: কয়েকটি দেশের নারী ও পুরুষের গড় আয়ু

নিম্নে কেয়ারগিভারের কিছু সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হলো:

- দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত চাহিদা সম্পন্ন একটি পেশা এটি।
- ভালো বেতন, সম্মানজনক পেশা হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে কেয়ারগিভিং একটি সম্ভাবনাময় খাত।
- হোম কেয়ারের পাশাপাশি বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডাক্তারের চ্যাম্বার, বৃদ্ধাশ্রম, ডে কেয়ার সেন্টার, নার্সিং হোম, প্যারালাইসিস সেন্টার সমূহে চাকরির সুযোগ।
- কেয়ার গিভার প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ আছে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝায়?
২. প্রফিক্স, রুট ও সাফিক্স কি? উদাহরণ সহ লিখ।
৩. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কয়েকটি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।
৪. গৃহে রোগীর পরিচর্যা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ১০ টি সরঞ্জামের নাম উল্লেখ কর।
৫. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৬. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের কার্যপরিধি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৭. কেয়ারপ্ল্যান বলতে কি বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্বাস্থ্যের কয়টি দিক রয়েছে? কি কি? সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
২. হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের নাম ও প্রদায়িত সেবাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৩. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের ৬ টি আচরণবিধি উল্লেখ কর।

রচনামুলক প্রশ্ন

১. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের পেশাদারিত্বের মূলনীতিগুলো কী কী? সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
২. স্বাস্থ্য সেবাখাতে নিজের ও রোগীর অধিকার বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ লিখ।
৩. বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

বেসিক হিউমান বায়োলোজি ও এর ব্যবহার

Basic Human Biology

সেবাদানের জন্য মানব শরীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। দেহের গঠন, কার্যপ্রণালী, গুরুত্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অঙ্গসমূহের জ্ঞান, সেবা গ্রহণকারীর চাহিদা অনুযায়ী কাজের পরিধি ও পরিকল্পণা করার পূর্ব শর্ত। এ অধ্যায়ে আমরা মানব শরীরের গঠন, অঙ্গ পরিচিতি, তন্ত্রের কাজ ও গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জীববিজ্ঞানের শাখাসমূহ উল্লেখ করতে পারবো।
- জীববিজ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবো।
- দেহতত্ত্বে ব্যবহৃত শব্দগুলো বলতে পারবো।
- জীবকোষের গঠন ও কাজের সচিত্র বর্ণনা করতে পারবো।
- বিভিন্ন প্রকার প্রাণী টিস্যুর নাম, গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবো।
- মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অস্থিসমূহ চিহ্নিত করতে পারবো।
- মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ পেশীসমূহ চিহ্নিত করতে পারবো।
- হৃৎপিন্ডের গঠন ও রক্তসংবহন বর্ণনা করতে পারবো।
- মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবো।

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা মানবকোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু সনাক্ত করতে পারবো। জবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৩.১ জীববিজ্ঞান

বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রকৃতিকে যে মূল দুই ধারায় বিশ্লেষণ করা হয় তা হল, জীব ও জড় পদার্থ। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের সার্বিক বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে জীববিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞানের এই প্রাচীনতম শাখায় উদ্ভিদ এবং প্রাণী, এদের গঠন, কার্যকারিতা, কার্যকৌশল পদ্ধতি বা জৈবনিক ক্রিয়া, পুষ্টি ও প্রজনন সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। ইংরেজিতে জীববিজ্ঞানকে Biology বলা হয়, যা ল্যাটিন শব্দ Bios অর্থাৎ জীবন; Logos অর্থাৎ জ্ঞান এর সমন্বয়ে তৈরি।

৩.১ জীববিজ্ঞানের শাখাসমুহ

জীবের ধরনভেদে প্রধান দুই শাখায় বিভক্ত; উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান। এছাড়াও এমন অনেক জীব আছে যা উদ্ভিদ বা প্রাণী কোনোটাই না। যেমন: ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি। তাই বৈশিষ্টের ভিত্তিতে আবার ভৌত জীববিজ্ঞান ও ফলিত জীববিজ্ঞান এই দুই ভাগে বিভক্ত।

৩.১.১ ভৌত জীববিজ্ঞান: জীববিজ্ঞানের তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

১. অঙ্গসংস্থান (Morphology) সার্বিক দৈহিক বর্ণনা, ২. শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যা (Taxonomy) শ্রেণিবিন্যাসের নিয়মনীতি ৩. শরীরবিদ্যা (Physiology) শরীরবৃত্তীয় কাজের বিবরণ ৪. হিস্টোলজি (Histology) আনুবিক্ষণিক গঠন, বিন্যাস, কার্য	৫. ভ্রূণবিদ্যা (Embryology): ভ্রূনের পরিস্ফুরন, ৬. কোষবিদ্যা (Cytology): কোষের যাবতীয় বিষয়, ৭. বংশগতিবিদ্যা (Genetics): জিন ও বংশগতিধারা, ৮। বাস্তুবিদ্যা (Ecology): পরিবেশ ও জীবের আন্তঃসম্পর্ক

৩.১.২ ফলিত জীববিজ্ঞান: প্রায়োগিক বিষয়সমূহ-

১. জীবপ্রত্নতত্ত্ব (Paleontology)
২. জীব পরিসংখ্যান বিদ্যা (Biostatistics)
৩. পরজীবীবিদ্যা (Parasitology)
৪. কীটতত্ত্ব (Entomology)
৫. অণুজীববিদ্যা (Microbiology)
৬. প্রাণরসায়ন (Biochemistry)
৭. চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical science)
৮. জীব প্রযুক্তি (Biotechnology)
৯. ফার্মেসি (Pharmacy)
১০. বন বিজ্ঞান (Forestry)

৩.২ দেহতত্ত্ব (Anatomy) ও শরীরতত্ত্ব (Physiology) সংক্রান্ত পরিভাষা

৩.২.১ দেহতত্ত্ব বা (Anatomy) ব্যবহৃত শব্দাবলি

- **দেহতত্ত্ব বা (Anatomy)**- মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান।
- **সামগ্রিক দেহতত্ত্ব (Gross Anatomy)**- মানবদেহের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান যা খালি চোখে দেখা যায়।
- **স্থানিক দেহতত্ত্ব (Regional Anatomy)**- মানবদেহের এক একটি অংশ বা স্থানের বিভিন্ন ভাগের বর্ণনা। যেমন- মাথা ও গলা (Head-Neck), উর্ধাঙ্গ (Upper Limb), নিম্নাঙ্গ (Lower Limb) ইত্যাদি।
- **তন্ত্রীয় দেহতত্ত্ব (Systemic Anatomy)**- মানবদেহের এক একটি তন্ত্রের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- শাসনতন্ত্র (Respiratory System), পরিপাকতন্ত্র (Digestive System) ইত্যাদি।
- **আণুবীক্ষণিক দেহতত্ত্ব (Histology)**- মানবদেহের ক্ষুদ্র অঙ্গসমূহের গঠন যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscopic) এর সাহায্যে দেখা যায়। যেমন- কোষের গঠন, কলার গঠন প্রভৃতি।
- **সাধারণ শরীরতত্ত্ব (General Physiology)**- মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও জীব কোষের মৌলিক গঠন, উৎপত্তি, বৃদ্ধি সংক্রান্ত ভৌতিক ও রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান।

- **অস্থি বিদ্যা (Osteology)**- হাড় (Bone) সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- হিউমেরাস, ফিমার, রেডিয়াস ও আলনা, টিবিয়া, ফিবুলা, কশেরুকা ইত্যাদি।
- **সন্ধি বিদ্যা (Arthrology)**- মানবদেহের বিভিন্ন সন্ধি (Joint) সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- স্কন্ধ সন্ধি (Shoulder Joint), জঙ্ঘা সন্ধি (Hip Joint), কনুই সন্ধি (Elbow Joint) ইত্যাদি।
- **পেশি বিদ্যা (Myology)**- পেশি সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- বাহুর পেশি (Biceps), হৃদপেশি (Cardiac Muscle)।
- **রক্তরোগ বিদ্যা (Haematology)**- রক্তরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **যকৃতরোগ বিদ্যা (Hepatology)**- যকৃত রোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **চর্মরোগ বিদ্যা (Dermatology)**- চর্মরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **স্নায়ুরোগ বিদ্যা (Neurology)**- স্নায়ুরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **হৃদরোগ বিদ্যা (Cardiology)**- হৃদরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **স্ত্রীরোগ বিদ্যা (Gynaecology)**- স্ত্রীরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।
- **মূত্ররোগ বিদ্যা (Urology)**- মূত্র ও মূত্ররোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

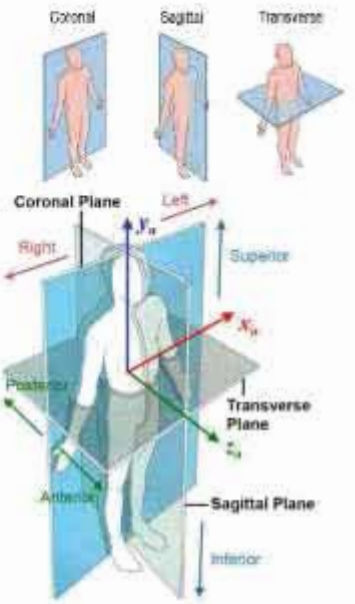

চিত্র ৩.১: দৈহিক অবস্থান, দৈহিক তল

- **দৈহিক অবস্থান (Anatomical Position)**- একজন মানুষ হাত, পা, সোজা করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে তার যে ভঙ্গিমা হয় তাকে দৈহিক অবস্থান (Anatomical Position)। দেহতত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য কতকগুলো কাল্পনিক রেখা দ্বারা দেহকে ভাগ করা হয়ে থাকে।
- **মধ্যমা তল (Median Plane)**- একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে ডান ও বাম সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে।
- **সীর্ষক তল (Sagittal Plane)**- একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা দেহের মধ্যমা তলের সমান্তরালভাবে অতিক্রম করেছে।
- **কিরীট তল (Coronal Plane)**- একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা দেহের মধ্যমা তলের সমকোণে অতিক্রম করে দেহকে সামনে এবং পিছনে দুইটি অংশে বিভক্ত করেছে।
- **অনুভূমিক তল (Transverse Plane)**- একটি কাল্পনিক তল যা দেহের মধ্যমা ও কিরীট তলকে সমকোণে অতিক্রম করে দেহকে উপর এবং নিচ দুইটি অংশে বিভক্ত করেছে।
- **মধ্যমাবর্তী (Medial)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা মধ্যমাবর্তী তলের নিকটবর্তী অঙ্গকে মধ্যমাবর্তী অঙ্গ বলে। যেমন- আলনা (Ulna) হাড়টি রেডিয়াস (Radius) হাড় থেকে মধ্যমাবর্তে (Medially) অবস্থিত।
- **পার্শ্ববর্তী (Lateral)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা মধ্যমা তলের দূরের অঙ্গকে বলা হয় পার্শ্ববর্তী (Lateral)। যেমন- হাতের রেডিয়াস (Radius) হাড়টি আলা (Ulna) থেকে পার্শ্ববর্তী (Laterally) অবস্থানে রয়েছে।
- **অভ্যন্তরীণ (Internal)**-দেহের কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত যে কোনো অঙ্গ আভ্যন্তরীণ অঙ্গ (Internal Organ) যেমন- পিত্ত থলি (Gallbladder)।

- **বাহ্যিক (External)**- দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত অঙ্গসমূহকে বাহ্যিক অঙ্গ (External Organ) বলে। যেমন- ত্বক (Skin)।
- **ঊর্ধ্ববর্তী (Superficial)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা দেহের উপরিভাগ থেকে কল্পনা করলে যেটা উপরিভাগের কাছে অবস্থিত তাকে ঊর্ধ্ববর্তী অঙ্গ (Superficial Organ) বলা হয়। যেমন- বাহর মাংশ পেশি হাড়ের ঊর্ধ্ববর্তে অবস্থিত।
- **গভীর (Deep)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা দেহের গভীরে বা ভেতরে অবস্থিত অঙ্গসমূহকে গভীরের অঙ্গ (Deep Organ) বলা হয়। যেমন- বাহর হাড় মাংশ পেশির গভীরে অবস্থিত।
- **সম্মুখবর্তী (Anterior)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা সামনের দিকের অবস্থান প্রকাশ করে। যেমন- নাক কানের থেকে সম্মুখবর্তী (Anterior)।
- **পশ্চাৎবর্তী (Posterior)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান যা দেহের পিছনের দিকের অবস্থান প্রকাশ করে। যেমন- কান নাকের থেকে পশ্চাৎবর্তী (Posterior)।
- **উপরে (Superior)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান দেহের মাথার নিকটবর্তী অঙ্গের অবস্থান প্রকাশ। যেমন- হৃদপিন্ড ব্যবচ্ছেদ পেশির (Diaphragm) উপরে অবস্থিত।
- **নিচে (Inferior)**- দেহের কোনো অংশের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক অবস্থান দেহের পায়ের নিকটবর্তী অঙ্গের অবস্থান প্রকাশ করে। যেমন- ব্যবচ্ছেদ পেশি (Diaphragm) হৃদপিন্ডের নিচে অবস্থিত।
- **এক দিকে (Ipsilateral)**-দেহের একই পার্শে অবস্থিত অঙ্গ। যেমন- ডান হাত এবং ডান পা দেহের একই দিকে অবস্থিত।
- **বিপরীত দিকে (Contralateral)**-দেহের বিপরীত পাশে অবস্থিত অঙ্গ। যেমন- ডান হাত এবং বাম হাত দেহের বিপরীত দিকে অবস্থিত।

৩.২.২ এনাটমির বর্ণনার জন্য পেটকে চারটি কাল্পনিক লাইন দিয়ে মোট নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়-

১) ডান উল্লম্ব তল (Right Vertical Plane)- এই তলটি ডান স্তনবৃন্তের সোজাসুজি নিচে নেমে আসে।
২) বাম উল্লম্ব তল (Left Vertical Plane)- এই তলটি বাম স্তনবৃন্তের সোজাসুজি নিচে নেমে আসে।
৩) পাইলোরাসের মধ্যতল (Transpyloric Plane)- এটি সামনের পাজড়ার বরাবর আড়াআড়ি তল।
৪) টিউবারকুলের অন্তর্বর্তী তল (Inter Tubercular Plane)- বস্তির দুইটি প্রধান হাড় (Pelvic Bone) এর সামনের পয়েন্ট বা Anterior Superior Iliac Spine- এর সংযোগ লাইন।

এর ফলে পেট যে নয়টি ভাগে বিভক্ত হয়-

ক) উপরের তিনটি ভাগ
১) ডান হাইপোকোনোড্রিয়াক (Right Hypochondriac),
২) ইপিগ্যাসট্রিক (Epigastric) ও
৩) বাম হাইপোকোনোড্রিয়াক (Left Hypochondriac)।

খ) মাঝের তিনটি ভাগ:
৪) ডান লাম্বার (Right Lumber),
৫) আম্বিলিক্যাল (Umbilical) ও
৬) বাম লাম্বার (Left Lumber)।

গ) নিচের তিনটি ভাগ

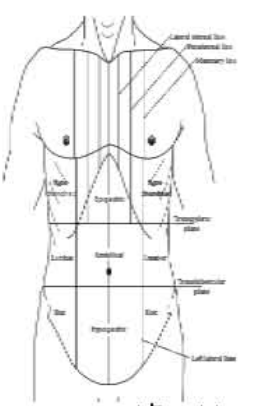

চিত্র ৩.২: বুক ও পেটের ভাগ সমূহ

৭) ডান ইলিয়াক (Right Iliac),
৮) হাইপোগ্যাস্ট্রিক (Hypogastric) ও
৯) বাম ইলিয়াক (Left Iliac)। এই ভাগ অনুযায়ী পেটের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের অবস্থান ও রোগের লক্ষণ বুঝতে সুবিধা। হয়।

৩.৩ দেহের মৌলিক গঠন

কোষ (Cell) মানব দেহের গঠনের ও কাজের একক (Unit)! একই উৎস থেকে উদ্ভূত, একই আকৃতির বা ভিন্ন আকৃতির কোষগুলো (cells) যখন মিলিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে তখন সমষ্টিগত কোষকে একত্রে কলা (Tissue) বলা হয়। দুই বা ততধিক ধরনের কলা একত্রিত হয়ে তৈরি হয় এক একটি অঙ্গ (Organ); যেমন হৃৎপিন্ড (Heart), ফুসফুস (Lung), বৃক্ক (Kidney) ইত্যাদি।
এছাড়াও মানবদেহকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় ৫টি এলাকায় (Region) ভাগ করা হয়

১) মাথা এবং গলা বা (Head & Neck),
২) বুক বা (Chest or Thorax),
৩) পেট বা (Abdomen),
৪) হাত বা (Superior Extremity) এবং
৫) পা বা (Inferior Extremity)

১) **মাথার** ভাগ- ক) মস্তিষ্ক বা (Cranium) এবং খ) মুখ বা (Face)।
২) **বুক** বা Thorax এ প্রধান অঙ্গসমূহ - ক) হৃদপিন্ড বা (Heart), খ) দুইটি ফুসফুস বা (Lungs), গ) শ্বাসনালী বা (Trachea) ও বায়ুনালী বা (Bronchi), ঘ) অন্ননালী বা (Oesophagus)। হৃদপিন্ড বা Heart থাকার কারণে ফুসফুস দুইটি বা Lungs এর মাঝে যে গর্ত হয় তার নাম বক্ষ গহবর বা Mediastinum। এ ছাড়া সব শিরা ও ধমনীর উৎস মুখে এই বক্ষ গহ্বরে অবস্থিত। ব্যবচ্ছেদ পেশি বা Diaphragm উপরের দিকে বেঁকে থাকে এবং বুক ও পেটকে ভাগ করে।
৩) **পেট** বা Abdomen এর অবস্থান ব্যবচ্ছেদ পেশি বা Diaphragm এর নিচে। এর প্রধান দুইটি অংশ- i) উপরের পেট ও ii) তলপেট।

পেটের উপরের অংশে আছে:

ক) পাকস্থলী বা Stomach,
খ), ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র বা Intestines,
গ) যকৃৎ বা Liver,
ঘ) প্লীহা বা Spleen,
ঙ) পিত্তকোষ বা Gall Bladder,
চ) অগ্নাশয় বা Pancreas,
ছ) বৃক্ক বা Kidney এবং
জ) মহাধমনী (Aorta) ও নিম্ন মহাশিরা (Inferior Vena Cava

পেটের নিচের অংশ বা বস্তিকোটরের (Pelvic Cavity) অঙ্গসমূহ-

ক) মুত্রথলি বা Urinary Bladder,
খ) জনন অঙ্গসমূহ বা Reproductive Organs এবং
গ) বৃহদন্ত্রের অংশ বা Colon & Rectum

৪) **হাতের** ভাগ- ক) উর্ধ বাহু বা (Arm), খ) সম্মুখ বাহু বা (Forearm), গ) কব্জি বা (Wrist), ঘ) করতল বা (Palm) এবং ঙ) হাতের আঙ্গুল বা (Finger) ৫) **পায়ের** ভাগ- ক) উরু বা (Thigh), খ) নিম্ন পা বা (Leg), গ) চরণ বা (Foot) এবং ঘ) পায়ের আঙ্গুল বা (Toe)।

৩.৩.১ জীবকোষ (Cell):

কোষ একটি জীবদেহের গঠন ও কার্যপ্রণালির একক, যা বৈষম্য ভেদ্য (selectively permeable) পর্দা দ্বারা আবৃত এবং যা অন্য সজীব মাধ্যম ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। মানবদেহ প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ থাকে। এই কোষের আকার সাধারণত ৫ - ৫০ মাইক্রোমিটার (m) পর্যন্ত হয়। নিউক্লিয়াসের ভিত্তিতে

কোষ দুই ধরনের। কাজের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের হয়

১) **দেহ কোষ (Somatic cell)** মাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। উদাহরণ-যকৃৎ কোষ (Hepatocyte), ত্বকের কোষ (Epithelial cell)। এদের মধ্যে কিছু কোষ প্রাথমিক পরিপক্কতা লাভের পর আর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না। উদাহরণ- স্নায়ু কোষ (Nerve cell বা Neuron), হৃৎপেশি কোষ (Cardiac myocyte)

২) **জনন কোষ (Gametic cell)** মিয়োসিস পদ্ধতিতে পুং ও স্ত্রী জনন কোষে বিভক্ত হয়। এদের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা, দেহ কোষের অর্ধেক হয়। পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট কোষকে জাইগোট (Zygote) বলে।

ক) আদি বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ (Prokaryotic cell):

- সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না
- নিউক্লিয়াস পর্দা বেস্টিত থাকে না
- নিউক্লিয়বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে
- মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে না
- রাইবজোম থাকে
- ক্রোমোজমে কেবল DNA অথবা RNA থাকে।

উদাহরণঃ নীলাভ শৈবাল, ব্যাক্টেরিয়া

খ) প্রকৃত বা সুকেন্দ্রিক কোষ (Eukaryotic cell)

- সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে
- নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়বস্তু পর্দা বেস্টিত থাকে
- ক্রোমোজমে DNA, হিস্টোন অথবা অন্যান্য উপাদান থাকে।
- রাইবজোম থাকে না; উদাহরণ: রক্তনালির অন্তঃস্তরের কোষ (Endothelium)

৩.৩.২ কোষের অঙ্গাণু

ইলেকট্রন অনুবিক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যত প্রানী কোষের অঙ্গাণু সমূহ হল-

প্রোটোপ্লাজম: কোষের ভিতর অবস্থিত অর্ধস্বচ্ছ, জেলির মত বস্তু হল প্রোটোপ্লাজম। কোষ আবরণী, সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস নিয়ে প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয়।

কোষ আবরণী (Cell Membrane): প্রোটোপ্লাজম যে ত্রিস্তর বিশিষ্ট স্থিতিস্থাপক পর্দা দ্বারা বেষ্টিত তাকে কোষ আবরণী (Cell Membrane) বলে। এটি মূলত লিপিড ও প্রটিন দিয়ে তৈরি। কোষঝিল্লির ভাঁজকে মিক্রোভিলাই বলে। এই পর্দা বৈষম্যভেদ্য হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি, লবন, পরিপোষক পদার্থ ও বর্জ্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাশাপাশি কোশগুলো থেকে পৃথক রাখা। এই আবরণের পুরুত্ব ৭.৫ থেকে ১০ ন্যানোমিটার (৭.৫ থেকে ১০ nm)।

কোষ আবরণীর কাজ

- কোষ অভ্যন্তরের বস্তুসমূহকে রক্ষা করা ও আবৃত রাখা এর প্রধান কাজ।
- বিভিন্ন কোষাঙ্গাণু তৈরিতে সহায়তা করা, যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, নিউক্লিয়ার পর্দা প্রভৃতি
- কোষের সঠিক আকৃতি প্রদান করা।
- অভিস্রবণ বা ব্যাপনের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তুকে কোষের অভ্যন্তরে নেয়া ও কোষ থেকে বের করা।
- ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) ও পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis) পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত বড় বস্তুকে কোষের ভিতরে নেয়া।

সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)**:** কোষের প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস সরিয়ে নিলে যে জেলির মত বস্তু রয়ে যায় তা সাইটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াসের বাইরে কোষের সকল অঙ্গাণু সাইটোপ্লাজমে থাকে। এই অঙ্গাণুগুলোর

আবরণী বেষ্টিত হওয়া বা না হওয়ার উপর ভিত্তি করে এদের আবরণীযুক্ত এবং আবরণীবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুতে ভাগ করা হয়।

চিত্র ৩.৩: প্রাণী কোষ ও এর অঙ্গাণু

৩.৩.৩ আবরণীযুক্ত সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

১. **মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)** এটি শ্বসনে অংশগ্রহণকারী, দ্বিস্তরের আবরণী বিশিষ্ট একটি অঙ্গাণু। এর ভিতরের স্তরটি আঙ্গুলের মত ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে, যাকে ক্রিস্টি (Cristae) বলে। ক্রিস্টির গায়ে বৃন্তযুক্ত গোলাকার বস্তু অবস্থিত, এদের অক্সিজোম (Oxisomes) বলে। অক্সিজোমে উৎসেচক বা (Enzymes) সাজানো থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতর ম্যাট্রিক্স (Matrix) থাকে। শ্বসনের যে মূল চারটি (ক্রমানুসারে গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি, ক্রেব্‌স চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্র) ধাপ রয়েছে। যদিও প্রথম ধাপ, গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ায় না ঘটলেও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব কোষেই মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। যেমন Trichosangs, Morocercouomoides ইত্যাদি প্রোটোজোয়াতে এবং মানবদেহের পরিণত রক্ত কনিকাতে মিটকন্ড্রিয়া থাকে না।

২. **গলজি বস্তু (Golgi body):** গলজি বস্তু (কিংবা গলগি বস্তু) প্রধানত প্রাণিকোষে পাওয়া যায়, ও কিছু ক্ষেত্রে উদ্ভিদকোষেও দেখা যায়। এটি সিস্টার্নি ও কয়েক ধরনের ভেসিকল নিয়ে তৈরি।

৩. **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum)** সাইটোপ্লাজমের ভিতরে জালের মত বিস্তৃত, নিউক্লিয় পর্দার সাথে সংযুক্ত অঙ্গানু এটি।

৪. **কোষগহ্বর (Vacuole)** সাইটোপ্লাজমে কোষের মধ্যে যে ফাঁকা দেখা যায়, সেগুলোই কোষগহ্বর। বৃহৎ কোষগহ্বর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। প্রাণিকোষে কোষগহ্বর সাধারণত অনুপস্থিত থাকে, থাকলেও সেগুলো আকারে ছোট হয়।

৫. **লাইসোজোম (Lysosome)** ক্ষুদ্র আবরণীযুক্ত অঙ্গাণু।

৩.৩.৪ আবরণীবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

১. **কোষকঙ্কাল (Cytoskeleton):** কোষআবরণীর ভিতরে লম্বা এবং মোটা-চিকন মিশিয়ে অসংখ্য দড়ির মধ্যে বস্তু যা কোষের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। অ্যাকটিন, মায়োসিন, টিউবিউলিন ইত্যাদি প্রোটিন দিয়ে যথাক্রমে মাইক্রোটিউবিউল, মাইক্রোফিলামেন্ট কিংবা ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট দিয়ে কোষকঙ্কালের বিভিন্ন ধরনের তন্তু নির্মিত হয়।

২. **রাইবোজোম (Ribosome)** এই আবরণীবিহীন অঙ্গাণু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে লেগে থাকে।

৩. **সেন্ট্রোজোম Centrosome):** প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি কাঁপা নলাকার বাস্তকার বস্তু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে। সেন্ট্রোজোমে থাকা সেন্ট্রিওল কোষ বিভাজনের সময় অ্যাস্টার তৈরি করে।

৪. **নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus):** জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে নির্দিষ্ট পর্দা ঘেরা ক্রোমোজোম বহনকারী সুস্পষ্ট যে বস্তুটি দেখা যায় তা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এটি গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকার। সিভকোষ এবং লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না।

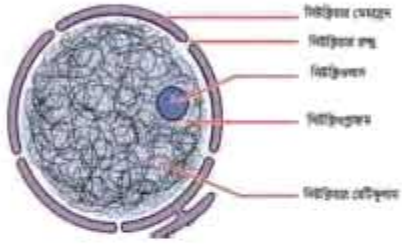

নিউক্লিয়াসের কাজ-

- নিউক্লিয়াসে বংশগতির বৈশিষ্ট নিহিত থাকে।
- কোষে সংঘটিত বিপাকীয় কার্যাবলিসহ সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

সুপঠিত নিউক্লিয়াসে নিচের অংশগুলো দেখা যায়।

ক. নিউক্লিয়ার আবরণী (Nuclear membrane): নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখা যে আবরণী, তাকে নিউক্লিয়ার আবরণী বা কেন্দ্রিক আবরণী বলে। এটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এই আবরণী লিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এতে কিছু ছিদ্র থাকে, যাকে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বলে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল করে। নিউক্লিয়ার আবরণী সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের অন্যান্য বস্তুকে পৃথক রাখা এবং বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm): নিউক্লিয়ার ঝিল্লির ভিতরে জেলির মধ্যে বস্তু বা রস থাকে। একে নিউক্লিওপ্লাজম বলে। নিউক্লিওপ্লাজমে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ও কতিপয় খনিজ লবণ থাকে।

গ. নিউক্লিওলাস (Nucleolus): নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে ক্রোমোজোমের সাথে সংলগ্ন গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকাণু বলে। ক্রোমোজোমের রংগ্রাহী অংশের সাথে এরা লেগে থাকে। এরা RNA ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। এরা রাইবোজোম সংশ্লেষণ করে।

ঘ. ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum): কোষের বিশ্রামকালে অর্থাৎ যখন কোষ বিভাজন চলে না, তখন এই ক্রোমাটিনকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতো জট পাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। ক্রোমাটিন মূলত DNA এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত জটিল কাঠামো। কোষ বিভাজনের সময় এরা মোটা এবং খাটো হয়, তাই তখন তাদের আলাদা আলাদা ক্রোমোজোম হিসেবে দেখা যায়। ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো বংশগতির গুণাবলি বহন করে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নিয়ে যায়। কোনো একটি জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা ঐ জীবের জন্য নির্দিষ্ট।

৩.৩.৫ কোষের কাজ

১) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ এবং হজম করা (Ingestion and Assimilation)- এর মাধ্যমে কোষ তার প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acid), লবণ (Salt) প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করে ও পরিত্যাজ্য অংশ ত্যাগ করে।

২) বৃদ্ধি, মেরামত বা ক্ষয়পূরণ (Growth and Repair)- প্রতিটি কোষের মধ্যে নতুন প্রোটোপাজম তৈরি হয়। গঠনমূলক কাজ (Anabolism) দ্বারা কোষের ক্ষয়পূরণ বা মেরামতের কাজ হয়ে থাকে।

৩) বিপাক প্রক্রিয়া (Metabolism)- প্রতিটি কোষের কাজ করার জন্য চাই শক্তি (Energy)। খাদ্যের কণা যে প্রক্রিয়ায় ভেঙে যায় তাকে ভঙ্গ প্রক্রিয়া (Catabolism) বলে। এরপর খাদ্য কণাগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠনমূলক কাজ করে ও তাপ সৃষ্টি করে। একে (Anabolism) বলা হয়। এই দুইটি প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে বলা হয় বিপাক প্রক্রিয়া (Metabolism)।

৪) শ্বসন (Respiration) ফুসফুস যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তা মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ে রক্তের মাধ্যমে। প্রতিটি কোষ পর্যন্ত তা পৌছায় এবং কোষগুলো এই অক্সিজেন গ্রহণ করে। আবার কোষ থেকে নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা CO_2 শিরা দ্বারা বাহিত হয়ে যায় হৃদপিন্ডে। তারপর তা ফুসফুস থেকে প্রশ্বাসের সঙ্গে বেড়িয়ে যায়।

৫) দূষিত পদার্থ ত্যাগ (Excretion) – শরীরের ত্যাজ্য বা বিষাক্ত পদার্থ কোষগুলো থেকে বেরিয়ে রক্তে মিশে যায়। তারপর তারা নানা পথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহের ত্যাজ্য পদার্থ যে সমস্ত পথে দেহ থেকে বের হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক) বায়বিয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হয় ফুসফুস থেকে নাকের ছিদ্র পথে।

খ) তরল পদার্থ বের হয় বৃক্ক বা Kidney দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে যা মানবদেহের ছাকনির কাজ করে

গ) কঠিন ত্যাজ্য পদার্থ বের হয় মলাশয় বা Colon দিয়ে পায়খানার সঙ্গে আবর্জনা রূপে।

৬) উত্তেজনা ও সঞ্চালন (Irritability and Conductivity) – প্রতিটি কোষ হলো কর্মক্ষম। যে কোনো রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়াজনিত-তাপ, চাপ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, আঘাত প্রভৃতিতে কোষগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠে। আবার কখনও কখনও এটি সংকুচিত হয় যেমন মাংশ পেশীর তন্তু বা Muscle Fibre। হাঁটা-চলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও বা বার্তা বয়ে নিয়ে যায় বা সঞ্চালন করে। যেমন- স্নায়ুতন্তু বা Nerve Fibre। স্নায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মত ছড়িয়ে থাকে। যেকোনো অংশের উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌছে দেয়। চোখের স্নায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের স্নায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে।

৭) প্রজনন (Reproduction) - একটি কোষ ভেঙে দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে। এর মূল হলো সেন্ট্রোসোম (Centrosome) এর কাজ। সেন্ট্রোসাম দুভাগে ভাগ হয় ও সেই সঙ্গে নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর চেহারার পরিবর্তন ঘটে।.তারপর দুটি কোষের মধ্যে একটি স্তর (Layer) পড়ে ও দুটি নিউক্লিয়াসে দুইটি সেন্ট্রোসোম দেখা যায়।। একটি নিউক্লিয়াসে ক্রোমজমের সংখ্যা মোট ৪৬টি। যখন কোষ বিভাজন হয় তখন দেখা যায় প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ৪৬টি করেই ক্রোমজম আছে। তা থেকে এটা বুঝতে পারা যায় যে, প্রতিটি ক্রোমজম দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত রয়েছে। এ ভাবে কোষ বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা (Mitosis)। এছাড়া আর এক ধরনের কোষ বিভাজন হলো পরোক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা (Meiosis)। এটি সাধারণত জনন অঙ্গেই হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় একটি কোষ বিভাজন শেষে প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ২৩টি করে ক্রোমজম থাকে। এর ফলে পুং ও স্ত্রী জনন কোষ তৈরি হয়। এদের নিষিক্তের মাধ্যমে জাইগোট হয়।

৮) মানব দেহের তিন ধরনের রক্তকোষের মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মাধ্যমে কৈশিকনালি হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শ্বেত কণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। অণুচক্রিকা শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে।

৯) ত্বকীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

১০) মাথার ত্বকীয় কোষগুলো থেকে চুল গজিয়ে থাকে।

১১) অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোমলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা, দেহের আকার, গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৩.৪ প্রাণিটিস্যু

একই ভ্রূণীয় কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছু কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তন্তু তৈরি করে। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব (Histology) বলে। যেমন লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা একেক ধরনের কোষ। এরা একত্রে তরল যোজক টিস্যু বা রক্ত নামক টিস্যু হিসেবে পরিচিত। তরল যোজক টিস্যু রক্ত, দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শরীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।

৩.৪.১ প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ

প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্টের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়— আবরণী টিস্যু, যোজক টিস্যু, পেশি টিস্যু এবং স্নায়ু টিস্যু।

৩.৪.১.১ আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

এই টিস্যুর কাজ হলো- অঙ্গকে আবৃত রাখা (Lining), বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা (Protection) করা, প্রোটিনসহ বিভিন্ন পদার্থ ক্ষরণ বা নিঃসরণ (secretion) করা, বিভিন্ন পদার্থ শোষণ (absorption) করা এবং কোষীয় স্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট পদার্থের পরিবহণ (transcellular transport)। আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি বিভিন্ন পর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে এর অবস্থান এবং কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের হয়। যেমন-

i. **স্কোয়ামাস অবিরণী টিস্যু (Squamous Epithelial):** এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আঁশের মতো চ্যাপটা এবং এদের নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়। যেমন- বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর। এই টিস্যু প্রধান আবরণ ছাড়াও ছাঁকনির কাজ করে থাকে।

ii. **কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু (Cuboidal Epithelial):** এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় সমান। যেমন- বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা। এই টিস্যু প্রধান পরিশোষণ এবং আবরণ কাজে লিপ্ত থাকে।

iii. **কলামনার আবরণী টিস্যু (Columnar Epithelial):** এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু এবং লম্বা। যেমন- প্রাণীর অন্ত্রের আন্তঃপ্রাচীরের কোষগুলো মূলত ক্ষ রণ, রক্ষণ এবং শোষণ কাজ করে থাকে।

প্রাণিদেহে ভিত্তিপর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল বা আবরণী টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i. **সাধারণ অবরণী টিস্যু:** ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ একত্রে সজ্জিত। যেমন- বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল, বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা, অন্ত্র প্রাচীর।

ii. **স্ট্র্যাটিফাইড অবরণী টিস্যু:** ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত। উদাহরণস্বরূপ মেরুদন্ডী প্রাণীদের ত্বক। বিশেষ এমন স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু আছে যার স্তরের সংখ্যা মিনিটের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে। একে বলে ট্রানজিশনাল আবরণী। যেমন- মূত্রথলির আন্তঃপ্রাচীর।

iii. **সিউডো-স্ট্র্যাটিফাইড অবরণী টিস্যু:** এই টিস্যু কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর একত্রে বিন্যস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়। যেমন- ট্রাকিয়া।

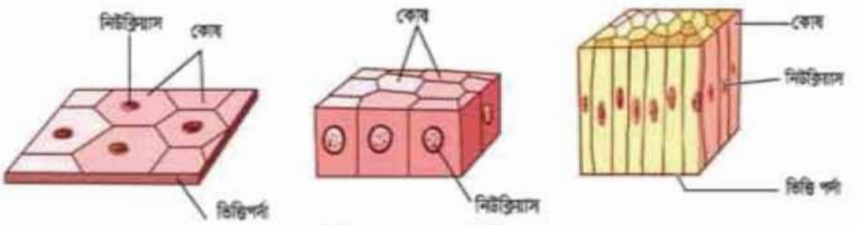

চিত্র ৩.৪: আবরণী টিস্যু

৩.৪.১.২ গ্রন্থি বা Gland

গ্রন্থি বা Gland হলো নিঃসরণের যন্ত্র (Secretory Organ) যা দেহের বিভিন্ন স্থানে থাকে। যেমন- যকৃত (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas), পিত্তথলি (Gall Bladder), পাকস্থলী (Stomach) প্রভৃতি। ক্ষরণ পদ্ধতি ও ক্ষরণ নির্গমন নালীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রন্থিগুলো প্রধানত ২টি ভাগে ভাগ করা হয়-

১। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) বা নালীযুক্ত গ্রন্থি (Gland with duct)- যে সব গ্রন্থি এর রাসায়নিক রস নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলের অদূরে বহন করে নিঃসরণ করে। এদের নিঃসৃত রস বা জুস (Juice) নামে পরিচিত। যেমন- লালা গ্রন্থি (Salivary Gland), যকৃত (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas) প্রভৃতি।

২। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland) বা নালীবিহীন গ্রন্থি (Ductless Gland)- যে সব গ্রন্থি নালীবিহীন, এদের নিঃসরণ সরাসরি রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয় । যেমন- পিটুইটারী (Pituitary), থাইরয়েড (Thyroid), এড্রিনাল (Adrenal) প্রভৃতি। নিঃসরণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গ্রন্থিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

১। শ্লেষ্মা গ্রন্থি বা (Mucous Gland)- এইগুলো শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। যেমন- জিহ্বার নিচে সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (sublingual Gland)।

২। সেরাস গ্রন্থি বা (Serous Gland)- এগুলো পাতলা জলীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। যেমন:- অগ্নাশয় (Pancreas), প্যারোটিড লালা গ্রন্থি (Parotid Salivary Gland)।

৩। মিশ্র গ্রন্থি বা (Mixed Gland)- এরা শ্লেষ্মা ও পাতলা জলীয় পদার্থ উভয়ই নিঃসরণ করে।

৩.৪.২ যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

যোজক বা কানেকটিভ টিস্যুতে মাতৃকার (Matrix) পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম। গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা-

- **ফাইব্রাস যোজক টিস্যু (Fibrous Connective Tissue):** এই ধরনের যোজক টিস্যু ত্বকের নিচে পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।
- **স্কেলিটাল যোজক টিস্যু (Skeletal Connective Tissue):** দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে। এই টিস্যু দেহের কাঠামো গঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট প্রকৃতি এবং দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলনে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এরকম দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে। ঐচ্ছিক পেশিগুলোর

সংযুক্তির ব্যবস্থা করে। গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দুধরনের হয়। যেমন: কোমলাস্থি এবং অস্থি।

- **তরল যোজক টিস্যু (Fluid connective tissue):** তরল টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহণ করা, রোগ প্রতিরোধ করা এবং রক্ত জমাট বাঁধায় বিশেষ ভূমিকা রাখা। তরল যোজক টিস্যু দুই ধরনের, রক্ত এবং লসিকা।
- **কোমলাস্থি (Cartilage)-** কোমলাস্থি এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাক ও কানের পিনা কোমলাস্থি দিয়ে তৈরি।

৩.৪.২.১ অস্থি (Bone): অস্থি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, ভঙ্গুর এবং অনমনীয় টিস্যু যার মাতৃকায় ক্যালসিয়াম-জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে দেহের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় যোজক কলায় পরিণত হয়। এর ম্যাট্রিক্সে পানি (২৫%), জৈব পদার্থ (৩০%) ও অজৈব পদার্থ (৪৫%) দ্বারা গঠিত হওয়ায় সম্পূর্ণ কলাটি কঠিন। জৈব অংশটি কোলাজেন (Collagen) ও অস্টিওমিউকয়েড (Osteomucoid) নিয়ে গঠিত হয়। অজৈব অংশটি প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট নিয়ে গঠিত। ম্যাট্রিক্সে অস্থিকোষ (Osteocyte) ছড়ানো থাকে। পেরিঅস্টিয়াম (Periosteum) নামক তন্তুময় যোজক কলা নির্মিত পাতলা ও মসৃণ আবরণ প্রতিটি অস্থিকে ঘিরে রাখা। অস্থির গঠন ও অস্থির ম্যাট্রিক্স কতকগুলো স্তরে সাজানো থাকে। স্তরগুলোকে ল্যামেলী (Lamellae) বলে। ল্যামেলীগুলো একটি সুস্পষ্ট নালীর চারদিকে চক্রাকারে বিন্যস্ত। কেন্দ্রিয় এই নালীকে হ্যাভারসিয়ান নালী (Haversian canal) বলে। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান নালী ও একে বেষ্টনকারী ল্যামেলীগুলোর সমন্বয়ে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (Haversian system) সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ল্যামেলায় ল্যাকুনা নামে কতগুলো ক্ষুদ্র গহবর থাকে। অস্থিকোষ ল্যাকুনার ভেতরে অবস্থান করে। প্রতিটি ল্যাকুনার চারদিক থেকে সূক্ষ্ম নালিকা বেরোয়। এদের ক্যানালিকুলি (Canaliculi) বলা হয়। এসব নালিকার মাধ্যমে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের বিভিন্ন ল্যাকুনা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

অস্থি মজ্জা (Bone Marrow)- অস্থির কেন্দ্রস্থলে যে গহবর থাকে তার নাম মজ্জা গহবর (Medullary cavity)।লম্বা অস্থির মজ্জা গহ্বরে এবং স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে যে নরম, জেলি সদৃশ, উচ্চ রক্তবাহী নালী সমৃদ্ধ বস্তু থাকে তাকে অস্থি মজ্জা (Bone marrow) বলে। অস্থি মজ্জা দেহের বৃহত্তম অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি এবং এর প্রধান কাজগুলো রক্ত উৎপন্ন করা। অস্থি মজ্জা দুই ধরনের: ১) লাল অস্থি মজ্জা (Red bone marrow) ও ২) হলুদ অস্থি মজ্জা (Yellow bone marrow)

অস্থির প্রকারভেদ

ক) ঘনত্ব ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে অস্থিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

১। **ঘনসন্নিবিষ্ট বা দৃঢ় অস্থি (Compact bone):** লম্বা অস্থি যেমন ফিমার ও হিউমেরাস এর অস্থিকান্ডের (Diaphysis) অংশে এ দৃঢ় অস্থি পাওয়া যায়।

২। **স্পঞ্জ বা জালিকা সদৃশ অস্থি (Spongy bone):** মাথার খুলি ও চ্যাপ্টা অস্থিগুলোতে এ ধরনের অস্থি পাওয়া যায়।

খ) আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে অস্থিকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

১। লম্বা অস্থি (Long Bone)- যেমন হিউমেরাস (Humerus), রেডিয়াস (Redius), আলনা (Ulna), ফিমার (Femer), টিবিয়া (Tibia) এবং ফিবুলা (Fibula)।
২। খাটো অস্থি (Short bone)- হাত ও পায়ের ছোট অস্থি- কারপাল (Carpal) এবং টারসাল (Tarsal)
৩। চ্যাপ্টা অস্থি (Flat bone)- স্ক্যাপুলা (Scapula), স্টারনাম (Sternum), পাজরের অস্থি বা (Rib)।
৪। অসম আকৃতির অস্থি (Irregular bone) - কশেরুকা (Vertebra)।
৫। বায়ু প্রকোষ্ঠ অস্থি (Pneumatic bone)- ম্যাক্সিলা (Maxilla), স্ফেনয়েড (Sphenoid) ও ইথময়েড (Ethmoid)।
৬। পেশি থেকে উদ্ভূত ছোট অস্থি (Sesamoid bone) - প্যাটেলা (Patella) ও পিজিফর্ম (Pisiform)

৩.৫ কঙ্কাল / অস্থি তন্ত্র (Skeletal system)

অস্থি তন্ত্র (Skeletal system)-বিশেষ ধরনের যোজক কলা নির্মিত অস্থি (Bone) ও তরুণাস্থি (Cartilage) -এর সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের কাঠামো নির্মাণ, অঙ্গ রক্ষণ এবং ভার বহন করে তাকে অস্থি তন্ত্র বলে।

অস্থি তন্ত্রের কাজ-

১। দৈহিক কাঠামো গঠন ও আকৃতি প্রদান
২। চলাচল- সংযুক্ত পেশির সংকোচনের মাধ্যমে চলন ঘটায়।
৩। রক্ষণাবেক্ষণ-মস্তিষ্ক, সুষুম্না কাণ্ড, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি নরম ও সংবেদনশীল অঙ্গসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।
৪। সঞ্চয়- অস্থি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সঞ্চয় করে।
৫। লোহিত কণিকা উৎপাদন- অস্থি মজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়।

অস্থি তন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস

মানবদেহের মোট ২০৬টি অস্থি আছে যা প্রধান ২ টি ভাগে ভাগ করা হয়-
১) অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র (Axial skeletal system),
২) উপাঙ্গীয় অস্থিতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।

অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র- যে অস্থিসমূহ দেহের অক্ষরেখা বরাবর অবস্থান করে মস্তিষ্কের এবং দেহ গহ্বরের নরম অঙ্গগুলোকে ধারণ করে ও রক্ষা করে, তাদের অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র বলে। এই তন্ত্রে যেসব অস্থি আছে সেগুলো হল-
১) মাথার খুলি বা করোটির অস্থি (Skull bones)
২) গলার অস্থি (Hyoid bone)
৩) মেরুদন্ডের অস্থি (Vertebral column)
৪) বুকের অস্থি ও পাঁজরের অস্থিসমূহ (Sternum and rib)

চিত্র ৩.৫- মানব কঙ্কাল

মানবদেহের অস্থিসমূহের তালিকা

প্রধান ভাগ	অস্থির সংখ্যা	অন্তর্ভুক্ত অংশ	অস্থির সংখ্যা	বিন্যাস ও সংখ্যা		মোট অস্থির সংখ্যা
অক্ষিয় অস্থি	৮০টি	করোটি	২৮টি	করোটিকা	ফ্রন্টাল---------- ১টি প্যারাইটাল------- ২টি টেম্পোরাল------ ২টি অক্সিপেটাল------ ২টি স্ফেনয়েড-------- ১টি এথময়েড--------- ১টি	৮টি
				মুখমন্ডলীয় অস্থি	মক্সিলা ---------- ২টি ম্যান্ডিবল---------- ১টি জাইগোম্যাটিক------২টি ন্যাসাল---------- ২টি ল্যাক্রিমাল --------- ২টি ইনফিরিয়র ন্যাসাল-- ২টি ভোমার---------- ১টি প্যালেটাইন -------- ২টি	১৪টি
				কানের অস্থি	ম্যালিয়াস---------২টি ইনকাস----------২টি স্টেপিস----------২টি	৬টি
		হাইওয়েড	১টি		হাইওয়েড অস্থি---১টি	১টি
		দেহকান্ড	৫১টি	মেরুদন্ড	সারভাইক্যাল------৭টি থোরাসিক------- ১২টি লাম্বার ---------- ৫টি স্যাক্রাল---------- ৫টি কক্সিজিয়াল------- ৪টি	৩৩টি
				বক্ষ পিঞ্জর	ষ্টার্ণাম----------১টি পর্শুকা----------২৪টি	২৫টি
উপাঙ্গীয় অস্থি	১২৬টি	উধক্ষাঙ্গ	৬৪টি	গ্রীবা ও পিঠ	ক্লাভিকল----------২টি স্ক্যাপুলা----------২টি	৪টি
				বাহু	হিউমেরাস ----------২টি রেডিয়াস----------২টি আলনা----------২টি	৬টি

				হাত	কারপাল----------১৬টি মেটা কারপাল-------১০টি ফ্যালেঞ্জেস--------- ২৮টি	৫৪টি
		নিম্নাঙ্গ	৬২টি	বক্ষ	নিতম্ব অস্থি ---------- ২টি (ইলিয়াম,ইস্তিয়াম,পিউবিস)	২টি
				উরু ও পা	ফিমার----------২টি টিবিয়া----------২টি ফিবুলা----------২টি প্যাটেলা----------২টি	৮টি
				পাদতল	টার্সাল----------২টি মেটা টার্সাল ----------২টি ফ্যালেঞ্জেস------ ---২৮টি	৫২টি

৩.৫.১ করোটি (Skul)

২৮টি অস্থি নিয়ে করোটি গঠিত। এগুলো দুভাগে বিভক্ত- করোটিকা (Cranium) বা (Cranial bone) ও মুখমন্ডলীয় অস্থি (Facial bone)।

ক) **করোটিকা (Cranium)**- করোটিকা ৮টি চ্যাপ্টা ও শক্ত অস্থি নিয়ে গঠিত। অস্থিগুলো খাঁজকাটা কিনারাযুক্ত হওয়ায় একত্রে ঘন সন্নিবেশিত ও দৃঢ়সংলগ্ন থাকে।

১) **সম্মুখস্থ অস্থি (Frontal bone)**

২) **প্যারাইটাল অস্থি (Parietal bone)**

৩) **টেমপোরাল অস্থি (Temporal bone)** এ অস্থিতে শ্রবণাঙ্গ, শ্রমতি নালী, ক্যারোটিড নালী ও মুখমন্ডলীয় স্নায়ুর নালী অবস্থান করে।

৪) **অক্সিপিটাল অস্থি (Occipital bone)**

৫) **স্ফেনয়েড অস্থি (Sphenoid bone)**- এর দুই পাশে টেমপওরাল অস্থি, সামনে এথময়েড ও পিছে অক্সিপিটাল অস্থি থাকে।

৬) **এথময়েড অস্থি (Ethmoid bone)**

করোটিকার কাজ

- মস্তিষ্ককে আবৃত রাখা,
- মস্তিষ্ককে ধারণ করে এবং
- আঘাত হতে রক্ষা করে।

খ) মুখমন্ডলীর অস্থি (Facial bone)

করোটিকার সামনের ও নিচের দিকের অংশ মুখমন্ডল অস্থি নিয়ে গঠিত। (প্রত্যেক কানে ৩টি করে মোট ৬ টি অস্থি, জিহবার পেছন দিকে গোড়ায় হাইওয়েড নামে অস্থি থাকে। এসব অস্থি অস্থিগণনার বাইরে থাকে)।

১) **উর্ধব চোয়াল বা (Maxilla)**

২)) **নিম্ন চোয়াল বা (Mandible)** - ম্যান্ডিলই করোটির একমাত্র নড়নক্ষম অস্থি।

৩) জাইগোম্যাটিক অস্থি (Zygomatic bone)
৪) নাসিকা অস্থি (Nasal bone)
৫) ল্যাক্রিমাল অস্থি (Lacrimal bone)
৬) (Inferior Nasal Concha)
৭) ভোমার (Vomar)
৮) প্যালেটাইন অস্থি (Palatine Bone)

হাইওয়েড অস্থি (Hyoid Bone) চোয়াল ও স্যারিংক্সের মাঝখানে অবস্থিত। ঘাড়ের অনেক পেশি এ অস্থির সাথে লাগানো থাকে।

মুখমন্ডলীয় অস্থির কাজ

- চোখ, কান, নাক ও মুখ এসব গহ্বরের আকৃতি দেয়,
- চোখ, কান, নাক ও মুখের অঙ্গ ধারণ ও রক্ষণ করে।

৩.৫.২ দেহকান্ড

দেহকান্ড দুটি অংশ নিয়ে গঠিত- ১) মেরুদন্ড ও ২) বক্ষপিঞ্জর।

৩.৫.২.১ মেরুদন্ড (Vertebral Column)- মেরুদন্ডকে শিরদাঁড়া বা স্পাইনাল কলাম নামেও অভিহিত করা হয়। ৩৩টি কশেরুকা বা (Vertebra) নিয়ে মেরুদন্ড গঠিত। একটি আদর্শ কশেরুকা অনিয়মিত আকৃতির অস্থি যার গঠন বিভিন্ন কশেরুকায় বিভিন্ন রকম।

আদর্শ কশেরুকা বৈশিষ্ট -

১) দেহ (Body)- সামনের স্থূলো অংশ যা স্পঞ্জি অস্থিতে গঠিত।
২) আর্চ (Arch)- পিছন দিকে পাতলা অস্থি নিয়ে গঠিত।
৩) ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন (Intervertebral Foramen)- এই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerve) ও রক্তবাহিকা অতিক্রান্ত হয়।
৪) কশেরুকীয় ছিদ্র (Vertebral Foramen)- সকল কশেরুকীয় ছিদ্র সম্মিলিতভাবে ভার্টিব্রাল ক্যানেল (Vertebral Canal) নির্মাণ করে। এর ভেতরে আবরণীসহ সুষুম্না কান্ড (Spinal Cord) ও রক্তবাহিকা সুরক্ষিত থাকে।

চিত্র ৩.৬- কশেরুকা

কশেরুকার প্রকারভেদ-

অবস্থান অনুযায়ী ৫ অঞ্চলে ভাগ করা হয়

১। সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা (Cervical vertebrae) — --- — --- — ৭টি
২। থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা (Thoracic vertebrae) . — --- — --- — ১২টি
৩। লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা (Lumbar vertebrae) --- — --- — --- — — ৫টি
৪। স্যাক্রাল (শ্রোনিদেশীয়) কশেরুকা (Sacral vertebrae) --- --- --- --- — --- —৫টি (একীভূত)
৫। কক্সিজিয়াল (পুচ্ছদেশীয়) কশেরুকা (Coccygeal vertebrae) --- — --- — ---৪টি (একীভূত)।

পরিণত বয়সে শ্রোণিদেশীয় কশেরুকা একীভূত হয়ে স্যাক্রাম (Sacrum) এবং পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা কক্সিস (Coccyx) গঠন করে, ফলে পৃথক অস্থি আকারে কশেরুকার সংখ্যা ২৬টিতে দাঁড়ায়।

১। **গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা**- সংখ্যা ৭টি

এর মধ্যে তিনটি ভিন্ন গড়নের কশেরুকা-

১। এ্যাটলাস (Atlas/ ১ম কশেরুকা),

২। এ্যাক্সিস (Axis/ ২য় কশেরুকা) ও

৩। (Vertebra Prominans/ ৭ম কশেরুকা)

৩.৫.২.২ বক্ষপিঞ্জর দেহের পর্শুকা, বক্ষদেশীয় কশেরুকা ও স্টার্নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে খাঁচার আকৃতি বক্ষপিঞ্জর তৈরি করে। বক্ষপিঞ্জরের গঠন-

- একটি স্টার্নাম (Sternum),
- ১২ জোড়া পর্শুকা (Ribs) ও
- ১২টি কশেরুকা নিয়ে গঠিত হয়।

স্টার্ণাম বৈশিষ্ট্য-

১। বুকের কেন্দ্রীয় সম্মুখ অংশে অবস্থিত চাপা অস্থি

২। ৩টি অংশে বিভক্ত –

ক) উপরের ত্রিকোণাকার ম্যানুব্রিয়াম,

খ) মাঝের লম্বা দেহ, এবং

গ) নিচের ক্ষুদ্র জিফয়েড প্রসেস।

৩। পার্শ্ব কিনারায় ক্ল্যাভিলের এবং ৭ জোড়া পর্শুকার খাঁজ থাকে।

পর্শুকা বৈশিষ্ট্য-

১। লম্বা, সুরু, চাপা ও বাঁকা অস্থি।

২। দেহে ১২ জোড়া পর্শুকা থাকে।

৩। একটি আদর্শ পর্শুকার বৈশিষ্ট্য

ক) পশ্চাৎপ্রান্তে ফ্যাসেটবাহী মস্তক বা ক্যাপিচুলাম, ক্রেস্টবাহী গ্রীবা, সংযোগী তলসহ টিউবার্কল থাকে

খ) দেহ কোণ করে বাঁকানো থাকে।

গ) পর্শুকার সম্মুখ প্রান্ত তরুণাস্থিময়।

- ঘ) প্রথম ৭ জোড়া পর্শুকা তরুণাস্থি দিয়ে স্টার্ণামের সাথে যুক্ত থাকে, এদের প্রকৃত পর্শুকা বলে।

৪। বাকি ৫ জোড়া (৮ম-১২তম) স্টার্নামের সাথে যুক্ত নয় বলে নকল পর্শুকা বলে।

৫। ৮ম, ৯ম ও ১০ম পর্শুকা তরুণাস্থির সাথে একীভূত হয়ে কোস্টাল আর্চ (Costal arch) তৈরি করে।

৬। ১১ ও ১২তম পর্শুকা সামনে অংশ উন্মুক্ত থাকে, তাই এদের 'ভাসমান পর্শুকা' বলে।

৭। পর্শুকার অন্তর্তলের নিচের কিনারায় কোস্টাল খাদে স্নায়ু ও রক্তবাহিকা অবস্থান করে।

৮। প্রথম পর্শুকার উপরতলে সংস্পর্শে সাবক্লাভিয়ান ধমনী ও শিরা থাকে।

৯। উপরে ও নিচে দুই কোস্টাল তরুণাস্থির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে ইন্টারকোস্টাল স্পেস বলে।

বক্ষ পিঞ্জরের কাজ- হৃদপিন্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বক্ষপিঞ্জরের ভেতরে সুরক্ষিত থাকে।

২। উপাঙ্গীয় কঙ্কাল: উর্ধাঙ্গ (দুইবাহু ও বক্ষ-অস্থিচক্র) ও নিম্নাঙ্গ (দুইপা ও শ্রোণি-অস্থিচক্র) এর অস্থিগুলোকে একত্রে উপাঙ্গীয় কঙ্কাল বলে।

উর্ধাঙ্গের অস্থিসমূহ: বক্ষ-অস্থিচক্র ও দুইবাহু নিয়ে উর্ধাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩২ টি করে মোট ৬৪ টি অস্থি উর্ধাঙ্গের অন্তর্গত।

বক্ষ অস্থি ও হাতের অস্থি

১) পিঠের ত্রিকোণাস্থি (Scapula),
২) কণ্ঠার অস্থি (Clavicle),
৩) উর্ধ্ব বাহুর অস্থি (Homarus),
৪) সম্মুখ বাহুর অস্থি (Radius & Ulna),
৫) কারপাল অস্থি (Carpal Bones),
৬) মেটা কারপাল অস্থি (Meta carpal Bones) এবং
৭) হাতের আঙুলের অস্থি (Phalanges)।

নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ: শ্রোণি-অস্থিচক্র ও দুইপা নিয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩১টি করে মোট ৬২টি অস্থি নিম্নাঙ্গে রয়েছে।

শ্রোণি অস্থি ও পায়ের অস্থি -

১) বস্থিদেশের হাড় (Pelvis),
২) উরুর অস্থি (Femur),
৩) নিম্ন পায়ের অস্থি (Tibia & fibula),
৪) গড়ালি সংলগ্ন অস্থি (Tarsal bones),
৫) চরণ অস্থি (Metatarsal bones) এবং
৬) পায়ের আঙ্গুলের অস্থি (Phalanges)।

২) **নিম্ন পায়ের অস্থি-** নিম্ন পা এ দুটি অস্থি থাকে- টিবিয়া ও ফিবুলা।

টিবিয়া- বেশি মোটা এর উর্ধ প্রান্ত দুটি কন্ডাইল থাকে। টিবিয়ার দেহ ত্রিধারবিশিষ্ট। এর সম্মুখ কিনারা ঝুঁটি (Shin) নামে পরিচিত। টিবিয়ার নিম্ন প্রান্তে ম্যালিওলাস নামে দুটি উঁচু অংশ থাকে। এতে ট্যালাসের (টার্সাল অস্থি) সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সংযোগী তলও রয়েছে।

ফিবুলা- দেখতে দীর্ঘ ষষ্টির মতো। এর মস্তক চোখা ধরনের ও নিচের দিকে থাকে।

৩) **চরণ**- গোড়লি, পদতল ও আঙ্গুল নিয়ে চরণ গঠিত।

- গোড়ালি ও পদতলের পৃষ্ঠভাগ গঠিত হয় ৭টি বিভিন্ন আকৃতির টার্সাল অস্থি দিয়ে-
    - ১টি করে ক্যালকেনিয়াস, ট্যালাস, কিউবয়েড, নেভিকুলার ও
    - ৩টি কিউনিফর্ম।
- মেটাটার্সালের সংখ্যা ৫। এগুলো নলাকার ও সামান্য লম্বা এবং পদতল গঠন করে।
- পায়ের আঙ্গুলের অস্থিগুলো ফ্যালাঞ্জেসে গঠিত। পা এর অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে সন্ধির মাধ্যমে যুক্ত। নিতম্ব সন্ধি, হাটুর সন্ধি ও গোড়ালি সন্ধি সবচেয়ে বড়।

পায়ের কাজ: ভারবহন করে ও চলাচলের সাহায্য করে।

অস্থিসন্ধি (Joints): যে স্থানে দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগ হয়, তাদের মধ্যে নড়াচড়া হলে অথবা না হলেও তাকে অস্থিসন্ধি বলে। অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে যোজক কলা দিয়ে এমনভাবে যুক্ত থাকে যাতে সংলগ্ন অস্থিগুলো বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চালিত হতে পারে। তাই দেখা যায়, কোনো কোনো অস্থিসন্ধি একেবারেই অনড়- করোটির অস্থিসন্ধি। কোনোটি আবার সামান্য সঞ্চালনক্ষম- আন্তঃকশেরুকীয় অস্থিসন্ধি। কিছু সন্ধির ফলে অস্থিগুলো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দে সঞ্চালনক্ষম হয়ে থাকে।

অস্থিসন্ধির শ্রেণিবিন্যাস: অস্থিসন্ধি ৩ রকমের হয়ে থাকে-
ক) তন্তুময় সন্ধি, খ) তরুণাস্থিময় সন্ধি এবং গ) সাইনোভিয়াল সন্ধি।

গ) সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি (Synovial joints) বৈশিষ্ট্য-

- সাইনোভিয়াল গহ্বর থাকে।
- দুই অস্থির সংযোগী তল মসৃণ স্বচ্ছ তরুণাস্থির (Hyaline cartilage) পাতলা স্তরে আবৃত থাকে
- পঞ্জর বেষ্টনকারী সাইনোভিয়াল আবরণী (Synovial membrane) নিঃসৃত মিউকোপলিস্যাকারাইডে গঠিত সাইনোভিয়াম নামে পিচ্ছিল তরলের প্রলেপ থাকে।
- সন্ধি গহ্বরটি আর্টিকুলার ক্যাপসুল নামে একটি ফিব্রাস আবরণিতে বেষ্টিত।

সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধির শ্রেণিবিন্যাস

সংযোগকারী তলের সংখ্যার ভিত্তিতে দুই ভাগ করা হয়- ১) সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি ও ২) জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি। সংযোগকারী তলের আকারের উপর ভিত্তি করে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধিকে ৬ প্রকারে বিভক্ত করা যায়: ১) সমতল অস্থিসন্ধি, ২) হিঞ্জ অস্থিসন্ধি, ৩) পিভট অস্থিসন্ধি, ৪) কন্ডাইলয়েড অস্থিসন্ধি, ৫) স্যাডল অস্থিসন্ধি এবং ৬) বল ও কোটর অস্থিসন্ধি।

১) সমতল অস্থিসন্ধি (Plane joints)- এক্ষেত্রে অস্থিসন্ধিতে দুটি অস্থির সংযোগী তল চাপা বা সামান্য বাঁকানো এবং অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় যে কোনো দিকে সঞ্চালিত হয়। উদাহরণ- দুটি কার্পাল অস্থির মধ্যকার সংযোগ (Intercarpal joints); দুটি মেটাটার্সাল অস্থির মধ্যকার সংযোগ (Intermetatarsal joints)।

২) কব্জা অস্থিসন্ধি (Hinge joints)- এক্ষেত্রে একটি অস্থির উত্তল মস্তক অন্য অস্থির অবতল অংশে এমন চমৎকার ভাবে বসানো থাকে যার ফলে অস্থির চলন শুধু দরজার কপাটের মতো হয়। উদাহরণ- কনুইয়ের সন্ধি (Elbow joints); হাঁটুর সন্ধি (Knee joints)।

৩) পিভট অস্থিসন্ধি (Pivot joints)- এ ক্ষেত্রে একটি অস্থির গোল সুচালো বা কোণাকার সংযোগী তল এমন একটি রিং-এর ভেতর ঢোকানো থাকে যা অন্য একটি অস্থি ও লিগামেন্টের অংশ নিয়ে গঠিত এবং প্রবিষ্ট অস্থিটি কেবল ঘূর্ণনে সক্ষম হয়। উদাহরণ- প্রথম দুইটি গ্রীবা দেশীয় বা সারভাইকাল কশেরুকার মধ্যকার অস্থিসন্ধি (Atlanto-axial joint)।

৪) কন্ডাইলয়েড অস্থিসন্ধি (Condyloid joints)- এ ক্ষেত্রে একটি অস্থির ডিম্বাকার মস্তক অন্য অস্থির ডিম্বাকার গহ্বরে ঢোকানো থাকে এবং যে কোনো তলে সঞ্চালনক্ষম হলেও ঘূর্ণনে অক্ষম থাকে। উদাহরণ- হাঁটুর সন্ধি (Knee joint)।

৫) স্যাডল অস্থিসন্ধি- এক্ষেত্রে এক অস্থির সংযোগী তলের একদিক উত্তল অন্যদিক অবতল এবং দ্বিতীয় অস্থির বৈশিষ্ট ঠিক তার বিপরীত। এই সন্ধিতে অস্থির বিভিন্নমুখী সঞ্চালন সম্ভব হলেও ঘূর্ণন অত্যন্ত সীমিত। উদাহরণ- বৃদ্ধাঙ্গুলের কার্পাল ও মেটাকার্পালের মধ্যকার সন্ধি (Carpometacarpal joint of the thumb)।

৬) বল ও কোটর অস্থিসন্ধি (Ball and socket joint)- এক্ষেত্রে একটি অস্থির বলের মতো গোল মস্তক অন্য অস্থির পেয়ালাকৃতির গহ্বরে ঢোকানো থাকে এবং যে কোনো অক্ষে বা তলে তাদের সঞ্চালন ঘটে। উদাহরণ- স্কন্ধসন্ধি (Shoulder joint), জঙ্ঘাসন্ধি (Hip joint)।

একটি আদর্শ অস্থি সন্ধির গঠন-

১। **অস্থিসন্ধির বহির্ভাগ-** অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বচ্ছ তরুণাস্থিতে (Hyaline cartilage) মোড়ানো থাকে।

২। অস্থিসন্ধি আবরণী- এ আবরণী অস্থিসন্ধির বহির্ভাগে থাকে ও সেখান থেকে অস্থি আবরণীতে মিলে যায়।
৩। অস্থিসন্ধি গহ্বর- এ গহ্বর সংকীর্ণ ফাঁকের মত যা সন্ধির তরুনাস্থির বহির্ভাগ ও অস্থিসন্ধি আবরণী দিয়ে চারদিকে আবদ্ধ থাকে। এতে সাইনোভিয়াল রস নিঃসৃত হয়।

মানুষের চলনে পেশি ও অস্থিতন্ত্রের সমন্বয় মানুষের চলনে পেশি ও পেশির সঙ্গে যুক্ত অস্থির মাধ্যমে হয়। চলনের জন্য পেশি ও অস্থির সমন্বয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে পেশি-অস্থিতন্ত্র (Musculo-skeletal system)।

মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা

বিভিন্ন পেশির ভূমিকা-

১) এক্সটেন্সর (Extensor)- এ ধরনের পেশি অঙ্গকে প্রসারিত করে বা ছড়িয়ে দেয়— ট্রাইসেপস্ (Triceps) যা সম্মুখ বাহুকে প্রসারিত করে।

২) ফ্লেক্সর (Flexor)- এ ধরনের পেশি অঙ্গকে দুই ভাঁজ করে- বাইসেপস্ (Biceps) যা কনুইকে বাঁকায়।

৩) এবডাক্টর (Abductor)- এ পেশি দেহের অক্ষ থেকে দেহের অঙ্গকে দূরে সরিয়ে নেয়- ডেলটয়েড পেশি (Deltoid muscle)।

৪) এডাক্টর (Adductor)- এ পেশি কোনো অঙ্গকে দেহ অক্ষের কাছে টেনে আনে- ল্যাটিসিমাস ডরসি (Latissimus dorsi)।

৫) ডিপ্রেসর (Depressor)- এ পেশি কোনো অঙ্গকে নিচে নামায় - ডিপ্রেসর ম্যানডিবুলা (Depressor mandibula) নামে পেশি নিচের চোয়াল নামিয়ে মুখগহ্বরকে উন্মুক্ত করে।

৬) লিভেটর (Levator)- কোনো অঙ্গকে নিচ থেকে উপরে তোলে - ম্যাসেটার (Masseter) নিচের চোয়াল উপরে তুলে মুখ বন্ধ করে।

৭) রোটেটর (Rotator)- এ পেশি অঙ্গকে প্রধান অক্ষের চারপাশে বা ডানে বাঁয়ে ঘোরায় - পিরিফর্মিস (Pyriformis) ফিমারকে উপরে তোলে বা ঘোরায়।

৮) প্রোট্রাক্টর (Protractor)- এ পেশি সংশ্লিষ্ট অস্থিকে উপর দিকে টেনে অঙ্গকে সামনে প্রসারিত করে।

৯) রিট্রাকটর (Retractor)- এ পেশি সংশ্লিষ্ট অস্থিকে নিচের দিকে টেনে অঙ্গকে পেছনের দিকে প্রসারিত হয়।

মানুষের চলনে পেশি-অস্থিতন্ত্রের ভূমিকা: চলনের সময় মানুষ তার দেহের ভার পর্যায়ক্রমে ডান ও বাঁ পায়ের উপর ভর করে। কারণ যে সময় কোনো এক পা মাটির উপর উঠে থাকে তখন মাটিতে লাগানো পা বা মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ওজন স্থানান্তরের অভিকর্ষ রেখা বাহিত হয়।

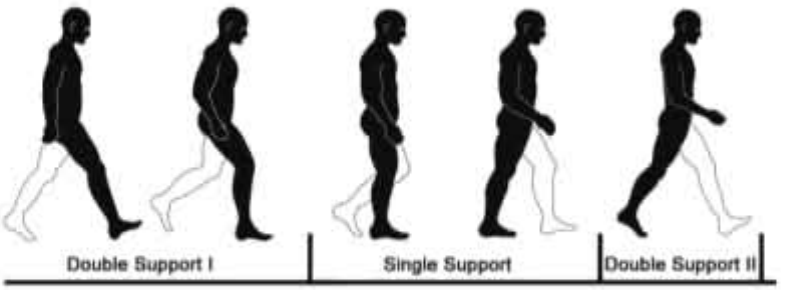

চিত্র ৩.৭: সঞ্চারণ ও চলন

রক্তঃ

তরল যোজক টিস্যু (Fluid connective tissue): রক্ত এক ধরনের ক্ষারীয়, ঈষৎ লবণাক্ত এবং লালবর্ণের তরল যোজক টিস্যু। ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয়।

রক্তের বৈশিষ্ট-

ক) রক্তের পরিমাণ ৭০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্কের : ৫-৬ লিটার।

খ) স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া : সামান্য ক্ষারীয়, pH =৭.৩৬ -৭.৪৫

গ) আপেক্ষিক গুরুত্ব : ১.০৫২ হতে ১.০৬০ এর মধ্যে।

ঘ) রক্তের তাপমাত্রা : ৩৬± হতে ৩৮± সেলসিয়াস।

ঙ) স্বাদ : লবণাক্ত।

চ) বর্ণ : লাল; লোহিত কণিকায় লৌহ উপাদান হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির জন্য রক্তের রং লাল হয়।

রক্তের কাজ

- অক্সিজেন পরিবহণ: লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনের ও প্লাজমার মাধ্যমে রক্ত ফুসফুস থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা কলাতে অক্সিজেন বহন করে ।
- কার্বন-ডাই-অক্সাইড: অন্তঃশ্বসনের ফলে সৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড কলা থেকে ফুসফুসে পরিবহণ করে।
- খাদ্যসার : পরিপাককৃত খাদ্যর অন্ত্র থেকে কলা ও কোষে পরিবহণ করে।
- সঞ্চিত খাদ্য পরিবহণ: দেহের বিভিন্ন সঞ্চয় ভান্ডার (যেমন-যকৃত) থেকে খাদ্যসার কলাকোষে বহন।
- হরমোন পরিবহণ: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোন দেহের প্রয়োজনীয় কোষে পরিবহণ করে।
- দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ: অধিকতর সক্রিয় কলায় উৎপন্ন তাপ দেহের সর্বত্র রক্তের সাহায্যে বন্টনের ফলে শরীরের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- জীবানু প্রতিরোধ: শ্বেত কণিকাগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবানু গ্রাস করে ধংস করে।
- ক্ষত নিরাময়: ফাইব্রোব্লাষ্ট উৎপন্ন করে কলার ক্ষত নিরাময় করে।
- রক্তপাত প্রতিরোধ: উচন (Clotting) প্রক্রিয়ায় ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ করে।

রক্তের উপাদান:

১) রক্ত কণিকা (Blood Corpuscles) -৪৫%

রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ধরনের কোষকে রক্তকণিকা বলে।

প্রধানত তিন প্রকার: ক) লোহিত রক্তকণিকা (Erythrocyte), খ) শ্বেত রক্তকণিকা (Leucocyte) ও গ) অনুচক্রিকা (Platelet)।

চিত্র ৩.৮: রক্তের কণিকা সমূহ

লোহিত রক্ত কণিকা (Erythrocyte): মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা ক্ষুদ্র দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো লাল রংয়ের কোষ। এতে হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। এর কিনারা মসৃন এবং মধ্যাংশের চেয়ে পুরু। পরিণত কনিকা অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক।

- পরিমাণ: সুস্থ দেহের রক্তে ১৫ গ্রাম/১০০মিলি হিমোগ্লোবিন থাকে।
- আয়তন: গড় ব্যাস ৭.৩¯ এবং গড় স্থুলতা ২.২¯
- সংখ্যা: বিভিন্ন বয়সের মানবদেহের প্রতিঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তণিকার সংখ্যা নিম্নরূপ
    - ভ্রূণ: ৮০-৯০ লক্ষ
    - শিশু: ৬০-৭০ লক্ষ;
    - পূর্ণবয়স্ক পুরুষ: ৫০ লক্ষ; পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী: ৪৫ লক্ষ।
- বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন- ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বাড়ে।
- উৎপত্তি স্থল: ভ্রূণীয় জীবনে যকৃত, প্লীহা ও থাইমাস থেকে সৃষ্টি হয়। জন্মের পর ২০ বছর পর্যন্ত দেহের প্রায় সব লম্বা অস্থির অস্থিমজ্জার Haemocytoblast নামক কোষ থেকে এবং জীবনের বাকি সময় যা হিউমেরাস, ফিমার, স্টার্নাম, কশেরুকা,পর্শুকা প্রভৃতি অস্থির লাল অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়।
- আয়ু: গড় আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)।
- লোহিত রক্ত কণিকার কাজ

> ফুসফুসের হিমোগ্লোবিন শরীরের সবখানে অক্সিজেন (O) বহন করে।

> নিষ্কাশনের জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO) কে কলা (Tissue) থেকে ফুসফুসে বহন করে।

> হিমোগ্লোবিন বাফার হিসেবে কাজ করে রক্তের সাধারণ ক্রিয়া বজায় রাখতে সাহায্য করে।

শ্বেত রক্ত কণিকা (Leucocyte): মানবদেহের পরিণত শ্বেতকণিকা অনিয়তাকার ও নিউক্লিয়াস যুক্ত বড় কোষ। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবানু ধ্বংস করে। আকার: নির্দিষ্ট আকারবিহীন, প্রয়োজনে আকার পরিবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াস প্রথমে গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কাকার ও অশ্বখুরাকার ধারণ করে। নিউক্লিয়াস

চিত্র ৩.৯: রক্তের শ্বেত কণিকা সমূহ

- সাইটোপ্লাজমের চাপে একপ্রান্তে অবস্থান করে।
- আয়তন: লোহিত রক্ত কণিকার চেয়ে বড়। গড় ব্যাস ভিন্নতা অনুসারে ৭.৫-২০¯

- সংখ্যা: প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে সংখ্যা বাড়তি থাকে।
- গঠন: শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিওপ্রোটিন সমৃদ্ধ এবং গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, এসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে।

আকৃতি ও গঠনগত ভাবে শ্বেত রক্ত কণিকাকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা - ক) দানাহীন (Agranulocytes) এবং খ) দানাময় (Granulocytes)।

ক) এগ্র্যানুলোসাইট: দানাহীন, স্বচ্ছ ও বৃহদাকার নিউক্লিয়াসযুক্ত। আকৃতিগত ভাবে এরা দুই ধরনের, যথা- লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) ও মনোসাইট (Monocyte)। এদের

- উৎপত্তি স্থল: লসিকা গ্রন্থি, প্লীহা, থাইমাস ও ক্ষুদ্রান্ত্রের লসিকা কলা থেকে।

লিম্ফোসাইট: সমসত্ব ও ক্ষারাসক্ত সাইটোপ্লাজোমের পাতলা স্তরে আবৃত বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ছোট কণিকা। এরা কৈশিক নালী থেকে যোজক কলায় অভিযাত্রী হতে পারে।

মনোসাইট: বিপুল পরিমাণ সাইটোপ্লাজম ও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবাহী বড় কণিকা।

লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট রক্ত কণিকার কাজ:

> লিম্ফোসাইট এন্টিবডি উৎপন্ন করে।
> লিম্ফোসাইট থেকে ফাইব্রোব্লাস্ট সৃষ্টি হয়ে কলার ক্ষয়পুরণ করে।
> মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধংস করে।

খ) গ্রানুলোসাইট: সূক্ষ দানাময় এবং ২-৭ খন্ডযুক্ত নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। দানাগুলো লিশম্যান রঞ্জকে নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণধারার ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রানুলোসাইট ৩ ধরনের, যথা :

নিউট্রোফিল (Neutrophil): নিউট্রোফিল এর সাইটোপ্লাজম বর্ণ নিরপেক্ষ দানাযুক্ত।

ইসিনোফিল (Eosinophil) : ইওসিনোফিল এর দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণধারণ করে।

ব্যাসোফিল (Basophil): ব্যাসোফিল এর দানাগুলো ক্ষারাসক্ত হয়ে নীল বর্ণ ধারণ করে

নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও ব্যাসোফিল কণিকার কাজ

> নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইট্রোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ভক্ষণ করে।
> ইসিনোফিল ও ব্যাসোফিল হিস্টামিন নিঃসৃত করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
> ব্যাসোফিল নিসৃত হেপারিন রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতর জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

অনুচক্রিকা (Thrombocytes or Platelets):

অনুচক্রিকা ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা। এটি দানাময় ও নিউক্লিয়াসবিহীন।

আকার: গোল, ডিম্বাকার বা দন্ডাকার কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন।

আয়তন: ৩ -৫ ব্যাস বিশিষ্ট

সংখ্যা: পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে সংখ্যা প্রায় ২.৫-৫ লক্ষ।

গঠন: দানাময় সাইটোপ্লাজম, গহ্বর, পিনোসাইটিক গহ্বর ও অন্যান্য কোষ অঙ্গাণু একক আবরণী বেষ্টিত।

উৎপত্তি স্থল:অস্থিমজ্জার অন্যতম বড় কোষ মেগাক্যারিওসাইট (Megakaryocyte) এর ভগ্ন ক্ষুদ্রাংশ থেকে উৎপত্তি হয়। অন্যদের মতে শ্বেত কণিকা থেকে থ্রম্বাসোইটের সৃষ্টি হয়।

আয়ু: গড় আয়ু প্রায় ৫-১০দিন ।

পরিণতি:আয়ু শেষে প্লীহা, যকৃৎ ও অন্যান্য অঙ্গে বিনষ্ট হয়।

অণুচক্রিকার কাজ

> রক্ত জমাট বাঁধতে অংশ নেয়।

> রক্তজালিকার ক্ষতিগ্রস্থ এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠনে অংশ নেয়।
> বিভিন্ন সংকোচনধর্মী পদার্থ ক্ষরণের মাধ্যমে রক্তবাহিকার সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত বন্ধে সাহায্য করে।

এরাইথ্রোসাইট, লিউকোসাইট এবং থ্রম্বোসাইট-এর মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	এরাইথ্রোসাইট	লিউকোসাইট	থ্রম্বোসাইট
সংখ্যা (/mm^3 of blood)	৫০ লক্ষ	৫-৮ হাজার	২.৫৫ লক্ষ
নিউক্লিয়াস	পরিপক্ক অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না	সব সময় নিউক্লিয়াস থাকে	কোনো সময়ই নিউক্লিয়াস থাকে না
বর্ণ	লাল	বর্নহীন	বর্নহীন
আয়ু	১২০ দিন	নির্দিষ্ট নয়	৫-৯ দিন
আকৃতি	দ্বি -অবতল, চাকতির মত	গোলাকার বা অনিয়মিত	
কাজ	শ্বসন	রোগ প্রতিরোধ	রক্ত তঁচন

২) **রক্তরস (Plasma)** ৫৫%

রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশকে রক্তরস বলে। এতে রয়েছে

ক) পানির পরিমাণ ৯১ - ৯২%।

খ) দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮ - ৯%।

গ) জৈব পদার্থ ৭.১ - ৮.১%। যেমন- গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, লবন, ভিটামিন ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, বিলিরুবিন, কেরোটিন ইত্যাদি।

ঘ) অজৈব পদার্থ ০.৯%। যেমন- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি।

রক্ত রসের কাজ

> পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গে বাহিত হয়।
> কলা থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়।
> কলার অধিকাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্ত রসে বাইকার্বনেট রুপে দ্রবীভূত থাকে।
> অতি অল্প পরিমাণ অক্সিজেন এতে বাহিত হয়। লোহিত কণিকায় সংবদ্ধ হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়।
> হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বহন করে।
> রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

রক্ত জমাট বাঁধার পদ্ধতি

শরীরের ক্ষতস্থান থেকে তরল রক্ত বেরিয়ে ঘন জেলীর মতো থকথকে পিন্ডে পরিণত হলে, তাকে রক্তজমাট (Clot) বলে। রক্তরস থেকে রক্তজমাটের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকে রক্তের জমাট বাঁধা বলে। রক্ত ঘাটতির - হাত থেকে রক্ষা পেতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া মানুষের এক গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া ১৩টি ফ্যাক্টর (Factor) -এর সমন্বয়ে কয়েকটি ক্রমান্বয়িক ধাপে সংঘটিত হয়। নিচে রক্ত। জমাট বাঁধার প্রধান ধাপগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো

১) আঘাতের ফলে ক্ষতস্থানে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিদীর্ণ কলা থেকে থ্রোম্বোপ্লাস্টিন নামক এনজাইম বের হয়।

২) থ্রোম্বোপ্লাস্টিন ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রোম্বিনকে সক্রিয় থ্রোম্বিনে পরিণত করে।

৩) থ্রোম্বিন ফিব্রিনোজেনকে ফিব্রিন নামক জালকে রূপান্তরিত করে।

৪) ফিব্রিন জালকে লোহিত ও শ্বেত কণিকা জড়িয়ে যায় এবং কোষজাত উপাদানগুলো এবং রক্তের অন্যান্য অংশ আটকে থাকে, ফলে রক্ত জমাট বাধে।

লসিকা: মানবদেহে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Intercellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় তাকে লসিকা বলে। এগুলো ছোট নালির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে একটি আলাদা নালিকাতন্ত্র গঠন করে, যাকে

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) বলে। লসিকা ঈষৎ ক্ষারীয় স্বচ্ছ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ। এর মধ্যে কিছু রোগপ্রতিরোধী কোষ থাকে, এদের লসিকাকোষ (Lymphoid cell) বলে।

প্লাজমা, সিরাম ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	প্লাজমা	সিরাম	লসিকা
প্রকৃতি	এটি রক্তের জলীয় অংশ	রক্ত জমাট বাঁধার পর জমাট পদার্থ নিঃসৃত জলীয় অংশ।	রজালক থেকে নিঃসৃত জলীয় অংশ
রক্তকনিকা	এর মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা থাকে	এতে রক্তকণিকা থাকে না।	প্রধানত লিম্ফোসাইট, শ্বেত রক্তকণিকা থাকে।
ফিব্রিনোজেন	বিপুল পরিমাণ	অনুপস্থিত	সামান্য পরিমাণ
অবস্থান	প্রধানত রক্তপ্রবাহে ও হৃদপ্রকোষ্ঠে অবস্থান করে	সাধারণ অবস্থায় দেহের মধ্যে থাকে না।	প্রধানত আন্তঃকোষীয় স্থানে অবস্থান করে।

৩. পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

ভ্রূণের মেসোডার্ম থেকে তৈরি সংকোচন ও প্রসারণক্ষম বিশেষ ধরনের টিস্যুকে পেশি টিস্যু বলে। এদের মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত। পেশিকোষগুলো সরু, লম্বা এবং তন্তুময়। যেসব তন্তুতে আড়াআড়ি ডোরাকাটা থাকে, তাদের ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle) এবং ডোরাবিহীন তন্তুকে মসৃণ পেশি (Smooth muscle) বলে। পেশিকোষ সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও অভরীণ পরিবহণ ঘটায়। অবস্থান, গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে পেশি টিস্যু তিন ধরনের, ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি এবং হৃৎপেশি।

(i) ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary) বা ডোরাকাটা পেশি (striated muscle): এই পেশি প্রাণির ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশিটিস্যুর কোষগুলো নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত হয়। এদের সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশি দ্রুত সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে পারে। ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতন্ত্রের সংলগ্ন থাকায় একে কঙ্কালপেশিও বলে। উদাহরণ মানুষের হাত এবং পায়ের পেশি।

(ii) অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বা মসৃণ পেশি (Smooth muscle): এই পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণির ইচ্ছাধীন নয়। এ পেশি কোষগুলো মাকু আকৃতির। এদের গায়ে আড়াআড়ি দুগ থাকে না। এজন্য এ পেশিকে মসৃণ পেশি বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণিদের রক্তনালি, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদির প্রাচীরে অনৈচ্ছিক পেশি থাকে। প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন, খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের ক্রমসংকোচন।

(iii) কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি (Cardiac muscle)- এই পেশি মেরুদন্ডী প্রাণীদের হৃৎপিন্ডের এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি। এই টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক পেশির মতো), শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে ইন্টার‍্যালকেটেড ডিস্ক (Intercalated disc) থাকে। এর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশির গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজ অনৈচ্ছিক পেশির মতো। কার্ডিয়াক পেশির কোষগুলো শাখার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে এবং একযোগে সঙ্কুচিত হয়। মানব ভ্রূণ সৃষ্টির একটা বিশেষ পর্যায় থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত স্বপিন্ডের কার্ডিয়াক

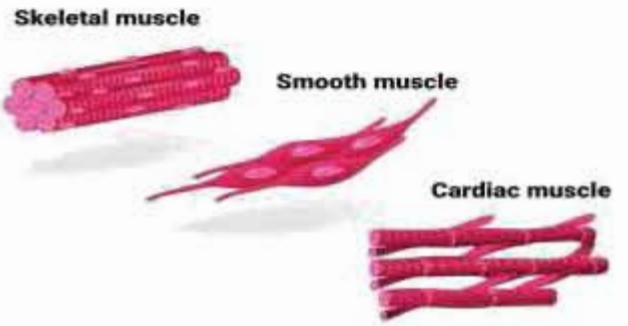

চিত্র ৩.১০: বিভিন্ন পেশী সমূহ

(iv) পেশি একটা নির্দিষ্ট গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া সচল রাখা।

হৃদপিন্ড (Heart)

হৃদপিন্ড হল হৃদপেশী দিয়ে তৈরি ত্রিকোণাকার ভেতরে ফাঁপা প্রকোষ্ঠযুক্ত পাম্পের মত যন্ত্র যা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত করে। একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃদপিন্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি নিলয় থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার রক্ত বের করে দেয়। একটি হৃদপিন্ডের ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম। মহিলাদের হৃদপিন্ড পুরুষের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ ওজনে কম হয়। হৃদপিন্ডের অবস্থান ও হৃদপিন্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপর এবং দুই ফুসফুসের মাঝ বরাবর বামদিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থান করে। এর গোড়া (Base) চওড়া ও উপরের দিকে থাকে এবং সুঁচালো শীর্ষদেশ (Apex) নিচের দিকে পঞ্চম পাঁজরের ফাকে (5th inter costal space), বুকের বাঁ দিকে (Nipple) এর ১/২ ইঞ্চি নিচে ও পিছনে থাকে। এটি স্টারনাম (Sternum) ও রিবগুলোর (Ribs) পেছনে অবস্থিত।

হৃদপিন্ডের গঠন: হৃদপিন্ডের লেয়ার (Layer) ৩টি। বাইরে পেরিকার্ডিয়াম। মাঝে মাইওকার্ডিয়াম (Myocardium) এবং ভিতরে এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)।

হৃদপিন্ড একটি দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা ঝিল্লিতে আবৃত। এর বাইরের স্তর প্যারাইটাল (Parietal) এবং ভিতরেরটি ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম (Visceral pericardium), দুই স্তরের মাঝখানে অবস্থিত তরল পদার্থ হৃদপিন্ডের সংকোচন সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি দেখতে লালচে রংয়ের ও ত্রিকোণাকার। মানুষের হৃদপিন্ড সম্পূর্ণভাবে চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের দুটিকে ডান ও বাম অলিন্দ (Right & left ventricle) এবং নিচের দুটিকে ডান ও বাম নিলয় থাকে। বাম অপেক্ষা ডান নিলয়ের প্রাচীর প্রায় তিন গুণ পুরু থাকে। অলিন্দ ও নিলয় উভয়ে লম্বালম্বিভাবে যে পর্দা (Septum) দিয়ে বিভক্ত থাকে তাদের যথাক্রমে –

ক) অলিন্দ পর্দা (Inter-atrial septum) এবং

খ) আন্তঃনিলয় পদ (Inter-ventricular septum) বলে।

ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগকারী ছিদ্র ট্রাইকাস্পিড কপাটিকায় (Tricuspid valve) সংরক্ষিত থাকে। বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথের কপাটিকা বাইকাস্পিড কপাটিকা (Bicuspid valve) নামে পরিচিত। এ উভয় ধরনের কপাটিকা নিলয় প্রাচীরের মাংসল অভিক্ষেপ রূপী প্যাপিলারী পেশি (Papilary muscle) করডি টেন্ডেনি (Cordae tendinae) নামক তন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে উদ্ভূত পালমোনারী ধমনীর ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় থেকে সৃষ্ট অ্যাওটার মুখের কপাটিকা দুইটি অর্ধচন্দ্রাকার (Semilunar)। এরা রক্তকে পেছনদিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। অলিন্দে আগত শিরাগুলোর প্রবেশ পথ কপাটিকাবিহীন। এপিকার্ডিয়ামে প্রায়ই চর্বি লেগে থাকে। মায়োকার্ডিয়াম হৃদপিন্ডের সংকোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। হৃদপিন্ডের প্রকোষ্ঠগুলো এন্ডোকার্ডিয়ামে গঠিত। এ স্তর কপাটিগুলোকেও বেষ্টন করে রাখা এবং প্রধান রক্তবাহিকাগুলোর অন্তঃস্থ স্তরের সাথে অবিচ্ছিন্ন।

হৃদপিন্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন: হৃদপিন্ডের সংকোচন প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভেতরে গতিশীল থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার হৃদস্পন্দন ঘটে। হৃদপিন্ডের এ সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদস্পন্দন হয়ে থাকে। হৃদপিন্ডের এ সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (Systole) ও ডায়াস্টোল (Diastole) বলে। হৃদপিন্ডের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে রক্ত সংবহিত হয় :

১। শরীরের উর্ধ্বভাগ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং নিম্ন ভাগ থেকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার মাধ্যমে হৃদপিন্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে।

২। ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত দুইটি পালমোনারী শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে পৌঁছায়।

৩। ডান অলিন্দ সংকোচনের সময় নিলয় প্রসারিত থাকে। তাই অলিন্দের মধ্যে চাপ বেশি থাকে এবং নিলয়ের মধ্যে চাপ কম থাকে। এ চাপ পার্থক্যের জন্য ডান অলিন্দ- নিলয় ছিদ্র পথে অবস্থিত ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা খুলে যায় এবং CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এ সময় ভেনাক্যাভা দুইটির কপাটিকা বন্ধ থাকে।

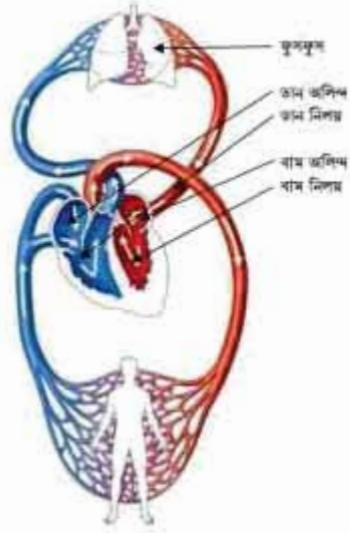

চিত্র ৩.১০: রক্তসংবহন

৪। ডান অলিন্দ সংকোচনের সময়ই বাম অলিন্দের ও সংকোচন ঘটে এবং একই ভাবে বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে অবস্থিত বাইকাস্পিড

কপাটিকা খুলে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এ সময় পালমোনারী শিরা দুটির কপাটিকা বন্ধ থাকে।

৫। অলিন্দ খালি হয়ে গেলে এর সংকোচন শেষ হয়ে। প্রসারণ শুরু হয় এবং সংগে সংগে রক্তে পূর্ণ নিলয়ের সংকোচন ঘটে, ফলে নিলয়ের মধ্যে চাপ বাড়ে এবং বাইকাস্পিড ও ট্রাইকাস্পিড কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাওটা ও পালমোনারী ধমনীতে অবস্থিত সেমিলুনার (অর্ধচন্দ্রাকার) কপাটিকা খুলে যায়।

৬। ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিশোধনের জন্য পালমোনারী ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রেরিত হয়।

৭। বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওটায় প্রেরিত হয়।

৮. অ্যাওর্টা থেকে ধমনী, শাখা-ধমনী ও কৈশিক জালিকার মাধ্যমে রক্ত সারা দেহে সংবহিত হয়। এভাবে হৃদপিন্ডের ভেতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে রক্তসংবহন অব্যাহত থাকে এবং প্রত্যেক স্পন্দনের সময় চক্রাকারে। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

হৃদপিন্ডের মধ্যে দিয়ে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

হৃদচক্র বা কার্ডিয়াক সাইকেল (Cardiac cycle): হৃদপিন্ডের প্রতি স্পন্দনে হৃদপিন্ডের পরিবর্তনগুলোর যে চক্রাকার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে কার্ডিয়াক সাইকেল বা হৃদচক্র বলে। স্বাভাবিকভাবে হৃদস্পন্দনের হার যেহেতু মিনিটে ৭০-৮০ (গড়ে ৭৫) বার সেহেতু হৃদচক্রের স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড। প্রতি স্পন্দনে হৃদপিন্ড একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত হয়। হৃদপিন্ডের সংকোচনকে সিস্টোল এবং প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। হৃদচক্র চলাকালীন হৃদপিন্ডে রক্ত সংবহন ঘটনা প্রবাহ সমুহঃ

১। অলিন্দের ডায়াস্টোল (Atrial diastole)

ক) অলিন্দ দুইটি প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে।

খ) ট্রাইকাস্পিড এবং বাইকাস্পিড কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) অলিন্দ মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে বাম নিলয় দেহে বিভিন্ন অংশ থেকে $CO_২$ সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র এবং ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অলিন্দে এবং পালমোনারী শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে $O_২$ সমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। এ সময় হৃদপিন্ডের পেশি থেকেও $CO_২$ সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অলিন্দে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড। অলিন্দ দুইটি রক্তপূর্ণ হলে অলিন্দের সিস্টোল হয়।

২) অলিন্দের সিস্টোল (Atrial systole)

ক) এ সময় অলিন্দ দুটি সংকুচিত হয়।

খ) ট্রাইকাসপিড ও বাইকাস্পিড কপাটিকা উন্মুক্ত থাকে এবং সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) অলিন্দ মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে ডান অলিন্দ থেকে $CO_২$, সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে $O_২$, সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.১ সেকেন্ড।

৩) নিলয়ের সিস্টোল (Ventricular systole)

ক) নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়।

খ) ট্রাইকাস্পিড ও বাইকাস্পিড কপাটিকা বন্ধ এবং সেমিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে।

গ) নিলয় মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং নিলয় থেকে রক্ত নিলয়ের বাইরে নির্গত হয়। ডান নিলয় থেকে $CO_২$ সমৃদ্ধ রক্ত পালোনারী ধমনীতে এবং বাম নিলয় থেকে $O_২$ সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

৪) নিলয়ের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole)

ক) এ সময় নিলয় দুটি শিথিল অবস্থায় থাকে।

খ) বাইকাস্পিড ও ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা উন্মুক্ত হয় এবং সেমিনার কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) নিলয় মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায় ফলে অলিন্দ দুটি থেকে রক্ত নিয়ে প্রবেশ করে। ডান অলিন্দ থেকে $CO_২$ সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে এবং বাম নিলয়ে $O_২$ রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড।

(d) স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissue)

দেহের বিশেষ সংবেদী কোষ নিউরন বা স্নায়ুকোষগুলো একত্র স্নায়ু টিস্যু গঠন করে। স্নায়ু টিস্যু পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা যেমন তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি বার্তা আকারে বহন করে নিয়ে যায়। একটি আদর্শ নিউরনের তিনটি অংশ থাকে, কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং অ্যাক্সন। নিউরন কোষ বহুভুজাকৃতি এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবডি, রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি থাকে, তবে সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না। কোষদেহের চারদিকের শাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রন থেকে যে শাখা বের হয়, তাদের ডেনড্রাইট বলে। ডেনড্রাইটের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। নিউরনের কোষদেহ থেকে একটি লম্বা স্নায়ুতন্তু পরবর্তী নিউরনের ডেন্ড্রাইটের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে অ্যাক্সন বলে। একটি নিরনের একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে। পরপর দুটি নিউরনে প্রথমটির অ্যাক্সন এবং পরেরটি ডেনড্রাইটের মধ্যে যে স্নায়ুসন্ধি গঠিত হয়, তাকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয়। স্নায়ুটি উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মস্তিস্কে তাতে সাড়া দেয়। উচ্চতর প্রাণীতে স্নায়ুটি স্মৃতি সংরক্ষণ (Memorise) করাসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

অঙ্গ ও তন্ত্র

তন্ত্র (Organ System): কয়েকটি অঙ্গ একত্রিত হয়ে তৈরি হয় একটি **তন্ত্র**। মানবদেহকে প্রধানত ১১ টি তন্ত্রে বিভক্ত করা যায়। যেমন- কঙ্কালতন্ত্র, পেশি তন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, হৃদপিন্ড ও রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকাতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র, অন্তঃক্ষরাতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও বহিরাবরণতন্ত্র।

- **কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal System):** এই তন্ত্র অস্থি, তরুণাস্থি, সন্ধি প্রভৃতি সমন্নয়ে গঠিত। কঙ্কালতন্ত্রের কাজ-দৈহিক কাঠামো গঠন, চলাচল, রক্ষণাবেক্ষণ, সঞ্চয়, লোহিত কণিকা উৎপাদন প্রভৃতি।
- **পেশিতন্ত্র (Muscular System):** এই তন্ত্র অস্থির সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশি নিয়ে গঠিত। পেশি কলা মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের কাজ করে।
- **শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System)** এই তন্ত্র শ্বাস যন্ত্র বা Pharynx, শ্বাসনালী বা Trachea, Bronchi এবং তার সঙ্গে যুক্ত ফুসফুসদ্বয় বা Lungs ও তার বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত। বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্তে মিশ্রিত করা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্ত থেকে বের করে দিয়ে রক্তকে বিশুদ্ধ করা শ্বসনতন্ত্রের কাজ।
- **রক্তসংবহনতন্ত্র (Cardio Vascular System):** এর মধ্যে আছে হৃৎপিন্ড বা Heart, ধমনী বা Artery, শিরা বা Vein এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত সরু ও সূক্ষতম ধর্মনী ও শিরার নালিকাগুলো। রক্তসবহন তন্ত্রের কাজ- রক্তসঞ্চালন, অক্সিজেন পরিবহণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহণ, খাদ্যসার পরিবহণ, সঞ্চিত খাদ্য পরিবহণ, হরমোন পরিবহণ, দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি।
- **লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System):** লসিকা, লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা নালী নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়। লসিকার কাজ- প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ, প্রোটিন পরিবহণ, তৈলাক্ত বা স্নেহ পদার্থ পরিবহণ, পুষ্টি, শোষণ, দেহ রসের পুনর্বণ্টন প্রভৃতি।
- **পরিপাকতন্ত্র (Digestive System):** মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র , যকৃত, অগ্নাশয়, পিত্তথলি প্রভৃতি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়। পরিপাকতন্ত্রের কাজ- খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ, বৈর্জ্য পদার্থ ত্যাগ প্রভৃতি এই তন্ত্রের কাজ।

- **রেচনতন্ত্র (Urinary System):** এক জোড়া বৃক্ক, এক জোড়া রেচন নালী বা ইউরেটার, একটি মূত্রথলি ও মূত্রনালী নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত। রেচনতন্ত্রের কাজ- রক্ত থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য অপসারণ করা, রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা, ভিটামিন ডি ও লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশ নেয়া, দেহে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদির পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
- **জননতন্ত্র (Reproductive System):** পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত। জননতন্ত্রের কাজ- মানুষের বংশবৃদ্ধি করা, পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেট শুক্রাণু, ডিম্বাণু সৃষ্টি ও নিষেক করা।
- **অন্তঃক্ষরা তন্ত্র (Endocrine System)** পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারা থাইরয়েড, এড্রেনাল প্রভৃতি গ্রন্থি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়। অন্তঃক্ষরা তন্ত্রের কাজ দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ, জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্য নিয়ন্ত্রণ, মাতৃদেহে দুধ ক্ষরণ ও নিয়ন্ত্রণ, বিপাক বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করা।
- **স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System):** এই তন্ত্র মস্তিস্ক (Brain) ও তা থেকে ছড়িয়ে পড়া সুষুমা কান্ড (Spinal Cord) এবং তার সঙ্গে অসংখ্য স্নায়ু (Nerves) নিয়ে গঠিত। স্নায়ুতন্ত্রের কাজ- অনুভূতি গ্রহণ, পরিবহণ, সমন্বয় এবং স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করা।
- **ত্বকতন্ত্র (Integumentary system)** দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে তাকে ত্বক বা চামড়া (skin) বলে। শরিরের সবচেয়ে বড় এই অঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত, যা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ত্বক, চুল, নখ, ঘর্ম গ্রন্থি এবং তৈল গ্রন্থি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত। বহিরাবরণ তন্ত্রের কাজ দেহের প্রতিরক্ষা, তাপ নিয়ন্ত্রণ, জলীয় পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়াও বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। দেহের জলীয় অংশকে দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।

বিশেষ অনুভূতির অঙ্গসমূহ (Special Sense Organs): মানুষের বিশেষ বিশেষ অনুভূতি ও কাজের জন্য যে সব অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় তাকে বিশেষ অনুভূতির অঙ্গ (Special Sense Organs) বলা হয়। সেগুলো হলো –

১। জিহ্বা বা Tongue যার দ্বারা আমরা স্বাদ গ্রহণ করি।
২। চক্ষু বা Eye যার দ্বারা আমরা দর্শন করি।
৩। নাক বা Nose যার দ্বারা আমরা ঘ্রাণ উপভোগ করি।
৪। কান বা Ear যার দ্বারা আমরা শব্দ শ্রবণ করি।
৫। চর্ম বা Skin যার দ্বারা আমরা স্পর্শ অনুভব করি।

মানবদেহের তরল পদার্থ

মানব দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর তরল পদার্থ (Body Fluids) রয়েছে। মানব দেহের তরল পদার্থ (Fluids) মূলত দুইটি ভাগে বিন্যাস করা হয়-

আন্তঃকোষ তরল পদার্থ (Intracellular Fluids)- মানবদেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যস্থিত তরলকে আন্তঃকোষ তরল পদার্থ (Intracellular Fluids) বলে যা পদার্থ শরীরের মোট ওজনের ৪০%।

বহিঃকোষ তরল পদার্থ (Extracellular Fluids)- দেহের বিভিন্ন কোষের বাইরে এই তরল পদার্থ থাকে। যা শরীরের মোট তরল পদার্থের শতকরা ২০% ভাগ। বহিঃকোষ তরল পদার্থ তিনটি ভাগে বিভক্ত –

ক) কোষসমূহের মধ্যবর্তী তরল পদার্থ (Interstitial Fluids),
খ) রক্তের তরল পদার্থ (Blood Plasma),
গ) ট্রান্সসেলুলার তরল পদার্থ (Transcellular Fluid)।
কোষসমূহের মধ্যবর্তী তরল পদার্থের উদাহরণ- ক্যাপিলারি ফ্লুইড

ট্রান্সসেলুলার তরল পদার্থের উদাহরণ: ক) সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal Fluid); খ) সাইনোভিয়াল ফ্লুইড (Synovial Fluid); গ) পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড (Peritoneal Fluid); ঘ) পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড (Pericardial Fluid); ঙ) ইন্ট্রাঅকুলার ফ্লুইড (intraocular Fluid) প্রভৃতি।

রক্তের তরল পদার্থ বা (Blood Plasma)-এর পরিমাণ শরীরের মোট ওজনের ৫% বা প্রায় ৩ লিটার। এর কাজ বহন করা। বহিঃকোষ তরল পদার্থের সঙ্গে রক্তের তরল পদার্থের যে আদান-প্রদান চলে তা প্রত্যক্ষভাবে হয় না। প্লাজমার চাপ বা Hydrostatic Pressure থাকে বেশি। তাই প্রস্বেদন প্রক্রিয়া (Osmosis) দ্বারা এই আদান-প্রদান (Fluid Exchange) হয়ে থাকে। প্লাজমাতে প্রোটিন আছে, যা বহিঃকোষ তরল পদার্থের মধ্যে তা নেই। এই সব তরল পদার্থের অভাব হলে তা পানি দ্বারা পূর্ণ হয়। তরল পদার্থের অভাব প্রকট হলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যেমন: কলেরা জনিত ডাইরিয়া হলে অথবা অতিরিক্ত রক্তপাত হলে মানুষের শরীরে তরল পদার্থের অভাব প্রকট হয়ে পরে। এক বা একাধিক টিস্যু দিয়ে তৈরি এবং একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম প্রাণিদেহের অংশবিশেষকে অঙ্গ (Organ) বলে। অবস্থানভেদে মানবদেহে দুধরনের অঙ্গ আছে। বাহ্যিক অঙ্গ-চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা ইত্যাদি। আর অভ্যন্তরীণ অঙ্গ- জীবদেহের ভিতরের অঙ্গগুলো যেমন- পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ইত্যাদি। পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শরীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের ধারণা দেওয়া হলো।

পরিপাক: মানবদেহের কোষ গুলোকে সজীব এবং কার্যকর রাখার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য জটিল এবং জৈব যৌগ অবস্থায় গ্রহণ করা হয় যা দেহের কোষগুলো সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। খাদ্যকে শোষণযোগ্য ও কোষ উপযোগী করতে হলে তাকে ভেঙে সহজ, সরল এবং তরল অবস্থায় রুপান্তর করাকে পরিপাক বলে। দেহ দুভাবে খাদ্য পরিপাক করে- যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

যান্ত্রিক প্রক্রিয়া: খাদ্যদ্রব্য মুখগহবরে দাঁতের সাহায্যে চিবানো হয়। প্রথমত চিবানোর ফলে খাদ্য ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়। পাকস্থলি এবং অন্ত্রের মধ্যে এই টুকরা খাদ্যবস্তুগুলো মন্ডে পরিণত হয়।

রাসয়নিক প্রক্রিয়া: রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিপাকের দ্বিতীয় ধাপ। পরিপাক রসের এনজাইম খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ফলে জটিল উপাদানগুলো ভেঙে দেহের গ্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত হয়।

পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System): পৌষ্টিকনালি এবং কয়েকটি গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে শুরু হয়ে পায়ুতে শেষ হয়। বিস্তৃত এই নালিপথ কোথাও সরু আবার কোথাও প্রশস্ত। এর প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ:

(ক) **মুখ (Mouth)**: মুখ থেকে পৌষ্টিকনালি শুরু। এটি নাকের নিচে আড়াআড়ি একটি বড় ছিদ্র, যেটি উপরে এবং নিচে ঠোঁট দিয়ে বেষ্টিত থাকে।

(খ) **মুখগহবর (Buccal cavity)**: মুখের অভ্যন্তরে দাঁত, জিহবা ও লালাগ্রন্থি থাকে। এগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে। জিহবা খাদ্যকে নেড়েচেড়ে চিবাতে সাহায্য করে এবং তার স্বাদ গ্রহণ করে। কানের নিচে চোয়ালের পাশে জিহবার

নিচে অবস্থিত লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসের মিউসিন খাদ্যকে পিচ্ছিল করে গলধ:করণে সাহায্য করে। লালারসের টায়ালিন ও মলটেজ নামক এনজাইম শর্করা পরিপাকে অংশ নেয়।

(গ) **দাঁত (Tooth):** মানবদেহে সবচেয়ে শক্ত অংশ দাঁত। প্রাপ্ত বয়সে মুখগহ্বরে উপরে ও নিচের চোয়ালে সাধারণত ১৬ টি করে মোট ৩২ টি দাঁত থাকে। মানবদেহে দাঁত দুবার গজায়। প্রথমবার শিশুকালে দুধ দাঁত, দুধদাঁত পড়ে গিয়ে ১৮ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্থায়ী দাঁত গজায়। স্থায়ী দাঁত চার ধরনের। সেগুলো হচ্ছে-

- কর্তন দাঁত (Incisor): এই দাঁত দিয়ে খাবার কেটে টুকরা করা হয়।
- ছেদন দাঁত (Canine): এই দাঁত দিয়ে খাবার ছেড়া হয়।
- অগ্রপেষণ দাঁত (Premolar): এই দাঁত দিয়ে চর্বণ, পেষণ উভয় কাজ করা হয়।
- পেষণ দাঁত (Molar): এই দাঁত চর্বণ ও পেষণে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) **গলবিল (Pharynx):** মুখগহ্বরের পরে পৌষ্টিকনালির অংশ হল গলবিল। মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তু গলবিলের মধ্য দিয়ে অন্ননালিতে পৌঁছে।

(ঙ) **অন্ননালি (oesophagus):** গলবিল থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত নালিটির নাম অন্ননালি। খাদ্যবস্তু এই নালির মধ্যে দিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছে।

(চ) **পাকস্থলী (Stomach)**: অন্ননালি এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝখানে একটি থলির মতো অঙ্গ। এর প্রাচীর পুরু ও পেশি বহুল। পাকস্থলীর প্রাচীরে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। পাকস্থলীর পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে পিষে মন্ডে পরিণত করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

(ছ) **অন্ত্র (Intestine)**: পাকস্থলীর পরে পৌষ্টিকনালির অংশ হল অন্ত্র। এটি একটি লম্বা প্যাঁচানো নালি। এর দুটি প্রধান অংশ- ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্র।

- **ক্ষুদ্রান্ত (Small Intestine):** পাকস্থলী থেকে বৃহদান্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা, প্যাঁচানো নলটিকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটি অংশ- ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম। ডিওডেনামে পিত্তথলি পিত্তনালির মাধ্যমে যকৃতের পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় নালি হয়ে অগ্ন্যাশয় রস ডিওডেনামে এসে পৌঁছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে আন্ত্রিক গ্রন্থিও থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে, এদের ভিলাই বলে। ভিলাই পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান শোষণ করে।
- **বৃহদন্ত্র (Large Intestine):** ইলিয়াম থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা নলাকৃতির অংশ হলো বৃহদান্ত্র। বৃহদান্ত্রের তিনটি অংশ- সিকাম, কোলন ও মলাশয়। সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স নামক ক্ষুদ্র নলের মতো প্রবৃদ্ধি সংযুক্ত থাকে। বৃহদন্ত্রে মূলত পানি শোষিত হয়, মল তৈরি হয় এবং মল জমা থাকে।
- **পায়ু (Anus):** পৌষ্টিক নালির শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথই হলো পায়ু।

শ্বসন (Respiration): জীবন ধারণের জন্য চলন, ক্ষয়পুরণ, বৃদ্ধি, প্রজনন প্রভৃতি জৈবিক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তির প্রধান উৎস সূর্যালোক। সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্থিতি শক্তিরূপে (Potential energy) সঞ্চিত করে। এই শক্তি জীব তার জীবন ধারণের জন্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না। শ্বসনের সময় জীবদেহে এই স্থিতি শক্তি রাসায়নিক শক্তি (ATP) হিসেবে তাপরূপে মুক্ত হয় এবং জীবের বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। শর্করাজাতীয় খাদ্যবস্তু ছাড়াও প্রোটিন, ফ্যাট এবং বিভিন্ন জৈব এসিড শ্বসনিক বস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। জীবদেহে এই জটিল যৌগগুলো প্রথমে ভেঙে সরল যৌগে পরিণত হয় এবং পরে জারিত হয়ে রাসায়নিক শক্তিতে (ATP) রূপান্তরিত

শ্বসনের প্রকারভেদ: শ্বসনের সময় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শ্বসনকে দুভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসন। **সবাত শ্বসন (Aerobic respiration)-** যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু (শর্করা, প্রোটিন, লিপিড, বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড) সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তাকে সবাত শ্বসন বলে। সবাত শ্বসনই হলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া। **অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration)-** যে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে।

মানব শ্বসনতন্ত্র: অক্সিজেন জীবন ধারণের অপরিহার্য উপাদান। মানবদেহে বাতাসের সাথে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের সব অংশে পৌঁছায়। দেহকোষে পরিপাক হওয়া খাদ্যের সাথে অক্সিনের বিক্রিয়া ঘটে, ফলে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন এবং খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। এ উপাদানগুলোকে ফুসফুসে নিয়ে যায়। সেখানে অক্সিজেন শোষিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে প্রক্রিয়া দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করা হয়, তাকে শ্বাসকার্য বলে। যে জৈবিক প্রক্রিয়া প্রাণিদেহের খাকসুকে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে জরিত করে মজুত শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিস্কাশন করে, তাকে শাসন বলে। দেহের ভিতর গ্যাসীয় আদান-প্রদান একবার ফুসফুসে এবং পরে দেহের প্রতিটি কোষে পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। শ্বসন ছাড়া আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তিন-চার মিনিটের বেশি দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। শ্বসনতন্ত্রকে কাজের উপর ভিত্তি করে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) পরিবহণকারী অংশ ; খ) শ্বসনকারী অংশ ।

ক) পরিবহণকারী অংশ: শ্বসনতন্ত্রের এই অংশটি কতকগুলো বায়ু পরিবহণকারী নালী নিয়ে গঠিত যা দেহের বহিঃপরিবেশ ও ফুসফুসের গ্যাসীয় বিনিময়স্থলের মধ্যে সংযোগ করে। এটি নিম্নবর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত। ১) নাক বা নাসিকা (Nose) ২) গলবিল (Pharynx) ৩) ল্যারিংক্স (Larynx) ৪) শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া (Trachea) ৫) ব্রঙ্কাই (Bronchi)

১। নাসিকা (Nose): নাক হচ্ছে অস্থি, তরুণাস্থি, পেশি ও যোজক কলানির্মিত একটি ফাপা অঙ্গ। এর ত্বক অসংখ্য তেল গ্রন্থি ও কিছু লোমবিশিষ্ট। ত্বকটি সম্মুখে নাসাছিদ্র অতিক্রম করে নাকের ভেস্টিবল (Vestibule) এ প্রসারিত। এখানকার এপিথেলিয়াম স্তরীভূত ও আঁইশাকার এবং কতকগুলো শক্ত লোমবাহী। নাসিকার অন্তঃস্থ গহবরটি নাস গহবর (Nasal cavity) যা একটি পাতলা ব্যবধায়কে ডান ও বাম অর্ধে বিভক্ত। এর প্রাচীর সিলীয় এপিথেলিয়ামে আবৃত, মিউকাস ঝিল্লি বেষ্টিত এবং রক্ত বাহিকা ও স্নায়ু প্রান্ত সমৃদ্ধ। নাসা গহবরের উপরের অংশের মিউকাস ঝিল্লি সংবেদী অলফ্যাক্টরী কোষযুক্ত।

নাসিকার কাজ: নাসিকা প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশে সাহায্য করে; প্রশ্বাস বায়ুতে যে সব ধুলিকণা বা রোগজীবাণু থাকে, লোম ও শ্লেষ্মাঝিল্লি সেগুলোকে আটকে রাখা এবং ছাকনির মতো কাজ করে; নাসাপথ অতিক্রমকারী বাতাস কিছুটা গরম ও আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে।

২। গলবিল (Pharynx): নাসাগহবর পিছনদিকে দুটি ছিদ্র পথে নাসাগলবিল (Nasopharynx) এ উন্মুক্ত হয়। এরপর বাতাস মুখগলবিল (Oropharynx) অতিক্রম করে ল্যারিংক্সে প্রবেশ করে।

৩। স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংক্স (Larynx): এটি গলবিলের নিম্নাংশের সামনের দিকে অবস্থিত এবং শ্বাসনালীতে উন্মুক্ত ও ছোট ছোট খন্ডবিশিষ্ট তরুণাস্থি নির্মিত অংশ। তরুনাস্থিগুলো অস্থি সংযোজক সন্ধি-বন্ধনী ও ঝিল্লিতে

আবদ্ধ। উপরিভাগের তরুণাস্থির উপরে এপিগ্লটিস (Epiglottis) নামে একটি জিহবাকৃতির ঢাকনা থাকে। ল্যারিংক্সের গহবরে একজোড়া স্থিতিস্থাপক, পর্দার মত স্বরতন্ত্রী (Vocal cord) থাকে।

ল্যারিংক্সের কাজ: খাদ্য গ্রাসের সময় এপিগ্লটিস (উপজিহবা) স্বরযন্ত্রকে ঢেকে রাখা, যাতে খাদ্যদ্রব্য ল্যারিংক্সে স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে না পারে; স্বরতন্ত্রীর কাঁপনের ফলে স্বরের উৎপত্তি হয়। কথা বলতে বা কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে মুখ স্বরতন্ত্রী একসাথে ব্যবহৃত হয়।

৪। ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী (Trachea): এটি লিগামেন্ট সংযুক্ত কতগুলো অর্ধবৃত্তাকার তরুনাস্থি নির্মিত প্রায় ১২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ২ সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট ফাঁপা নল। এর পশ্চাৎ প্রাচীর নরম এবং যোজক কলার ঝিল্লি নির্মিত ও অন্ননালী সংলগ্ন। ট্রাকিয়ার অন্তর্গাত্র মিউকাস ঝিল্লিতে আবৃত। এতে মসৃণ পেশিতন্তু, সিলিয়া ও মিউকাস-নিঃসারী গ্রন্থি থাকে। শ্বাসনালীর বহিঃপ্রাচীর যোজক কলার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত।

ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীর কাজ: শ্বাসনালীর মাধ্যমে বাতাস দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; বিরক্তিকর কোনো বস্তু ট্রাকিয়ায় ঢুকে গেলে ঝিল্লির সূক্ষ্ম রোম কাশির উদ্রেক করে তা উপরের দিকে পাঠিয়ে দেয় এবং ট্রাকিয়া পরিষ্কার রাখা।

৫। ব্রঙ্কাই (Bronchi): ট্রাকিয়া বক্ষ গহবরে প্রবেশ করে ৪র্থ বা ৫ম থোরাসিক কশেরুকার লেভেলে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যে দুটি শাখার সৃষ্টি করে, তাদের ব্রঙ্কাই বলে। প্রথম সৃষ্ট এ ডান ও বাম শাখাকে ব্রঙ্কাই (Bronchi) বলে। এরা যথাক্রমে ফুসফুসের ডান ও বাম খন্ডে প্রবেশ করে অসংখ্য ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এদের বলে ব্রঙ্কিওল (Bronchiole)। ব্রঙ্কাইয়ের প্রাচীর ট্রাকিয়ার মতই। ডান শাখাটি বাম শাখা অপেক্ষা চওড়া কিন্তু খাটো।

খ) শ্বসনকারী অংশ: শ্বসনকারী অংশের অঙ্গসমূহ যা ফুসফুসের ভেতরে থাকে :

ব্রঙ্কিওল (Bronchiol); এলভিওলার নালী (Alveolar duct); এলভিওলাই (Alveoli)

১) ব্রঙ্কিওল মানুষের ফুসফুস বক্ষ গহবরে ডায়াফ্রামের উপরে হৃদপিন্ডের দুইপাশে অবস্থিত হালকা লাল রঙের কোণাকার অঙ্গ। ফুসফুসের অভ্যন্তরে অবস্থিত শাখা নালীগুলোকে ব্রঙ্কিওল বলে। ব্রঙ্কিওলের প্রান্তে ফুসফুসের শ্বসন অঞ্চল অবস্থিত। এটি অসংখ্য এলভিওলার থলি নিয়ে গঠিত। মানবদেহে ডান ও বাম এ দুটি ফুসফুস (Lungs) রয়েছে। এ দুটি আবার খাঁজের সাহায্যে খন্ডে (Lobe) বিভক্ত। ডান ফুসফুস তিন খন্ডবিশিষ্ট এবং বাম ফুসফুস দুই খন্ডবিশিষ্ট।

২) এলভিওলার নালী ব্রংকিওলের অতিসূক্ষ্ম ও তরুণাস্থিবিহীন প্রান্তগুলোকে এলভিওলার নালী (Alveolar duct) বলে। প্রতিটি নালী একেকটি এলভিওলার থলিতে (Alveolar sac) উন্মুক্ত হয়।

৩) এলভিওলাই প্রতিটি এলভিওলার থলি কতকগুলো এলভিওলাই (Alveoli) নিয়ে গঠিত। ফুসফুসের বহির্তল দ্বিস্তরী ভিসেরাল প্লুরা (Visceral pleura) ঝিল্লিতে আবৃত।

এলভিওলাসের গঠন: ফুসফুসে স্কোয়ামাস এপিথেলীয় কোষে গঠিত ও কৈশিক-জালিকাসমৃদ্ধ প্রকোষ্টের মত গ্যাসীয় বিনিময় তলকে একবচনে এলভিওলাস এবং এক কথায় এলভিওলাই বলে। মানুষের ফুসফুসে প্রায় ৭০-৮০ বর্গমিটার আয়তনের তল জুড়ে ৭০০ মিলিয়ন (৭০ কোটি) এরও বেশি সংখ্যক এলভিওলাই রয়েছে। প্রত্যেক এলভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, মাত্র ০.১ um (০.০০০১ মিমি) পুরু। এর বহির্দেশ ঘন, কৈশিক জালিকা সমৃদ্ধ কৈশিক নালিকা গুলো পালমোনারী ধমনী থেকে সৃষ্টি হয়। পরে এগুলো পুনর্মিলিত হয়ে পালমোনারী শিরা গঠন করে)। প্রাচীরটি আর্দ্র স্কোয়ামাস (আঁইশাকার) এপিথেলিয়াম নির্মিত। এতে কোলাজেন

ও ইলাস্টিক তন্তুও রয়েছে। ফলে শ্বসনের সময় সংকোচন-প্রসারণ সহজতর হয়। এভিওলাস-প্রাচীরের কিছু বিশেষ কোষ প্রাচীরের অন্তঃতলে ডিটারজেন্ট (Detergent) -এর মত রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। এ পদার্থকে সারফেক্ট্যান্ট (Surfactant) বলে।

সারফেক্ট্যান্টের কাজ

- এ পদার্থ এলভিওলাস-প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান (Surface tension) কমিয়ে দেয়, ফলে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে।
- এ পদার্থ বাতাস ও অ্যালভিওলাস-প্রাচীর সংলগ্ন তরল পদার্থ O_2 ও CO_2 এর দ্রুত বিনিময়ে সাহায্য করে।
- এ পদার্থ অ্যালভিওলাসে আগত জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করে।

শ্বসন পদ্ধতি (Respiration): শ্বসন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন পরিবাহিত হয়ে গ্রহণ করা খাদ্যকে জারিত (Oxidation) করে বিপাকের (Metabolism) জন্য দেহ কোষে নিয়ে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য পদার্থকে কোষ থেকে পরিবেশে নিয়ে আসে। শ্বসন দুই পর্যায়ে হয়, যথা-

১) বহিঃশ্বসন (External respiration)

২) অন্তঃশ্বসন (Internal respiration)।

বহিঃশ্বসন (External respiration): এতে অক্সিজেন শ্বসিত হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বের করে দেয়। যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে অর্থাৎ অক্সিজেন ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে বহিঃশ্বসন বলে। ফুসফুসের এলভিওলার বাতাস (Alveolar air) ও এলভিওলির প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিক জালিকার রক্তের মধ্যে এই বিনিময় ঘটে। প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাসে O_2 এর চাপ ফুসফুসের রক্তের O_2 এর চাপ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় অক্সিজেন এলভিওলাস থেকে ফুসফুসের কৈশিকনালীর রক্তে প্রবেশ করে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে। কিছু পরিমাণ O_2 রক্তরসেও দ্রবীভূত হয়। একই সাথে ফুসফুসের কৈশিকনালীর রক্তে (CO_2) এর চাপ এলভিওলাসে (CO_2) এর চাপের চেয়ে বেশি হওয়ার ফুসফুসের কৈশিকজালক থেকে (CO_2) এলভিওলাসে প্রবেশ করে।

বহিঃশ্বসন দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা -

ক) প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration or inhalation) এবং

খ) নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ (Expiration or Exhalation)।

শ্বাসগ্রহণ (Inspiration): ফুসফুসের বাতাস (Air) গ্রহণ করা। এতে সময় লাগে দুই সেকেন্ড

শ্বাসত্যাগ (Expiration): ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দেয়া এতে সময় লাগে তিন সেকেন্ড

শ্বাসক্রিয়ার উদ্দেশ্য: অক্সিজেন সরবরাহ করা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করা; অ্যামোনিয়া, কিটোন বডি, অপ্রয়োজনীয় তেল, পানি, অ্যালকোহল প্রভৃতি বের করে দেওয়া; রক্তের পানি ও অন্যন্য অংশের সমতা রক্ষা করা; শরীরের তাপের সমতা রক্ষা করা। প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়া ও শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। শ্বাসকার্যের কোনো বিরাম নেই। ঘুমের সময় কিছু কম থাকে, পরিশ্রম বা ব্যায়ামের সময় তা বেড়ে যায়। প্রতি মিনিটে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষ ১২-১৮ বার এবং নবজাত শিশু ৪০ বার শ্বাস ক্রিয়া করে থাকে।

প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ: স্নায়ু উদ্দীপনার প্রভাবে ডায়াফ্রামের পেশি (বৃত্তাকার অরীয় পেশিতন্তু) এবং প্রতিজোড়া পর্শুকার মাঝখানে অবস্থিত বহিঃ ও অন্ত ও ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচন প্রসারণ সমন্বয়ের মাধ্যমে এই পর্যায়টি নিম্নেরূপভাবে সম্পন্ন হয়-

ক) বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি সংকুচিত হয় এবং অন্তঃস্থ ইন্টারকোস্টাল শিথিল হয়। ফলে পাঁজর উপরের দিকে উঠে যায়।

খ) তখন ডায়াফ্রাম-পেশিও সংকুচিত হয়, ফলে ডায়াফ্রাম সমতল হয়ে যায়।

গ) উপরোক্ত দুই কর্মকাণ্ডের ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে যায় (বুক প্রসারিত হয়)। এতে বক্ষগহ্বর ও ফুসফুস অভ্যন্তরীণ চাপ বায়ুমন্ডলীর চাপের চেয়ে কমে যায়।

ঘ) এ কারণে বাতাস নাসাপথের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং এলভিওলাই ফুলে উঠে। ফুসফুস ও বায়ুমন্ডলীয় বাতাসের চাপ সমান না হওয়া পর্যন্ত বাতাসের চাপ অব্যাহত থাকে।

নিঃশাস বা শ্বাসত্যাগ: এটি প্রশ্বাসের পরই সংগঠিত একটি নিষ্ক্রিয়া প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য তা ঘটে। নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শুকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়, উদরীয় পেশীগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মত বেকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়, ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং প্লিরার (Pleura) অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকাপথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

অন্তঃশ্বসন (Internal respiration): শ্বসনের এই ধাপ কলায় সংঘটিত হয়। অন্তঃশ্বসনে দেহকোষ দ্বারা বিপাকের জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেওয়া হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত থেকে অক্সিজেন কলা-কোষে প্রবেশ ও কোষমধ্যস্থ খাদ্যের তরল পদার্থ রক্তের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে এবং কোষ থেকে রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিনিময় (Gaseous exchange) হয় তাকে অন্তঃশ্বসন বলে।

জব ১| প্রাণীকোষ ও এর অঙ্গানু চিহ্নিত করার দক্ষতা।

পারদর্শিতার মানদন্ডঃ

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- জীব কোষ ও কোষের বিভিন্ন কোষাঙ্গানু চিহ্নিত করা।
- কোষাঙ্গানু চিহ্নিত করার জন্য অনুবিক্ষন যন্ত্র নির্বাচন করা।
- কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়েজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস ও ইকুইপমেন্ট)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২.	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩.	অনুবিক্ষণ যন্ত্র	নমুনা মতাবেক	১টি
৪.	মডেল	নমুনা মতাবেক	১টি

মালামাল (Materials)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
২	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	

কোষের গঠন ও অঙ্গানু চিহ্নিত করার কৌশলসমূহ

১. ছবিতে চিহ্নিত অঙ্গানু গুলোর সনাক্ত করা

২. সনাক্তকৃত অঙ্গানু গুলোর নাম পাশে লিখা

৩. অঙ্গানুগুলোর কাজ উল্লেখ করা

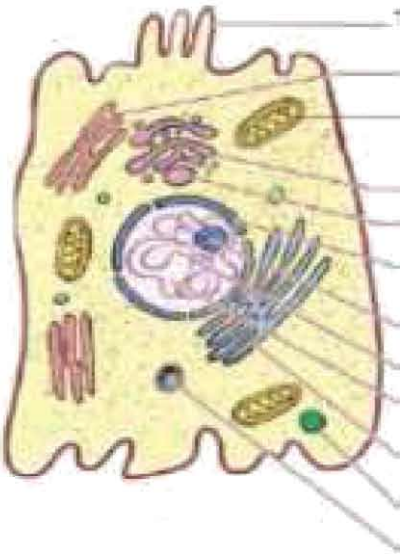

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী সনাক্ত করার ড্রয়িং বুঝে নাও;
- অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার উপযোগি কর;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;
- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ সনাক্ত কর;
- চিহ্নিত করার পর মার্ক করা নমুনার নাম ও এর কাজ লিখ;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও;

কাজের সতর্কতা নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হওয়া।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জীববিজ্ঞান বলতে কি বুঝ?
২. কোষ বলতে কি বুঝায়?
৩. কোষ অঙ্গানুর নাম উল্লেখ কর।
৪. নিউক্লিয়াস কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টিস্যু কত প্রকার। উল্লেখ কর।
২. অস্থিসন্ধি বলতে কি বুঝায়? এর কাজ কী?
৩. মানুষের চলনে অস্থি ও পেশীর ভূমিকা উল্লেখ কর।
৪. রক্ত কী? এর কাজ কী?
৫. পরিপাকতন্ত্রের কাজ কী?
৬. শ্বসন কত প্রকার ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কোষের কাজ বর্ণনা কর।
২. টিস্যু কী? এর কাজ উল্লেখ কর।
৩. অস্থিতন্ত্রের কাজ উল্লেখ কর।
৪. রক্ত জমাট বাধার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৫. হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৬. মানবদেহের শ্বসনপদ্ধতি ব্যখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়
সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা
Basic Health Screening

আমরা প্রায়শই দেখি ডাক্তার-নার্সগণ হাসপাতাল বা ক্লিনিকে রোগীদের শরীরে বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন: থার্মোমিটার, রক্তচাপ মাপার মেশিন, স্টেথোস্কোপ কিংবা খালি হাতে বা খালি চোখে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। এটি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বা মেডিক্যাল সাইন্সে মানবদেহের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নামে অবহিত। অনেক সময় নিজের বাড়িতেও আমরা অসুস্থ কারো সাধারণ এই ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকি। অর্থাৎ, সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো জানা থাকলে এবং উল্লেখিত যন্ত্রাদি ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ কিছু দক্ষতা থাকলে যেকোনো মানুষই প্রয়োজনের সময় চট করে পরিমাপ করে ফেলতে পারে মানবদেহে রক্তের চাপ, নাড়ির গতি কিংবা তাপমাত্রা প্রভৃতি। আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক এবং মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা লাভ করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি কিভাবে খুব সহজ ও সঠিক উপায়ে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজটি সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করতে পারবো
- নাড়ির গতি পরিমাপ করতে পারবো
- শ্বাসপ্রশ্বাস পরিমাপ করতে পারবো
- তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারবো
- রক্তচাপ পরিমাপ করতে পারবো
- মানবদেহের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে লিপিবদ্ধ ও প্রয়োজনে ডাক্তারকে অবহিত করতে পারবো।

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন, নাড়ির গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের হার, তাপমাত্রা ও রক্তচাপ পরিমাপ করতে পারবো। জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই আমরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানবো।

৪.১ সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা হেল্‌থ স্ক্রিনিং (Health Screening)

স্বাস্থ্য সেবাপ্রার্থী যেকোনো রোগী বা ব্যক্তিকে প্রথমেই কিছু সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যার মাধ্যমে একজন সেবাপ্রদানকারী (Service Provider) রোগীটি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা লাভ করে। এগুলোকে বলা হয় সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা বেসিক হেল্‌থ স্ক্রিনিং যা রোগীর কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা বা রোগের প্রাথমিক অবস্থা সনাক্তকণের একটি কার্যকর উপায়, এমনকি যদি কোনো রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ নাও থাকে।

সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বলতে আমরা সাধারণত মানবদেহের চারটি মৌলিক লক্ষণ (vital signs) যেমন: শরীরের তাপমাত্রা, রক্তচাপ, নাড়ির গতি বা হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতি (Respiration Rate) পরিমাপ করে থাকি। এছাড়াও আরো কিছু সাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন শরীরের ওজন ও উচ্চতা, রক্তের গ্লুকোজ বা শর্করার মাত্রা পরিমাপ বা প্রস্রাবের প্রকৃতি বা পরিমাণ জানতে পারি। এই পরীক্ষাগুলো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সাধারণত ডাক্তার বা নার্সগণ পরিমাপ করে থাকেন। তবে নির্দেশনা অনুযায়ী কেয়ারগিভারও পরিমাপ করতে পারেন। আবার বৃদ্ধাশ্রম কিংবা হোম কেয়ার সেটিংসে যেহেতু কেয়ারগিভারই রোগীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী, সেহেতু এই বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে একজন কেয়ারগিভারকেই সঠিকভাবে পরিমাপ করে লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং প্রয়োজনে চিকিৎসককে অবহিত করতে হয়।

তবে পূর্নাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বলতে এর চেয়ে আরো অনেক বেশিকিছু বুঝানো হয়, যেটি একজন ডাক্তারের নির্দেশনায় সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রুটিন কিছু টেস্টও অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসকগণ রোগীর সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ নির্নয় করে থাকেন। তবে এই অধ্যায়ে আমরা কেবল সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন করবো যাতে করে কর্মক্ষেত্রে আমরা এই দক্ষতাগুলো পেশাদারিত্বের সাথে প্রয়োগ করতে পারি।

৪.১.১ শারীরিক পরীক্ষা বা ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট (Physical Assessment)

শারীরিক পরীক্ষা বা ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট রোগীর রোগ নির্নয়ের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি অত্যাবশ্যকীয় কৌশল। ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ কোনো রোগীর শারীরিক বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য চারটি মৌলিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে:

ক. ইনস্পেকশন (Inspection): ইনস্পেকশন এর অর্থ হলো চোখ দিয়ে দেখা। কোনো রোগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় চোখ দিয়ে দেখে (ভিশন) শরীরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা করা যায়। খালি চোখে আমরা রোগীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা, রঙ বা কালার, আকার-আকৃতি, গঠন বা টেক্সচার (Texture), প্রতিসাম্য (Symettrey), নড়াচড়া প্রভৃতি বিষয় নির্নয় করতে পারি। এটি স্বাস্থ্য পরীক্ষার একেবারে প্রথম ধাপ। গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল সাইন শ্বাসপ্রশ্বাসের হারও আমরা ইন্সপেকশনের মাধ্যমে বুক ও পেটের উঠানামা দেখে পরিমাপ করে থাকি।

চিত্র ৪.১: ইনস্পেকশনের মাধ্যমে শ্বাসপ্রশ্বাস দেখা হচ্ছে।

খ. পালপেশন (Palpation): পালপেশন মানে হলো রোগীর শরীর স্পর্শ করে পরীক্ষা করা। এই স্পর্শ বলা পালপেশন আবার দুই রকম; লাইট পালপেশন বা হালকা স্পর্শ এবং ডীপ পালপেশন বা গভীর স্পর্শ। শরীরের কোনো অস্বাভাবিকতা বুঝার জন্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা বডি পার্টস পালপেট করতে হয়। লাইট পালপেশনের মাধ্যমে আমরা শরীরের উপরিভাগের গঠন, কোমলতা বা টেন্ডারনেস, টেমপারেচার বা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, স্থিতিস্থাপকতা, স্পন্দন, টিউমার প্রভৃতি পরীক্ষা করতে পারি। এটার জন্য হাতের আংগুলের তলা (Finger Pad) দিয়ে খুব আলতোভাবে আধা ইঞ্চি পর্যন্ত চামড়ার উপর চাপ দেওয়া হয়। আবার ডীপ পালপেশনের ক্ষেত্রে চামড়ার উপর দিয়ে দেড় বা দুই ইঞ্চি পর্যন্ত গভীর চাপ দেওয়া হয়। অনেক সময় অধীক চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হলে দুই হাত একসাথে রেখে গভীর চাপ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে আমরা শরীরের ভিতরের অঙ্গগুলো যেমন কিডনী, পাকস্থলী প্রভৃতি অঙ্গের আকার-আকৃতি, ব্যথা ও এর প্রকৃতি, প্রতিসাম্যতা, অবস্থান ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় করতে পারি।

চিত্র ৪.২: লাইট ও ডীপ পালপেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গ. পারকাশন (Percussion): পারকাশন বলতে আঙুল বা হাত দিয়ে দ্রুত এবং তীক্ষ্ণভাবে রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে টোকা দিয়ে পরীক্ষা করাকে বুঝায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থান, আকৃতি-প্রকৃতি, সীমানা, অবস্থান প্রভৃতি বিষয় সনাক্ত করা যায়। শরীরের কোনো অভ্যন্তরীণ অঙ্গে যেমন কিডনি বা ফুসফুসে পানি বা গ্যাসীয় পদার্থ আছে কিনা তা সনাক্ত করতেও পারকাশন ব্যবহার করা হয়। পারকেশন দুই প্রকার: ডাইরেক্ট বা সরাসরি পারকাশন এবং ইনডাইরেক্ট বা পরোক্ষ পারকাশন। ডাইরেক্ট পারকাশনে হাতের একটি বা দুটি আঙ্গুলের সাহায্যে রোগীর শরীরে সরাসরি টোকা দেওয়া হয়। আর ইনডাইরেক্ট পারকাশনে একটি হাত রোগীর শরীরে রেখে সেই হাতের উপরে অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে একইভাবে টোকা দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই টোকার প্রকৃতি ও শব্দ লক্ষ করা হয়। রোগীর ব্যথা আছে কিনা সেটা রোগীকে জিজ্ঞেস করে এবং তার মুখাবয়ব দেখেও

২০২৫

বুঝা যায়। অনেক সময় বিশেষ একধরনের হাতুড়ি দিয়ে এটি করা হয়ে থাকে। এটিকে বলা হয় পারকাশন হ্যামার।

ক. ডাইরেক্ট পারকাশন; খ. ইনডাইরেক্ট পারকাশন; ও গ. পারকাশন হ্যামার
চিত্র ৪.৩: বিভিন্ন ধরনের পারকাশন

ঘ. অসকালটেশন (Auscultation): স্টেথোস্কোপ নামক একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ইন্টার্নাল অরগান বা আভ্যন্তরীণ অঙ্গ যেমন: ফুসফুস, হার্ট বা হৃৎপিন্ড কিংবা অন্ত্রের শব্দ (বাওয়েল সাউন্ড) শোনার কৌশলকেই অসকালটেশন বলা হয়। এই শব্দের মাধ্যমে অরগানটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যেমন, সেখানে পানি বা শ্যাস জমে গেছে কিনা, অস্বাভাবিক কোনো ফিজিওলোজি আছে কিনা প্রভৃতি। এ জন্য একটু নিরিবিলি পরিবেশ হলে শব্দ ভালোভাবে শোনা যায়।

চিত্র ৪.৪: স্টেথোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে হার্টসাউন্ড শোনা হচ্ছে

হেল্থ স্ক্রিনিং- এর গুরুত্ব (Importance of Health Screening)

সুস্থ অসুস্থ সকলের জন্যই সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর (সাধারণত ৬-১২ মাস) মানুষের শরীরে সুপ্ত কোনো রোগ আছে কি না তার পরীক্ষা করার নামই হেল্থ স্ক্রিনিং। অনেক দেশেই হেল্থ ইন্সুরেন্স-এর প্রচলন অভটা না থাকায় কোনো সমস্যা দেখা না দিলে কেউ নিজের টাকা খরচ করে ডাক্তারের কাছে যেতে চান না। কিন্তু এই অসতর্কতা জীবনে অনেক সময় বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক বিশেষ করে যাদের বয়স ৪০ বছর বা তার বেশি তাদের জন্য হেল্থ স্ক্রিনিং অত্যন্ত জরুরি। হেল্থ স্ক্রিনিং এর মূল বিষয় হচ্ছে যে সমস্ত রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কোনো লক্ষণ থাকে না সেগুলোকে শনাক্ত করা। যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্ত চাপ, কিডনীর সমস্যা, হার্টের সমস্যা, রক্তের চর্বি বা কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, রক্ত শূন্যতা, মূত্রনালীতে বা শরীরের অন্য যেকোনো জায়গায় ইনফেকশন, পেটের

ভিতরে পিত্তথলি, কিডনি ও মূত্রথলিতে পাথর, জরায়ুর সমস্যা ইত্যাদি রোগসমূহ হেল্থ স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে অনেক প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করা যায়। হেল্থ স্ক্রিনিংএ সাধারণত সিবিসি- (কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট), ফাস্টিং ব্লাড সুগার, সেরাম ক্রিয়েটিনিন, ইউরিন আরএমই, ইসিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, লিপিড প্রোফাইল ইত্যাদি করতে দেওয়া হয়। এসব টেস্টের মাধ্যমে কোনো রোগের প্রাথমিক অবস্থা অথবা কারো কোনো পূর্বের অসুখ থাকলেও তার অবস্থা জানা যায়। শরীরের লুকিয়ে থাকা অসুখ জটিল আকার ধারণ করার আগেই হেলথ স্ক্রিনিং করা খুবই প্রয়োজন। তবে একজন কেয়ারগিভার হিসেবে আমরা মানবদেহের তাপমাত্রা, নাড়ির গতি, ব্লাড প্রেসার, প্রস্বাসের হার-শ্বাস প্রভৃতির মাধ্যমেই হেল্থ স্ক্রিনিং এর প্রাথমিক কাজ সমাপন্ন করবো। এগুলোকে বলা হয় ভাইটাল সাইন্স বা মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণসমূহ। এর পাশাপাশি মানবদেহের উচ্চতা, ওজন, বডি ম্যাস ইনডেক্স, তরল পদার্থের ইনটেক ও আউটপুট দেখা, রক্তের গ্লুকোজ ও অক্সিজেনের পরিমাণ ইত্যাদিও হেল্থ স্ক্রিনিং এর অন্তর্ভুক্ত। যেগুলো একজন কেয়ারগিভার সহজেই তার কর্মক্ষেত্রে অনুশীলন করতে পারে। এ ধরনের পরীক্ষা সাধারণত কোনো রোগ সরাসরি ডায়াগণসিস করে না, এটা অনুমেয় স্বাস্থ্য ঝুঁকির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

৪.২ ভাইটাল সাইন (Vital Sign)

৪.২.১ ভাইটাল সাইন কি?

ভাইটাল সাইন বা অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ হল কোনো ব্যক্তি বা রোগীকে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় কতগুলো শরিরবৃত্তীয় সাইন বা লক্ষণ। এই পরিমাপগুলো একজন ব্যক্তির সাধারণ শারীরিক স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। মূলত চার ধরনের ভাইটাল সাইন আছে যথা: তাপমাত্রা, স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার এবং রক্তচাপ। কোনো ব্যক্তির দেহে ভাইটাল সাইনগুলো স্বাভাবিক পরিমাপের চেয়ে কম বা বেশি হয়ে গেলে সেটি নির্দিষ্ট কোনো সমস্যার কারণে হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। তখন চিকিৎসক আরো উন্নত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন। প্রধান ৪ প্রকার ভাইটাল সাইন নিম্নরুপ:

ভাইটাল সাইনের নাম	সহজে মনে রাখার উপায়
১। তাপমাত্রা (Temperature)	**T** (Temperature)
২। নাড়ির স্পন্দন (pulse / heart rate)	**P** (Pulse)
৩। শ্বাস-প্রশ্বাস (Respiratory rate)	**R** (Respiration)
৪। রক্তচাপ (Blood Pressure)	**BP** (Blood Pressure)

টেবিল ৪.১: বিভিন্ন ধরনের ভাইটাল সাইন্স

এর পাশাপাশি আমরা মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন, বিএমআই, দেহে তরল পদার্থের ইনটেক ও আউটপুট, রক্তের শর্করা ও অক্সিজেনের পরিমাণও নির্নয় করে থাকি।

৪.২.২ ভাইটাল সাইন পরিমাপের গুরুত্ব (Imporance of Measuring Vital Signs)

রোগীর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো বা ভাইটাল সাইন পর্যবেক্ষণ করা চিকিৎসা পেশাদারদের মধ্যে একটি সাধারণ অনুশীলন। স্বাস্থ্যসেবায় এর বিভিন্ন গুরুত্ব রয়েছে। যেমন:

১। রোগীর স্বাস্থ্য এবং ক্লিনিকাল ফলাফলগুলোতে মূল ভূমিকা পালন করে।
২। নিয়মিতভাবে লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করে স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত পেশাদারগণ রোগীর অবস্থার পরিবর্তন সনাক্ত করতে পারেন।
৩। এটি প্রাথমিকভাবে রোগীর অবনতি সনাক্ত করতে এবং রোগীর ক্ষতি করতে পারে এমন সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
৪। গুরুতর লক্ষণগুলোর পরিবর্তন দ্রুত সনাক্তকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৫। হেল্থ স্ক্রিনিং-এ কোনো ব্যত্যয় ঘটলে উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করতে বিলম্ব ঘটে এবং রোগীর আরোগ্যকে প্রলম্বিত করে ও মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুকির সম্মুখিন হয়। সুতরাং, ভাইটাল সাইন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় এক অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে।

৪.৩ তাপমাত্রা পরিমাপ

শারীরিক তাপমাত্রা চারটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি যা নিরাপদ এবং কার্যকর সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিমাপ করা হয়। শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক যেকোনো তীব্র অসুস্থতার প্রাথমিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে চিকিৎসকগণ তাপমাত্রা পরিমাপের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং দক্ষতার ভিন্নতার কারণে তাপমাত্রার তারতম্য লক্ষ করা যায়। তাই তাপমাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত কৌশলটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ভুল ফলাফল ব্যক্তির রোগ নির্নয় ও চিকিৎসার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

তাপমাত্রা: তাপমাত্রা হচ্ছে শরীরের তাপীয় অবস্থা যা মানবদেহের তাপপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, মানবদেহের শরীর কতটুকু ঠান্ডা বা কতটুকু গরম তাপমাত্রা দিয়ে তা বুঝা যায়।

তাপমাত্রা পরিমাপের গুরুত্ব: শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ধরনের রোগ শরীরের তাপমাত্রা পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত হয়। এটি একটি প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণ যা নির্ণয় করতে পারে যে একজন মানুষ অসুস্থ হতে চলেছে। শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে রোগের চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে। দেহের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেহ তার স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিবর্তন করে। জ্বর শরীরের তাপমাত্রায় রোগ বৃদ্ধির সর্বাধিক সাধারণ রূপ। এটি শরীরে সংক্রমণের প্রথম প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটি। শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে তাড়াতাড়ি রোগ সনাক্ত করতে সহায়তা করে। হাইপোথ্যালামাস নামে পরিচিত মস্তিষ্কের কিছু অংশ দেহের ক্রিয়াকলাপের জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নিয়মিত দেহের তাপমাত্রাকে সামঞ্জস্য করে। যখন ইমিউন সিস্টেমটি শরীরে কোনো ভাইরাস অথবা সংক্রমনের উপস্থিতি সনাক্ত করে, তখন হাইপোথ্যালামাসকে তাপমাত্রা বাড়িয়ে চালু করার ইঙ্গিত দেয় যাকে আমরা জ্বর বলে অবহিত করি। এটি দেহের অভ্যন্তরে একটি উষ্ণ এবং বৈরী পরিবেশ যা জীবানুকে দুর্বল করে এবং প্রতিরোধক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। তাই দেহের তাপমাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা খুবই জরুরি, বিশেষ করে অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে।

তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র: তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম হল থার্মোমিটার। অর্থাৎ যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় এবং বিভিন্ন বস্তুর তাপমাত্রার পার্থক্য নির্ণয় করা যায় তাকে **থার্মোমিটার** বলে। মানবদেহের তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্যেও থার্মমিটার নামক যন্ত্রটি ব্যবহার করা

হয়। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার থার্মোমিটার রয়েছে, তবে মানবদেহের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য অধিক ব্যবহৃত এমন তিনটি থার্মোমিটার নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো:

১। ক্লিনিক্যাল বা গ্লাস থার্মোমিটার: এর প্রাথমিক তিনটি অংশ। এর নিচের দিকে থাকে সরু মারকারি বাল্ব, মূল বডি কাচের গ্লাস দিয়ে আবদ্ধ এবং এর মাঝখানে থাকে লিকুইড মার্কারী বা পারদপূর্ণ কলাম যা দ্বারা তাপমাত্রার পরিমাপ নির্ণয় করে। একে অনেক সময় পারদ বা মার্কারী থার্মোমিটারও বলা হয়ে থাকে। এটিতে ৯৪- ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৫-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত স্কেল থাকে।

২। ডিজিটাল থার্মোমিটার: এটিরও নিচের দিকে থাকে সরু মারকারি বাল্ব, বডির মাঝখানে একটি ডিসপ্লে থাকে যেখানে তাপমাত্রা দেখা যায়। ডিসপ্লের উপরে একটু সুইচ থাকে যার মাধ্যমে থার্মোমিটারটি চালু এবং বন্ধ করা যায়। এর কোন স্কেল থাকে না তাপমাত্রা সরাসরি ডিসপ্লেতে দেখা যায়।

৩। ইনফ্রারেড থার্মোমিটার: এটি সাধারণ সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপার জন্য পারদপূর্ণ অংশটি রোগীর শরীরে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না। যেমন, সাম্প্রতিক করোনা মহামারির সময় আমাদের দেশেও এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেছে। এর উপরের ও সামনের দিকে একটা স্ক্যানার থাকে যা তাপমাত্রা নির্ণয় করে এবং পিছন দিকে একটা ডিসপ্লে থাকে যেখানে তাপমাত্রা দেখা যায়। ডিসপ্লের নিচের দিকে একটি সুইচ থাকে যার মাধ্যমে থার্মোমিটারটি চালু এবং বন্ধ করা যায়।

তবে ডিজিটাল ও ইনফ্রারেড থার্মোমিটার অনেক সময় ব্যয়সাধ্য বিধায় আমাদের দেশে হাসপাতাল, ক্লিনিক কিংবা বাসাবাড়িতে শরীরের তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে এনালগ থার্মোমিটারের ব্যবহার কিছুটা বেশি দেখা যায়। এটিকে আবার ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারও বলা হয়ে থাকে।

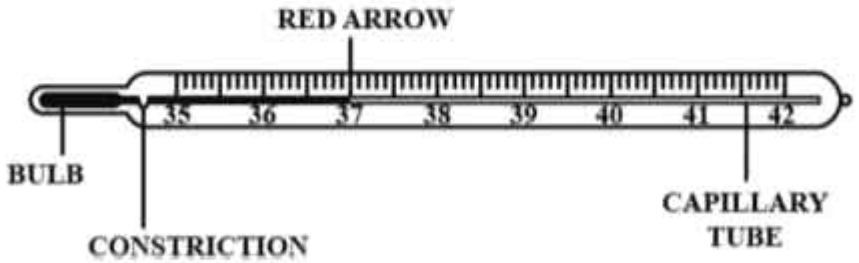

চিত্র ৪.৫: একটি জ্বর মাপার থার্মোমিটারের স্বাভাবিক গঠন

আবার শরীরের কোন অংশ থেকে তাপমাত্রা নেয়া হচ্ছে সেটির উপর নির্ভর করে থার্মোমিটারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:-

১। ওরাল থার্মোমিটার: সজ্ঞান রোগীর জন্য সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে ওরাল থার্মোমিটার। এ ধরনের থার্মোমিটার দিয়ে সাধারণত জিহ্বার নিচে একপাশে রেখে তাপমাত্রা মাপা হয়। এক্ষেত্রে থার্মোমিটারটি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে। মুখে তাপমাত্রা পরিমাপের ৫-১০ মিনিট পূর্বে কোন ঠান্ডা বা গরম খাবার গ্রহণ, ব্যায়াম বা ধুমপান করা যাবে না। এতে সঠিক তাপমাত্রা নাও আসতে পারে। ৫ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের মুখে তাপমাত্রা নেয়া যাবে না। আবার মুখে অস্ত্রোপচার হয়েছে, অজ্ঞান কিংবা মানসিক সমস্যা আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে মুখে তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না।

২। এক্সিলারি থার্মোমিটার: বাহুর নিচে (Armpit বা axilla) ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার রেখে তাপমাত্রা মাপা যায়। এটি শিশুদের জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান। এক্সিলারি তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম থাকে।

৩। রেকটাল থার্মোমিটার: পায়ুপথের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় রেকটাল থার্মোমিটার। সাধারণত যেসকল রোগীর মুখে তাপমাত্রা মাপতে পারে না (যেমন, অজ্ঞান রোগী, মুখে অপারেশন বা সার্জারী হয়েছে এমন রোগী) তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। পায়ুপথে তাপমাত্রা পরিমাপের সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ১ ইঞ্চি এবং বড়দের ক্ষেত্রে ১.৫ ইঞ্চি থার্মোমিটার পায়ু পথে প্রবেশ করাতে হবে। এক্ষেত্রে থার্মোমিটার প্রবেশ করানোর সময় কখনোই জোরে ধাক্কা দেওয়া যাবে না। পায়ুপথে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি থাকে।

৪। টিমপেনিক থার্মোমিটার: টিমপেনিক থার্মোমিটারে একটি সেন্সর থাকে যার মাধ্যমে ইনফ্রারেড থার্মোমিটারের মত কানের টিমপেনিক পর্দার তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি পাওয়া যায়।

সাধারণত মুখের তাপমাত্রা মানবদেহের আদর্শ তাপমাত্রা নির্দেশ করে। এক্সিলারি তাপমাত্রার সাথে সাধারণত ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট যোগ করে এবং রেকটাল বা পায়ুপথে প্রাপ্ত তাপমাত্রা থেকে ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট বিয়োগ করলে তা মুখের তাপমাত্রার সমান হয়।

চিত্র ৪.৬: বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার

তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল ও সংকেত

মানবদেহের তাপমাত্রাকে সাধারণত দুটি স্কেলে পরিমাপ করা হয়। যেমন:

স্কেলের নাম	সংকেত
১। সেলসিয়াস স্কেল	°C
২। ফারেনহাইট স্কেল	°F

এক স্কেল থেকে অন্য স্কেলে তাপমাত্রা রূপান্তরের সূত্র: সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট: C/5=F-32/9

উদাহরণ: ৩৭.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াসকে ফারেনহাইটে রূপান্তর।

আমরা জানি,C/5=F-32/9;

Or; 37.3/5= F-32/9; Or, 5F-160=335.7; Or, 5F=335.7+160; Or, F= 495.7/5; Or, F=99.14; So, F= 99.1^0

অর্থাৎ, **সেলসিয়াস স্কেলে প্রাপ্ত ৩৭.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলে তা ফারেনহাইট স্কেলে ৯৯.১ ডিগ্রী ফারেনহাইট।**

মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা: মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হলো ৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর নরমাল রেঞ্জ হলো ৯৭.০ থেকে ৯৯.০ ডিগ্রী ফারনহাইট কিংবা ৩৬.১ থেকে ৩৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শরীরের তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় তখন তাকে জ্বর বা পাইরেক্সিয়া বা হাইপারথার্মিয়া বলা হয়। অর্থাৎ জ্বর হলে দেহের তাপমাত্রা ৯৯.০ ^{0}F এর অধিক নির্দেশ করে। আবার যদি শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায় তখন তাকে হাইপোথার্মিয়া বলা হয়।

তাপমাত্রা পরিমাপের উপায়: ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা পরিমাপের সাধারণত চারটি উপায় রয়েছে। যথা:

১. এক্সিলারি মেথড (বগলের নিচে)
২. ওরাল মেথড (মুখে)
৩. টিম্প্যানিক মেথড (কানে) ও
৪. রেকটাল মেথড (মলদ্বারে বা পায়ুপথে)।

ক্লিনিক্যাল ও ডিজিটাল থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপার পদ্ধতি:

- প্রথমেই সাবান ও পানি দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং গ্লাভস পরিধান করতে হবে।
- তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি একটি ট্রেতে সাজিয়ে নিতে হবে।
- ডিজিটাল অথবা গ্লাস থার্মোমিটারটি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
- রোগী যদি বসতে পারে তাহলে সোজা করে বসিয়ে নিতে হবে অথবা সুবিধাজনকভাবে অন্য কোনো অবস্থানে রাখতে হবে।
- রোগীকে তার মুখ খুলতে এবং জিহ্বা উঁচু করার জন্য বলতে হবে। রোগী যদি যোগাযোগ বা কোনো সহযোগীতা করতে না পারে তাহলে বিকল্প পন্থায় তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে যেমন: এক্সিলারি বা রেকটাল তাপমাত্রা।
- গ্লাস বা মার্কারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সাবধানে ঝাঁকিয়ে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নামিয়ে নিয়ে রোগীর জিহ্বার নীচে অর্থাৎ জিভের গোড়ায় ডান বা বাম দিকে আস্তে করে রাখতে হবে। রোগীকে ঠোঁট বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে রোগী যেন থার্মোমিটারটি দাঁত দিয়ে কামড় না দেয়। যদি ডিজিটাল থার্মোমিটার হয় তাহলে স্টার্ট বাটন পুশ করতে হবে। এক্সিলারি তাপমাত্রা দেখার ক্ষেত্রে এক্সিলাতে এবং রেকটাল তাপমাত্রা দেখার ক্ষেত্রে রেকটাল থার্মোমিটার মলধারে প্রবেশ করাতে হবে। পায়ুপথে তাপমাত্রা পরিমাপের সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ১ ইঞ্চি এবং বড়দের ক্ষেত্রে ১.৫ ইঞ্চি থার্মোমিটার পায়ুপথে প্রবেশ করাতে হবে। এক্ষেত্রে থার্মোমিটার প্রবেশ

করানোর সময় কখনোই জোরে ধাক্কা দেওয়া যাবে না। পায়ুপথে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি এবং এক্সিলারি তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি কম থাকে।

- রিডিং কাউন্ট সম্পন্ন হলে ডিজিটাল থার্মোমিটারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপ দেওয়ার সাথে সাথে বের করে নিয়ে আসতে হবে। তবে গ্লাস বা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে।
- থার্মোমিটারটি হালকা গরম সাবান পানিতে ধুয়ে (কখনই অধিক গরম পানিতে নয়) জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে শুকনো করে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- গ্লাভস খুলে ফেলে তা নির্ধারিতে বর্জ্য ধারকে রেখে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিতে হবে।
- টেমপারেচার চার্টে তাপমাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

আবার ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে রোগীর শরীরে ইনফ্রারেড রশ্মির সাহায্যে তাপমাত্রা মেপে নেয়া যায় খুব সহজেই।

চিত্র ৪.৭: মুখে ওরাল টেমপেরাচার নেয়া হচ্ছে

টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা চার্ট: টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা চার্ট হল এমন একটি চার্ট যা দেহের তাপমাত্রা নথিভুক্ত ও রেকর্ড করতে ব্যবহৃত হয়। হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কাজ করতে গেলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত চার্টে তাপমাত্রা রেকর্ড করতে হয়। আবার হোম কেয়ার সেটিংসে প্রায়শই কেয়ারগিভার নিজেই এটি ছক করে বানিয়ে নিয়ে রেকর্ড করে।

টেম্পারেচার চার্ট প্রনয়ন: টেম্পারেচার চার্ট প্রনয়নে কিছু বিষয়ের প্রতি নজর রাখা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। টেম্পারেচার চার্টের সাধারণত দুই ধরনের তথ্য সম্বলিত অংশ থাকে। যথা: প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ।

- **প্রথম অংশ:** চার্টের প্রথম অংশের উপরিভাগে রোগীর সাধারণ তথ্য অর্থাৎ নাম, বয়স, লিঙ্গ, মাসের নাম, বেড নম্বর এবং চার্ট নম্বর থাকে। এটি খুব সহজেই রোগীকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
- **দ্বিতীয় অংশ:** দ্বিতীয় অংশে কিছু সারি ও কলাম এঁকে নিতে হয়। এখানে তারিখ, দিন, সময়, তাপমাত্রা ও মন্তব্যের ঘর থাকে। এখান থেকে কাঙ্ক্ষিত ফাইন্ডিংসটি মনিটর করা যায়।

নিম্নে একটি টেমপারেচার চার্টের নমুনা দেওয়া হল:

রোগীর নাম:____________। বয়স: ___বছর। লিঙ্গ: ____। বেড নং: ___। চার্ট নং:____। সমস্যা:____________________ তারিখ:______।					
তারিখ	দিন	সময়	তাপমাত্রা (সেঃ)	স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	রবি	সকাল ৮.০০	৩৯.৬		
		রাত ৮.০০	৩৮		
২	সোম	সকাল ৮.০০	৩৮.৪		
		রাত ৮.০০	৩৭.১		

টেবিল ৪.২: টেম্পারেচার চার্টের নমুনা ছক

দিনে যদি ২ এর অধিক বার তাপমাত্রা দেখা হয় তাহলে প্রয়োজন মত সময় ও তাপমাত্রার কলাম বাড়িয়ে নিতে হবে। উল্লেখযোগ্য যদি কোনো বিশেষ মন্তব্য থাকে তাহলে তা নির্দিষ্ট ঘরে নোট করতে হবে।

থার্মোমিটার রক্ষণাবেক্ষণ

অন্যান্য মেডিকেল সরঞ্জামাদির মতই থার্মোমিটার রক্ষণাবেক্ষণ একটি অবশ্য করণীয় কাজ। ব্যবহারের পর থার্মোমিটার সাবান মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে অবথা ৭০% আইসোপ্রোপ্রাইল এলকোহল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। থার্মোমিটারকে ৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর বেশি তাপমাত্রায় রাখা যাবে না। সূর্যের আলো সরাসরি পড়ে এমন স্থানেও রাখা যাবে না। মার্কারী বাল্বটি সবসময় নিচের দিকে রাখতে হবে এবং থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর নিচে নামিয়ে রাখতে হবে। এছাড়াও কাজ করার পূর্বে থার্মোমিটারটিতে কোনো প্রকার ত্রুটি আছে কিনা তা চেক করে নিতে হবে এবং কাজ করার পর নির্দিষ্ট জায়গায় পরবর্তীতে ব্যবহার উপযোগী করে সংরক্ষণ করতে হবে। বাসাবাড়িতে থার্মোমিটার অবশ্যই ছোট বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

৪.৪ নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার পরিমাপ করা

নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি ভাইটাল সাইন্স যেগুলো একজন কেয়ারগিভার খুব সহজেই পরিমাপ করতে পারে। অন্যান্য ভাইটাল সাইনের মতই এগুলোও রেস্টিং বা রোগীকে বিশ্রামরত অবস্থায় পরিমাপ করতে হয়।

৪.৪.১ নাড়ির গতি বা পালস রেট বা হার্টবিট

মানবদেহের হৃৎপিন্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহাভ্যন্তরে সারাক্ষণ সংকোচন-প্রসারনের মাধ্যমে স্পন্দিত হয়। হৃৎপিন্ডের এই স্পন্দনকে হৃদস্পন্দন বা হার্ট-বিট বলা হয়। এই হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমেই হৃৎপিন্ড আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহিত করে। একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-৯০ বা ৬০-১০০ বার হয়। এটিকে হার্ট-বিটও বলা হয়। বুকের বাম পার্শ্বে হৃৎপিন্ডের এপেক্সের উপর স্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে এই শব্দ শোনা যায়। আবার হাতের কব্জির রেডিয়াল আর্টারি বা রেডিয়াল ধমনিতে হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যায়। এটিকে তখন পাল্স নামেও অভিহিত করা হয়। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃৎস্পন্দনের যে শব্দ শোনা যায় তাকে হার্টসাউন্ড বলে। হৃৎস্পন্দন বা হার্ট-বিটকে যখন প্রতি মিনিটে হাতের কব্জির রেডিয়াল আর্টারিতে আঙ্গুলের মাধ্যমে পালপেশন করে গণনা করা যায় তখন তাকে পাল্স রেট বলা হয়।

হৃদপিন্ডের নিলয় সংকোচনের ফলে রক্তচাপের দরুন রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে যাওয়ার সময় ধমনীর গায়ে যে চাপ দেয় তাকে হার্টবিট বা নাড়ির গতি বলে। পালস রেট হল হৃদপিন্ড এক মিনিটে যে পরিমাণ বিট দেয় তার সংখ্যা। এই হৃদস্পন্দন আর্টারি বা ধমনীতে পাওয়া যায়। পুরুষদের তুলনায় নারীদের পালস রেট বেশী থাকে। আবার বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের হার্টবিট আরো বেশী হয়।

নরমাল পালস রেট: একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মিনিটে সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ বা ১০০ বার বিট দেয়।

পালস দেখার সাইট: যেসব সাইটগুলোতে পালস দেখা হয় সেগুলো হল-

মানবদেহে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্থানে হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে সহজেই পাল্‌স রেট মাপা যায়। স্থানানুযায়ী ঐ পাল্‌সের নামকরণ করা হয়। যেমন:

১। **রেডিয়াল পাল্‌স:** বেইজ অফ থাম্ব (base of thumb) বা বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় এটি পাওয়া যায়।
২। **টেম্পোরাল পাল্‌স:** সাইড অফ ফোরহেড (side of forehead) বা কপালের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।
৩। **ক্যারোটিড পাল্‌স: সাইড অফ নেক** (side of neck) বা ঘাড়ের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।
৪। **ব্র্যাকিয়াল পাল্‌স:** ইনার আস্পেক্ট অফ এলবো (Inner aspect of elbow) অর্থাৎ, দুই কনুইয়ের ভিতরের দুই পাশে এটি পাওয়া যায়।
৫। **ফিমোরাল পাল্‌স:** ইনার আস্পেক্ট অফ আপার থাই (Inner aspect of upper thigh) অর্থাৎ, থাইয়ের উপরে উরুর দুই সন্ধিস্থলে এটি পাওয়া যায়।

চিত্রে আরো কিছু স্থানের কথা উল্লেখ করা আছে যেখান থেকে আমরা পালপেশনের মাধ্যমে খুব সহজেই নাড়ির গতি পরিমাপ করতে পারি।

পাল্‌স রেট পরিমাপ করার পদ্ধতি: উপরের চিত্রে প্রদর্শিত স্থানসমূহের যেকোনোটিতে পালপেশনের সাহায্যে পাল্‌স রেট পরিমাপ করা যায়। হাতের কব্জির (রিষ্ট) উপরে যে আর্টারি থাকে তাকে রেডিয়াল আর্টারি বলে। এই আর্টারি থেকেই সাধারণত পাল্‌স রেট পরিমাপ করা হয়। রেডিয়াল আর্টারি থেকে প্রাপ্ত পাল্‌স কে রেডিয়াল পাল্‌স বলা হয়ে থাকে। নিচে রেডিয়াল পাল্‌স পরিমাপ করার ধারাবাহিক পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

- রোগীকে আরামদায়ক অবস্থানে রাখতে হবে, অন্যথায় ভুল পরিমাপ আসতে পারে।
- রোগীর কব্জির হাড় এবং কব্জির বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় টেন্ডনের মধ্যে রেডীয়াল পাল্‌স অনুভব করতে হাতের দুইটি বা তিনটি আঙ্গুলের সাহায্যে আলতো চাপ ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে তর্জনী, মধ্যমা এবং তৃতীয় আঙ্গুলের ডগা ব্যবহার করতে হবে। রেডিয়াল পালস উভয় কব্জিতে নেওয়া যেতে পারে।
- এমনভাবে পর্যাপ্ত চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে প্রতিটি বীট অনুভব করা যায়। খুব জোরে চাপ দিলে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে পাল্‌স ঠিকমত নাও অনুভব হতে পারে।
- এভাবে নিয়ন্ত্রিত চাপ প্রয়োগ করে ঘড়ির দিকে লক্ষ রেখে এক মিনিট পর্যন্ত নাড়ির স্পন্দন গণনা করতে হবে। এই এক মিনিটে প্রাপ্ত ফলাফলটই হচ্ছে নাড়ির গতি।
- এবার পালস রেট রেকর্ড করতে হবে।

আবার পাল্‌স অক্সিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই পাল্‌স রেটের পাশাপাশি অক্সিজেন স্যাচুরেশন, ডিজিটাল মেশিনে মাপা যায়। রক্তে অক্সিজেনের শতকরা মাত্রাকেই মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় অক্সিজেন স্যাচুরেশন। একজন সুস্থ ব্যক্তির রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা থাকা উচিৎ ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ। অক্সিজেন ৯০ এর নিচে

নেমে গেলেই সমস্যা শুরু হয়। মাত্রা বেশি কমে গেলে রোগীকে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দিতে হয়। পালস অক্সিমিটারের সাহায্যে পালস ও অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপার জন্য রোগীর আঙ্গুলে চিত্রের ন্যায় ডিজিটাল মেশিনটি লাগিয়ে দিতে হয়। তারপর সুইচ টিপে সেটি চালু করলে ১ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসপ্লেতে পালস রেট ও অক্সিজেনের মাত্রা চলে আসে।

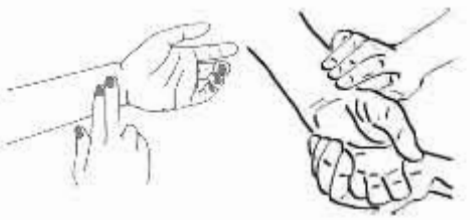

চিত্র ৪.৭: দুই ও তিন আঙ্গুলের সাহায্যে পালস রেট মাপার পদ্ধতি

৪.৪.২ শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বা রেসপিরেটরি রেট (Respiratory Rate)

শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বা রেসপিরেটরি রেট হল একজন ব্যক্তির প্রতি মিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা। কোনো ব্যক্তিকে বিশ্রামরত অবস্থায় রেখে এটি পরিমাপ করতে হয়। আমরা ফুসফুসে অক্সিজেন নেয়ার জন্য শ্বসনযন্ত্রের মাধ্যমে বাতাস নেই, এটিকে নিঃশ্বাস বা শ্বাস বলে আবার যখন কার্বনডাইঅক্সাইড যুক্ত বাতাস বের করে দেই, সেটিকে বলে প্রশ্বাস। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে বুক কতবার ওঠা-নামা করে তা গণনা করে পরিমাপ করা হয়। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির বিশ্রামরত অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের হার হল মিনিটে ১২ থেকে ২০ টি। কোনো ব্যক্তির এটি যদি ১২ থেকে ২০ এর মধ্যেই থাকে তাহলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছেন বলা যায়, যেটিকে মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় ইউপনিয়া (Eupnea)। আবার এটি ১২ এর কম হলে তাকে বলা হয় ব্র্যাডিপনিয়া (Bradypnea) এবং ২৫ এর বেশি হলে তাকে বলা হয় ট্যাকিপনিয়া (Tachypnea)। ব্র্যাডিপনিয়া ও ট্যাকিপনিয়া অস্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নির্দেশ করে এবং এর দ্বারা অন্য কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যার উপস্থিতি বুঝা যায়। ব্র্যাডিপনিয়া ও ট্যাকিপনিয়ার কিছু উপসর্গ আছে যেগুলো দেখে এগুলোকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। যেমন:

ব্র্যাডিপনিয়া	ট্যাকিপনিয়া
• ডিজিনেস • শরীর দুর্বল অনুভূত হওয়া • মূর্ছা যাওয়া • বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়া • ঘন ঘন শ্বাস নেয়া • স্মৃতি কমে যাওয়া • বিভ্রান্তি • অলসতা ও ঘুমের সমস্যা • বমি বমি ভাব ও বমি প্রভৃতি।	• নিশ্বাসের দুর্বলতা • শ্বাস নেয়ার সময় বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া • বুকের ব্যথার অবনতি হওয়া • সায়ানোসিস হয়। অর্থাৎ, অক্সিজেনের অভাবে ত্বক ও ঠোঁটের রঙ নীল বর্ণ ধারণ করে • পালস রেট বেড়ে যায় • বিভ্রান্তি ও • মাথা ঘোরা বা ডিজিনেস প্রভৃতি।

আবার বয়সবেধে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বিভিন্ন হয়। যেমন:

বয়স	শ্বাসপ্রশ্বাসের হার (প্রতি মিনিটে)
নবজাতক	৩০-৬০ ব্রেদ/মিনিট
ইনফ্যান্ট	২৫-৪০ ব্রেদ/মিনিট
টডলার	২০-৩০ ব্রেদ/মিনিট
চাইল্ড	২০-২৫ ব্রেদ/মিনিট
এডোলসেন্ট	১৫-২০ ব্রেদ/মিনিট
প্রাপ্তবয়স্ক	১২-২০ ব্রেদ/মিনিট

টেবিল : বয়সবেধে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার

শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বা রেসপিরেটরি রেট পরিমাপের পদ্ধতি:

- রোগীকে বসিয়ে এবং বিশ্রামরত অবস্থায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- চেয়ারে বা বিছানায় আরামদায়কভাবে বসিয়ে বা শুইয়ে নিলে ভালো হয়।
- এক মিনিটের ব্যবধানে বুক বা পেট যে পরিমাণ ওঠা-নামা করে তার সংখ্যা গণনা করে শ্বাস প্রশ্বাসের হার পরিমাপ করে নিতে হবে।
- তারপর, তা রেকর্ড শীটে নোট করতে হবে।

চিত্র ৪.৮: রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার পরিমাপের পদ্ধতি।

৪.৫ রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার পরিমাপ করা:

৪.৫.১ রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার কি?

হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়ে সমগ্র শরীরে প্রবাহিত হওয়ার সময় ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে যে পার্শ্বচাপ বা প্রেসার উৎপন্ন করে, তাকে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বলে। তাই রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির রক্তচাপকেই বুঝানো হয়। এটি মানবদেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেহকোষে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত হয়। রক্তচাপ হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা, রক্তের ঘনত্ব ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আমরা ইতোমধ্যেই হৃৎপিন্ডের

ঘটন সম্পর্কে জেনেছি। হৃৎপিন্ডের স্বতস্ফূর্ত সংকোচনকে সিস্টোল (Systole) এবং স্বতস্ফূর্ত প্রসারণকে ডায়াস্টোল (Diastole) বলে। অলিন্দে যখন সিস্টোল হয়, নিলয় তখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে। নিলয়ের সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ থাকে, তাকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে। সিস্টোলিক চাপ ওপরে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ নিচে লিখে রক্তচাপ প্রকাশ করা হয়। যেমন, ১২০/৮০ মি.মি. পারদ চাপ (mmHgP) বলতে বুঝায় সিস্টোলিক চাপ ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০ মি.মি. পারদ চাপ। এটি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষের আদর্শ রক্তচাপ। স্বাভাবিক ও সুস্থ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপের পাল্লা পারদস্তম্ভের ১১০-১৪০ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৬০-৯০ মিলিমিটার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উর্ধ্ব বাহুর ব্র্যাকিয়াল ধমনিতে নির্দিষ্ট উপায়ে রক্তচাপ পরিমাপ করা যায়। এছাড়াও শরীরের আরো কিছু স্থানে রক্তচাপ মাপা যায়। স্ফিগমোমেনোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

শ্রেণিবিভাগ	সিস্টোলিক	ডায়াস্টোলিক
সাধারণ	১২০	৮০
উচ্চ রক্তচাপের পূর্বাবস্থা (প্রি-হাইপারটেনশেন)	১২০-১৩৯	৮০-৮৯
উচ্চ রক্তচাপ পর্যায় ১	১৪০-১৫৯	৯০-৯৯
উচ্চ রক্তচাপ পর্যায় ২	১৬০ বা তার বেশি	১০০ বা তার বেশি
মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস)	১৮০ বা তার বেশি	১১০ বা তার বেশি

টেবিল : রক্তচাপের সারণী

৪.৫.২ উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ: হাইপারটেনশনের আরেক নাম উচ্চ রক্তচাপ, যাকে HTN দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যখন কোনো ব্যক্তির রক্তের চাপ সব সময়েই স্বাভাবিকের চেয়ে উর্ধ্বে থাকে, তখন ধরে নেওয়া হয় তিনি হাইপারটেনশনে ভুগছেন। কারো রক্তচাপ যদি উভয় বাহুতে ১৪০/৯০ মি.মি. বা তার ওপরে থাকে, তাহলে তার উচ্চ রক্তচাপ হয়েছে বলা যেতে পারে।

ঝুঁকি: শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ওপর স্বল্প থেকে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে এই উচ্চ রক্তচাপ। বিশেষত স্ট্রোক, হার্ট ফেইলিওর, **হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া**, চোখের ক্ষতি এবং বৃক্ক বা কিডনির বিকলতা ইত্যাদি রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

কারণ: অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ, অতিরিক্ত মেদ, কাজের চাপ বা টেনশন, মদ্যপান, অতিরিক্ত আওয়াজ, বদ্ধ পরিবেশ ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। আবার এটি বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত একটি অসুখও। তবে ধারণা করা হয়, প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার কারণ হিসেবে লবণের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়।

করণীয়: চিকিৎসকরা মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের রক্তচাপের জন্য ওজন কমানো, ধূমপান ছেড়ে দেওয়া এবং নিয়মিত হালকা ব্যায়ামকে চিকিৎসার প্রথম ধাপ হিসেবে ধরেন। যদিও ধূমপান ছেড়ে দেওয়ায় সরাসরি রক্তচাপ কমে না; কিন্তু উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে এটি সম্পৃক্ত, কারণ এটি ছেড়ে দিলে উচ্চ রক্তচাপের বেশ কিছু উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে আসে। যেমন স্ট্রোক অথবা হার্ট অ্যাটাক। মৃদু উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম এবং শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। ফল, শাকসবজি, স্নেহবিহীন দুগ্ধজাত খাদ্য এবং নিম্নমাত্রার লবণ ও তেলজাতীয় খাদ্য উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া পরিবেশগত চাপ যেমন উঁচু মাত্রার শব্দের পরিবেশ বা অতিরিক্ত আলো পরিহার করাও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপকারী। এর পরও যাঁরা

মাঝারি থেকে উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, তাঁদের রক্তচাপ নিরাপদ মাত্রায় নিয়ে আসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে অনির্দিষ্টকালের জন্য ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

নিম্ন রক্তচাপ: নিম্ন রক্তচাপ বা Low Blood pressure শব্দটা বেশ প্রচলিত। মেডিক্যাল পরিভাষায় নিম্ন রক্তচাপ হলো দেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রের এমন একটি অবস্থা, যেখানে রক্তের সিস্টোলিক চাপ ৯০ মি.মি. পারদের নিচে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৬০ মি.মি. পারদের নিচে থাকে।

কারণ: দেহে রক্তের পরিমাণ কমে যাওয়া, রক্তস্বল্পতা, হরমোনের পরিবর্তন, রক্তগাত্রের প্রশস্ততা বেড়ে যাওয়া, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, হৃৎপিন্ড কিংবা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সমস্যা, ঠিকমতো বা সময়মতো না খেলে নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে। তবে রক্তের পরিমাণ কমে যাওয়াই হাইপাটেনশনের প্রধান কারণ বলে ধরা হয়। এ ছাড়া রক্তপাত, অপর্যাপ্ত তরল গ্রহণ যেমন অনশন কিংবা অতিরিক্ত ফ্লুইড বের হয়ে যাওয়া; যেমন বমি কিংবা ডায়রিয়ার কারণেও নিম্ন রক্তচাপ হয়।

ঝুঁকি: যাদের রক্তচাপ অস্বাভাবিক হারে কম, তাদের হৃক্রিয়া, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি কিংবা মস্তিষ্কজাত সমস্যা থাকতে পারে। এই রক্তচাপ বজায় থাকলে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে রক্ত সরবরাহ কম থাকার কারণে সেখানে অক্সিজেন ও পুষ্টির অভাব হতে পারে, যা জীবনের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।

করণীয়: আলু, ডিম, মাছ, মাংস, ছানা, বাদাম, সবুজ শাক ইত্যাদি এবং লবণযুক্ত খাবার গ্রহণ, খাদ্যে কিছু ইলেকট্রোলাইট (গ্লুকোজ ও স্যালাইন) যোগ, সকালে ক্যাফেইন গ্রহণ সহায়ক হতে পারে। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের সুস্থতার জন্য রক্তচাপকে নিরাপদ মাত্রার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। তাই নিয়মিত রক্তচাপ মাপা সবার জন্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিচের সতর্কতামূলক নিয়মগুলো পালন করলে উপকার পাওয়া যায়:

১। ডায়াবেটিস থাকলে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখা।
২। দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।
৩। চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করা, যেমন: ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি ইত্যাদি।
৪। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
৫। পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৬। নিয়মিত ব্যায়াম করা।
৭। ধুমপান থেকে বিরত থাকা।
৮। দৈনিক ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমান।
৯। মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা।
১০। খাবারে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

৪.৫.৩ রক্তচাপ পরিমাপের পদ্ধতি

অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের নির্দেশনা মোতাবেক রক্তচাপ মাপা হয়ে থাকে। রক্তচাপ মাপার জন্য স্ফিগমোমেনোমিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি মূলত তিন প্রকারের হতে পারে।

ক. এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটার
খ. পারদ স্ফিগমোমেনোমিটার ও
গ. ডিজিটাল স্ফিগমোমেনোমিটার।

এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের সাহায্যে রক্তচাপ পরিমাপের জন্য স্টেথিস্কোপ নামক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যার সহায়তায় শব্দের মাধ্যমে সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ নির্ধারণ করা হয়। ডিজিটাল থার্মোমিটার সরাসরি রক্তচাপ পরিমাপ করে একটি ডিজিটাল স্ক্রিনে ফলাফল প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে পারদ স্ফিগমোমেনোমিটারে ফলাফলটি প্রদর্শিত হয় একটি পারদ মিটারে।

চিত্র ৪.৯: বিভিন্ন ধরনের স্ফিগমোমেনোমিটার

তবে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা অন্যান্য সেবাদানকেন্দ্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। নিচে একটি আদর্শ এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। বিপি বা ব্লাড প্রেসার কাফ (BP Cuff or Blood Pressure Cuff): এটি একটি ইনফ্ল্যাটেবল ব্যাগ যা ধমনীকে আটকানোর জন্য হাতকে সংকুচিত করতে ব্যবহৃত হয়। সঠিকভাবে ব্র্যাকিয়াল আর্টারিকে নির্ধারণ করার জন্য রোগীর বয়স ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী সঠিক মাপের বিপি কাফ ব্যবহার করতে হয়। বয়স্ক ও শিশুদের জন্য পৃথক বিপি কাফ ব্যবহার করতে হয়। প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর জন্য বাহুর আকারের উপর নির্ভর করে ১২*২২ সে.মি. থেকে শুরু করে ১৬*৪২ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে। আবার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি ৪*৮ থেকে ৯*১৮ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে।

২। ইনফ্লেশন বাল্ব (Inflation Bulb): এয়ার রিলিজ বাল্ব বন্ধ রেখে ইনফ্লেশন বাল্ব হাত দিয়ে চেপে চেপে বিপি কাফের ভিতরে প্রয়োজন অনুযায়ী বাতাস প্রবেশ করানো যায়।

৩। এয়ার রিলিজ বাল্ব (Air Release Bulb): এয়ার রিলিজ বাল্বের মাধ্যমে বিপি কাফের ভিতরে বাতাসের আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। এনারয়েড ম্যানোমিটার (Anaroid Manometer): এটি একটি চাপ পরিমাপক যন্ত্র যেটি মি.মি. পারদ চাপ এককে রক্ত চাপ পরিমাপ করে।

৫। টিউব কানেক্টর (Tube Connector): টিউব কানেকটরের সাহায্যে এনারয়েড ম্যানোমিটার ও ইনফ্লেশন বাল্ব বিপি কাফের সাথে সংযুক্ত হয়। এর মাধ্যমে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে ও বাহিরে যায় আবার চাপের কারণে ম্যানোমিটারের কাটা উঠা নামা করা যায়।

চিত্র ৪.১০: এনারয়েড স্ফিগমোমেনোমিটারের বিভিন্ন অংশ

স্টেথোস্কোপ (Stethoscope): স্টেথোস্কোপ হলো মানুষ অথবা প্রাণিদেহের হৃদস্পন্দন কিংবা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ শব্দ শোনার জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র। এটি প্রধানত হৃদস্পন্দন এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে ব্যবহার করা হয়। তবে এটি অন্ত্র, ধমনী এবং শিরার রক্ত বয়ে চলার শব্দ শোনার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

প্রকারভেদ: স্টেথোস্কোপ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. Acuostic Stethoscope: আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা সচরাচর এই ধরনের স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করেন। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির একুয়াস্টিক থার্মোমিটার পাওয়া যায়।

২. Electronic Stethoscope: এ ধরনের স্টেথোস্কোপ শব্দতরঙ্গকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করে সেটিকে অ্যাম্প্লি-ফাই করে জোরালো ও পরিষ্কার শব্দে পরিণত করে।

৩. Noise Reduction Stethoscope: এ ধরনের স্টেথোস্কোপ চারপাশের অপ্রয়োজনীয় নয়েজ বাদ দিয়ে কেবল কাংখিত শব্দ শুনতে সাহায্য করে।

৪. Recording Stethoscope: এর সাহায্যে শ্রুত শব্দকে রেকর্ড করে রাখা যায় এবং পরবর্তীতে ধারনকৃত শব্দ বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

৫. Fetal Stethoscope: গর্ভাবস্থায় ভ্রূনের হৃদস্পন্দন শুনতে এ ধরনের স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করা হয়।

স্টেথোস্কোপের নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও চিকিৎসকেরা মূলত: রোগ নির্ণয়ের কাজেই এটি ব্যবহার করেন। রোগীর Clinical Examination এর চারটি ধাপের মধ্যে একটি হচ্ছে Auscultation, যা স্টেথোস্কোপের সাহায্য ছাড়া প্রায় অসম্ভব। নিচে একটি স্টেথিস্কোপের বিভিন্ন অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১। ইয়ারপিস (earpiece): এই অংশটি কানের মধ্যে প্রবেশ করানোর পর ডায়াফ্রাম চালু থাকলে শরীরের অভ্যন্তরীণ শব্দসমূহ শোনা যায়।

২। টিউবিং: এটি একটি নমনীয় রাবার টিউব যেটি ডায়াফ্রাম দ্বারা গৃহীত শব্দ ইয়ারপিসের মাধ্যমে আমাদের শ্রবণযন্ত্রে পৌঁছে দেয়।

৩। বেল: বেল বা ঘন্টা ডায়াফ্রামের উল্টো পাশে লাগানো থাকে এবং এটি মৃদু ও অমসৃন শব্দ শুনতে সাহায্য করে। এটিকে ঘুরিয়ে ডায়াফ্রামের মুখ খোলা বা বন্ধ করা যায়।

৪। ডায়াফ্রাম: ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা স্টেথোস্কোপের এমন একটি সমতল অংশ যেটি রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করাতে হয়। এটিই মূলত শব্দ গ্রহণ করে টিউবের মাধ্যমে আমাদের কানে পৌঁছে দেয়।

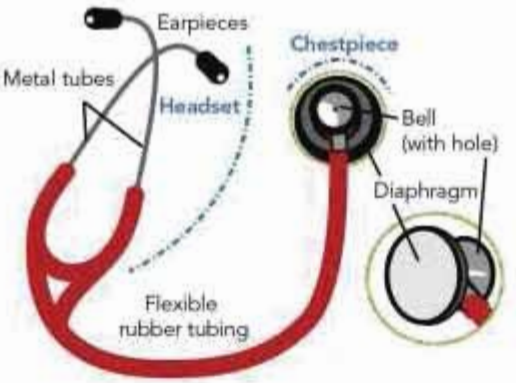

চিত্র ৪.১১: স্টেথোস্কোপের বিভিন্ন অংশ

রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি:

১। সঠিক নিয়মে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিতে হবে।
২। স্টেথোস্কোপের এয়ার পিস ও ডায়াফ্রাম জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
৩। ব্লাড প্রেসার মনিটর ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।
৪। রোগীকে আরামদায়কভাবে বসিয়ে অথবা শুইয়ে নিতে হবে।
৫। রক্তচাপ মাপার জন্য চাপবিহীন অবস্থায় বিপি কাফের নিচের প্রান্ত কনুইয়ের সামনের ভাঁজের ২.৫ সেঃ মি. উপরে ভালোভাবে আটকিয়ে নিতে হবে।
৬। কনুইয়ের সামনে হাত দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীর অবস্থান স্থির করে তার উপর স্টেথো স্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে নিতে হবে।
৭। ডায়াফ্রামটি এমনভাবে আলতো করে চাপ দিতে হবে যেন ডায়াফ্রাম এবং ত্বকের মাঝখানে কোনো ফাকা না থাকে।
৮। চাপ মাপার সময় স্টেথোস্কোপ কিংবা কাফের ওপরে হাত না রেখে কাজ করতে হবে।
৯। ব্যারোমিটারের ঘড়ি হৃদপিন্ডের সাথে একই তলে অবস্থান করিয়ে নিতে হবে।
১০। এরপর রেডিয়াল ধমনী অনুভব করে ধীরে ধীরে ইনফ্লেশন বাল্বের সাহায্যে বিপি কাফটি ফুলিয়ে চাপ বাড়াতে হবে।
১১। রেডিয়াল পালস বন্ধ হওয়ার পর ব্যারোমিটারে চাপ ৩০ মি. মি. উপরে নিতে হবে।
১২। তারপর আস্তে আস্তে চাপ কমাতে হবে। প্রতি বিটে সাধারণত ২ মি. মি. চাপ কমানো যেতে পারে।
১৩। এবার চাপ কমানোর সময় স্টেথোস্কোপ দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীতে সৃষ্ট শব্দ মনোযোগের সঙ্গে শুনো। চাপ কমতে শুরু করলে রক্ত চলাচলের ফলে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়। একে করটকফ শব্দ (Korotkoff sound) বলা হয়। করটকফ শব্দ ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয়।
১৪। প্রথমে এক ধরনের যে তীক্ষ্ণ শব্দে পাওয়া যায় এটাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে কাউন্ট করতে হবে।

১৫। করটকফ শব্দের তীক্ষ্ণতা ধীরে ধীরে কমে আসতে আসতে এক সময় প্রথম পর্যায়ের শব্দ থেমে যায়। এই শব্দ বন্ধ হওয়ার আগে যে শব্দ শোনা যায় সেটাকেই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে কাউন্ট করতে হবে।
১৬। বিপি মেশিন খুলে ফেলে পরিমাপ করা ব্লাড প্রেসার রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কাজ শেষে বিপি ইন্সট্রুমেন্ট নির্ধারিত জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে এবং কোনো অসুবিধা থাকলে চিকিৎসক বা নার্সকে অবহিত করতে হবে।

চিত্র ৪.১২: এনারয়েড ও ডিজিটাল মেশিনে রক্তচাপ মাপা হচ্ছে

৪.৬ মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করা

৪.৬.১ উচ্চতা ও ওজন:

সেবাগ্রহীতা ব্যক্তির উচ্চতা ও ওজন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো অন্যান্য ভাইটাল সাইন বা অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণগুলোর সাথে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেকোনো কাজের শুরুতেই মেপে নিয়ে রেকর্ড করতে হয়। স্বাস্থ্যের ভালোমন্দের অনেকখানিই নির্ভর করে উচ্চতা ও ওজন অনুযায়ী শারীরিক ভারসাম্যের উপর। ওজন বেশি হলে শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দেহে বাসা বাধে নানা রোগ। তাই উচ্চতার সাথে ভারসাম্য রেখে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। এজন্য অসুস্থ রোগী ছাড়া সুস্থ ব্যক্তির জন্যেও নিয়মিত ওজন মাপা এবং উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজন বজায় রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করার উপায়: উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করে একজন মানুষের স্বাস্থ্যমান জানা যায়। তার বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ও ওজনে কোনো তারতম্য আছে কিনা তা অবগত হওয়া যায়। বিশেষ করে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস খুব সহজেই অনুমান করা যায়। উচ্চতা ও ওজন হলো স্বাস্থ্য ঝুঁকির একটি মূল ইন্ডিকেটর। ওজনকে সাধারণত পাউন্ড অথবা কিলোগ্রাম হিসেবে লেখা হয় এবং উচ্চতাকে মিটার/সেন্টিমিটার/ইঞ্চিতে লেখা হয়। ওজন পরিমাপের জন্য ওজন পরিমাপক যন্ত্র পাওয়া যায়। ওজন পরিমাপক যন্ত্র মূলত দু রকমের, যথা: এনালগ ও ডিজিটাল। কিছু নিয়ম মেনে এই মেশিনের উপর সোজা হয়ে দাড়ালে মিটার বা ডিসপ্লে পর্দা দেখে সহজেই ওজন দেখা যায়। তবে বাসা কিংবা স্বাস্থসেবা কেন্দ্রে যেখানেই হউক না কেনো ওজন মাপার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় নজর দেওয়া উচিৎ, যেমন:

> যন্ত্রটি কার্পেট, ম্যাট বা মেঝেতে সমান জায়গায় রাখতে হবে। সেবাগ্রহীতাকে ভারী জামাকাপড় পরিহার করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। মুঠোফোন, মানিব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, ফাইল বা অন্য যেকোনো ব্যক্তিগত সরঞ্জাম যা সঠিক ওজনের তারতম্য সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো অন্যত্র রেখে মেশিনের উপর দাড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিতে হবে। জুতা না পরে ওজন মাপা শ্রেয়। পেট ভরে খেয়েই বা অনেক পানি বা তরল পান করার পরপর ওজন মাপা উচিৎ নয়। ব্যায়ামের পরপরও ওজন

মাপবেন না। নারীদের ক্ষেত্রে পিরিয়ড বা মাসিকের সময় বাদ দিয়ে ওজন মাপতে বলা উচিৎ। যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁরা ওজন মেপে একটা চার্ট তৈরি করুন।

অনেক যন্ত্র পাউন্ডে ওজন দেখায়। পাউন্ডকে কিলোগ্রামে রূপান্তর করতে প্রাপ্ত ওজনকে ০.৪৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। ওজন পরিমাপের পর তার চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে। আবার উচ্চতা মাপার জন্য দরকার হয় একটি উচ্চতা পরিমাপক ফিতা বা উল্লম্ব স্ট্যান্ডের যেখানে মিটার বা সেন্টিমিটার বা উভয় স্কেলে দাগ কাটা থাকে। উচ্চতা মাপার জন্য সোজা হয়ে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে হয়। ফুট এবং ইঞ্চিতেও উচ্চতা মাপা হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিটার স্কেলে উচ্চতার মান আমাদের জানতে হয়। যেমন শরীরের বিএমআই মাপার ক্ষেত্রে। তবে বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির সেন্সর সম্বলিত মেশিন পাওয়া যায় যেগুলো নিমিশেই শরীরের ওজন, উচ্চতা, বিএমআই প্রভৃতি পরিমাপ করতে পারে সঠিকভাবে।

চিত্র ৪.১৩: মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ

৪.৬.২ বিএমআই বা বডি ম্যাস ইনডেক্স (BMI or Body Mass Index)

মানবশিশু জন্মানোর পর থেকেই দৈহিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে যা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির ২০-২৪ বছরের পর সাধারণত দৈহিক উচ্চতার তেমন একটা বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হয় না। তখন খাদ্যের কাজ হয় শুধুমাত্র দেহের ক্ষয়পূরণ এবং দেহকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখা। প্রাপ্তবয়সে সুস্বাস্থের জন্য দেহের উচ্চতার সাথে দেহের ওজনের একটি সামঞ্জস্য প্রয়োজন হয়। দেহের উচ্চতার সাথে ওজনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সূচককেই বিএমআই বা বডি ম্যাস ইনডেক্স বা ভরসূচি বলা হয়। উচ্চতার সাথে দেহের ওজনের সামঞ্জস্য থাকলে একজন ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যায়। আবার যদি শরীরের ওজন ভরসূচি অনুযায়ী নির্দেশিত বা প্রাপ্ত ওজনের চেয়ে খুব বেশি কমবেশি হয়ে পড়ে তখন নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিএমআই মাপার সূত্র হচ্ছে: *দেহের ওজন (কেজি)/ (দেহের উচ্চতা (মিটার))* ^{2}

অর্থাৎ কিলোগ্রাম এককে কোনো ব্যক্তির দেহের ওজন পরিমাপ করে সেটিকে মিটার এককে পরিমিত উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে সেই ব্যক্তির বিএমআই বা ভরসূচি পাওয়া যায়। উদাহরণ: ধরা যাক একজন ব্যক্তির দেহের ওজন ৭২ কেজি এবং উচ্চতা ১.৭৮ মিটার। তাহলে তার বিএমআই= ৮০/(১.৭৮*১.৭৮)= ২৫.২৫ (প্রায়)। যেকোনো বয়সের নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে বিএমআই এর স্বাভাবিক পাল্লা বা রেঞ্জ হচ্ছে

১৮.৫ থেকে ২৪.৯। বিএমআই মান যদি ১৮.৫০ এর চেয়ে কম হয় তাহলে বলা যায় ব্যক্তিটি ওজনস্বল্পতায় ভুগছে। আবার যদি বিএমআই এর মান ২৫ থেকে ২৯.৯ পর্যন্ত হয়, তাহলে ব্যক্তিটি ওজনাধিক্যে ভুগছে। বিএমআই এর মান ৩০ থেকে ৩৯.৯ হলে স্থূল এবং ৪০ এর অধিক হলে অতিরিক্ত স্থূল বলা হয়ে থাকে।

চিত্র ৪.১৪: বডি ম্যাস ইনডেক্স

কোনো ব্যক্তির এরকম স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি বিএমআই পাওয়া গেলে তাকে জীবন যাত্রার ধরন যেমন: খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম ও বিশ্রাম ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে শরীরের ওজন আদর্শ বিএমআই নির্দেশিত ওজনের চেয়ে কম বা বেশি না হয়ে যায়। নিম্নে নির্দিষ্ট উচ্চতা অনুযায়ী নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে আদর্শ ওজন কত হওয়া উচিৎ তার একটি চার্ট প্রদান করা হলো:

উচ্চতা	পুরুষ (কেজি)	নারী (কেজি)
৪ ফুট ১০ ইঞ্চি	৪৪-৫৪	৪১-৫২
৫ ফুট	৪৭-৫৮	৪৩-৫৫
৫ ফুট ৪ ইঞ্চি	৫৩-৬৬	৪৯-৬৩
৫ ফুট ৬ ইঞ্চি	৫৬-৭০	৫৩-৬৭
৫ ফুট ৮ ইঞ্চি	৬০-৭৪	৫৬-৭১
৫ ফুট ১০ ইঞ্চি	৬৪-৭৯	৫৯-৭৫
৬ ফুট	৬৭-৮৩	৬৩-৮০

টেবিল ৪.৫: উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজন

জবঃ ভাইটাল সাইন বা অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণসমূহ পরিমাপ করা

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুল্‌স, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন): স্টেথোস্কোপ, ব্লাড প্রেসার মেশিন (এ্যানালগ এবং ডিজিটাল), ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার (এ্যানালগ এবং ডিজিটাল), স্টপ ওয়াচ, ওজন পরিমাপক যন্ত্র, মেজারিং টেপ বা উচ্চতা মাপক যন্ত্র, ময়লা ফেলার বিন, জার উইথ স্যাভলন অথবা এ্যালকোহল, কিডনী ট্রে ইত্যাদি।

জব ১ (ক): ওজন পরিমাপ করা

ধাপ-১। পরিমাপ করার আগে ওজন মেশিনটি কাজ করে কিনা বা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।
ধাপ-২। রোগী মেশিনে ওঠার আগে ওজন স্কেল জিরো বা নিউট্রাল করে নিতে হবে।
ধাপ-৩।পকেটে কোনো ভারী বস্তু যেমন চাবি, মোবাইল, ওয়ালেট থাকলে তা বের করে রাখুন।
ধাপ-৪। পায়ের জুতা, ভারী জ্যাকেট বা সোয়েটার থাকলে তা খুলে রাখুন।
ধাপ-৫। ওজন মাপার সময় রোগীকে শরীর সোজাসুজি রেখে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলুন।
ধাপ-৬। মেজারিং স্কেল অথবা ডিজিটাল স্ক্রিন স্থির হলে ওজনটি দেখুন ও তা চার্টে রেকর্ড কর।

জব ১ (খ): উচ্চতা পরিমাপ করার পদ্ধতি

ধাপ-১। উচ্চতা মাপার আগে উচ্চতা মাপক স্কেল অথবা মেশিনটি ঠিক আছে কিনা তা চেক ও কেলিব্রেটেড করে নিন
ধাপ-২। তারপর রোগীকে তার জুতা খুলতে বলুন।
ধাপ-৩।রোগীকে পিছন দিকে ফিরিয়ে ওয়ালের সাথে তার পিঠ ঠেকিয়ে নিন।
ধাপ-৪। রোগীর সন্মুখভাগ সামনা সামনি বরারর রেখে সোজা হয়ে দাড়াতে বলুন।
ধাপ-৫। এবার ভালো করে খেয়াল করে দেখুন যেন তার পায়ের গোড়ালি, পিঠ, মাথার পিছন সাইট হাইট স্কেলের ওয়ালে লেগে থাকে।
ধাপ-৬। এবার আস্তে আস্তে উচ্চতা মেশিনের সাথে লাগানো মেজারিং ডিভাইসটি একদম মাথার উপরের অংশে এডজাষ্ট করে নিন এবং আপনার আই লেভেল সোজাসুজি রেখে উচ্চতা পরিমাপ করে রেকর্ড কর।

জব ১ (গ): ওরাল মেথডে তাপমাত্রা মাপার পদ্ধতি

ধাপ-১। প্রথমেই সাবান ও পানি দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধৌত কর।
ধাপ-২। গ্লাভস পরিধান কর।
ধাপ-৩। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি একটি ট্রেতে সাজাও।
ধাপ-৪। ডিজিটাল অথবা গ্লাস থার্মোমিটারটি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
ধাপ-৫। রোগী যদি বসতে পারে তাহলে সোজা করে বসিয়ে নাও।
ধাপ-৬। রোগীকে তার মুখ খুলতে এবং জিহ্বা তুলতে বল।
ধাপ-৭। গ্লাস বা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সাবধানে ঝাঁকিয়ে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নামিয়ে নিয়ে রোগীর জিহ্বার নীচে অর্থাৎ জিভের গোড়ায় ডান বা বাম দিকে আস্তে আস্তে রাখ।
ধাপ-৮। রোগীকে তার ঠোঁট বন্ধ করতে বল এবং খেয়াল রাখো যেন থার্মোমিটারটি দাঁত দিয়ে কামড়ে না দেয়। যদি ডিজিটাল থার্মোমিটার হয় তাহলে স্টার্ট বাটন পুশ কর।'
ধাপ-৯। রিডিং কাউন্ট সম্পন্ন হলে ডিজিটাল থার্মোমিটারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপ দেওয়ার সাথে সাথে বের কর। তবে গ্লাস বা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ মিনিট অপেক্ষা কর।
ধাপ-১০। তারপর থার্মোমিটারটি বের করে তাপমাত্রা দেখ
ধাপ-১১।থার্মোমিটারটি হালকা গরম সাবান পানিতে ধৌত কর (কখনই অধিক গরম পানিতে নয়) জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে শুকনো করে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ কর।
ধাপ-১২। গ্লাভস খুলে ফেলে তা নির্ধারিতে বর্জ্য ধারকে রেখে হ্যান্ড ওয়াশ কর।
ধাপ-১৩। টেমপারেচার চার্টে তাপমাত্রা রেকর্ড কর।

জব ১ (ঘ): এক্সিলারী তাপমাত্রা নেওয়া।

ধাপ-১। প্রথমেই সাবান ও পানি দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধৌত কর।
ধাপ-২। গ্লাভস পরিধান কর।
ধাপ-৩। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি একটি ট্রেতে সাজাও।
ধাপ-৪। ডিজিটাল অথবা গ্লাস থার্মোমিটারটি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
ধাপ-৫। গ্লাস বা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সাবধানে ঝাঁকিয়ে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নামিয়ে নিয়ে বগলের নীচে থার্মোমিটারটি স্থাপন কর।
ধাপ-৬। রোগীকে বুকের সাথে হাত শক্ত করে চেপে রাখতে বলে ডিজিটাল থার্মোমিটারটি বিপ দেওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এবং গ্লাস অথবা মারকারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে তিন থেকে চার মিনিট রেখে দাও।
ধাপ-৭। নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করার পর থার্মোমিটারটি বের কর এবং সঠিক তাপমাত্রাটি দেখে নাও।
ধাপ-৮। থার্মোমিটারটি হালকা গরম সাবান পানিতে ধুয়ে (কখনই অধিক গরম পানিতে নাও)। জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে শুকনো করে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ কর।
ধাপ-৯। গ্লাভস খুলে ফেলে তা নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে রেখে হ্যান্ড ওয়াশ কর।
ধাপ-১০। টেমপারেচার চার্টে তাপমাত্রা রেকর্ড কর।

জব ১ (ঙ): হার্টবিট বা পালস পরিমাপ করার পদ্ধতি

ধাপ-১। প্রথমেই হ্যান্ড ওয়াশিং কর।
ধাপ-২। গ্লাভস পড়ার প্রয়োজন হলে তা পড়ে নাও।

ধাপ-৩। যে হাত দিয়ে হার্ট বিট ফিল করবে তার অন্য হাতে হাতঘড়ি পরে নিতে হবে।
ধাপ-৪। রোগীর পজিশনিং করে নাও। রোগীর হাতটি একটি টেবিলের উপরে রেষ্টিং অবস্থায় রাখ।
ধাপ-৫। ইন্ডেক্স ফিঙ্গার বা মাঝখানের তিন আংগুলের মাঝের আংগুলোটি ব্যবহার কর ও রোগীর কব্জিতে বুড়ো আংগুলের ২ ইঞ্চি নীচে নাড়ি অনুভব না করা অবধি মাঝারি চাপ প্রয়োগ কর।
ধাপ-৬। পুরো এক মিনিট ধরে পালস কাউন্ট কর অথবা ৩০ সেকেন্ড কাউন্ট করে ২ দিয়ে গুণ কর।
ধাপ-৭। পালস রেট রেকর্ড কর।

জব ১ (চ): রক্তচাপ পরিমাপ করা

ধাপ-১। হ্যান্ড ওয়াশ কর।
ধাপ-২। স্টেথোস্কোপের এয়ার পিচ ও ডায়াফ্রাম জীবানুমুক্ত করে নাও।
ধাপ-৩। ব্লাড প্রেসার মনিটর ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা কর।
ধাপ-৪। রোগীকে বসিয়ে অথবা শুইয়ে নাও।
ধাপ-৫। রক্তচাপ মাপার জন্য চাপবিহীন অবস্থায় রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফ-এর নিচের প্রান্ত কনুইয়ের সামনের ভাঁজের ২.৫ সে. মি. উপরে ভালোভাবে আটকাও।
ধাপ-৬। কনুইয়ের সামনে হাত দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীর অবস্থান স্থির করে তার উপর স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে নাও।
ধাপ -৭। ডায়াফ্রাম এমনভাবে চাপ দাও যেন ডায়াফ্রাম এবং ত্বকের মাঝখানে কোনো ফাঁক না থাকে।
ধাপ-৮। চাপ মাপার সময় স্টেথোস্কোপের কাপড় কিংবা কাফের ওপরে হাত না রেখে পরবর্তী কাজ কর।
ধাপ-৯। রক্ত চাপমান যন্ত্রের ঘড়ি হৃদপিন্ডের একই তলে অবস্থান করে নাও।
ধাপ-১০। এরপর রেডিয়াল ধমনী অনুভব করে ধীরে ধীরে চাপমান যন্ত্রের চাপ বাড়াতে হবে।
ধাপ-১১। রেডিয়াল পালস বন্ধ হওয়ার পর চাপ ৩০ মি. মি. উপরে নাও।
ধাপ-১২। তারপর আস্তে আস্তে চাপ কমাও। প্রতি বিটে সাধারণত ২ মি. মি. চাপ কমানো যেতে পারে।
ধাপ-১৩। এবার চাপ কমানোর সময় স্টেথোস্কোপ দিয়ে ব্রাকিয়াল ধমনীতে সৃষ্ট শব্দ মনোযোগের সঙ্গে শুনো। জেনে রাখ, চাপ কমতে শুরু করলে রক্ত চলাচলের ফলে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়। একে করটকফ শব্দ (Korotkoff sound) বলা হয়। করটকফ শব্দ ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়।
ধাপ-১৪। প্রথমে এক ধরনের যে তীক্ষ্ণ শব্দ পাওয়া যায় এটাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে কাউন্ট কর।
ধাপ-১৫। করটকফ শব্দের তীক্ষ্ণতা ধীরে ধীরে কমে আসতে আসতে এক পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে করটকফ শব্দ থেমে যায়। এই শব্দ বন্ধ হওয়ার আগে যে শব্দ শোনা যায় সেটাকেই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ হিসেবে কাউন্ট কর।
ধাপ-১৬। বিপি মেশিন খুলে ফেলে পরিমাপ করা ব্লাড প্রেসার রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ কর।
ধাপ-১৭। কাজ শেষে বিপি ইন্সট্রুমেন্ট নির্ধারিত জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখ।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। হেল্থ স্ক্রিনিং বলতে কি বুঝ?

২। হেল্থ স্ক্রিনিং-এর মাধ্যমে অনুমান করা যায় এমন চারটি রোগের নাম লিখ।

৩। হেল্থ স্ক্রিনিং-এ রক্ত ও প্রস্রাব নমুনা টেস্টের চারটি নাম উল্লেখ কর।

৪। একজন কেয়ারগিভার হেল্থ স্ক্রিনিং-এ সাধারণত কি কি বিষয়গুলো পরিমাপ করে?

৫। রেকর্ড বইতে উচ্চতা ও ওজন কোনো এককে লেখা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিএমআই কী? একজন মানুষের বিএমআই (BMI) কিভাবে নিরূপণ করা হয়?

২. শারীরিক পরীক্ষা বা ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে মৌলিক পদ্ধতিগুলো উল্লেখ কর।

রচনামুলক প্রশ্ন

১. হেল্থ স্ক্রিনিং-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. ভাইটাল সাইন কী? কেয়ারগিভারের জন্য ভাইটাল সাইন পরিমাপের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বেসিক লাইফ সাপোর্ট

Basic Life Support (BLS)

"বেসিক লাইফ সাপোর্ট (Basic Life support)" BLS নামেও পরিচিত। এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে মরণাপন্ন অবস্থায় মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়, যতক্ষণ আক্রান্ত ব্যক্তি আরও বিস্তারিত বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণ করার সুযোগ না পাচ্ছেন। এই দক্ষতাগুলো প্যারামেডিকস, নার্স এবং যারা BLS প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের থাকে, দক্ষ হাতে না করলে রোগী আরও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পরে যেতে পারে। আগের অধ্যায়ে আমরা বেসিক হেল্থ স্ক্রিনিং-এর প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছি এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা জানবো চিকিৎসা ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থাগুলো কী কী, ঐ অবস্থাগুলোতে প্রাথমিকভাবে উপস্থিত ব্যক্তির করণীয় এবং বেসিক লাইফ সাপোর্ট এক্সপার্টের করণীয় কী।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস, ইকিউপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করতে পারবো।
- বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবো।
- শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে পারবো ও শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদ্ধতি প্রদর্শন করতে পারবো।
- নাড়ি পরীক্ষা করতে পারবো।
- সঠিক নিয়মে সিপিআর (কার্ডিও পালমোনারী রিসাসিটেশন)- এর প্রাথমিক ধাপগুলো বর্ণনা ও প্রদর্শন করতে পারবো।
- চোকিং-ব্যবস্থাপনার জন্য ভিক্টিমের বয়স ও অবস্থা অনুযায়ী হাইমলেখ ম্যানুভার প্রদর্শন করতে পারবো।
- পুড়ে যাওয়া ও নাক দিয়ে রক্তপাত হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করতে পারবো।

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা মরণাপন্ন মানুষকে প্রাথমিকভাবে সেবাদান করতে পারবো। জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানবো।

৫.১ বেসিক লাইফ সাপোর্ট (Basic Life Support)

যখন একজন রোগীর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় (হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়), তখন তাদের জীবন রক্ষার্থে বেসিক লাইফ সাপোর্ট (BLS) প্রদান করা যেতে পারে। মূলত এখানে হৃদপিন্ড থেকে শরীরের চারপাশে রক্ত সরবরাহ বজায় রাখতে বুকের চাপ দেওয়া হয়, যা টিস্যু ও মস্তিষ্কের অক্সিজেন সরবরাহ বজায় রাখা নিশ্চিত করে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা অ্যাসফেক্সিয়া (মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব)-এর শিকার ব্যক্তিরা এমন জরুরি অবস্থার মধ্যে থাকে, যেখানে তাদের জীবন বাচাতে এবং তাদের স্বাস্থ্য আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য "চেইন অফ সারভাইভাল" নামক চারটি কাজের সমন্বয় প্রয়োজন হয়। এই চারটি কাজ হল (চিত্র ৫.১.ক):

১. কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট প্রতিরোধ
২. কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের অবিলম্বে সনাক্তকরণ এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা সক্রিয়করণ
৩. বেসিক লাইফ সাপোর্ট (CPR- Cardiopulmonary resuscitation and AED-Automated External defibrillator)
৪. অ্যাডভান্সড লাইফ সাপোর্ট এবং পরবর্তী সেবা

চিত্র ৫.১.ক সব বয়সের জন্য চেইন অফ সারভাইভাল। প্রতিরোধ, অবিলম্বে সনাক্তকরণ ও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা সক্রিয়করণ, প্রাথমিক সিপিআর এবং অ্যাডভান্সড লাইফ সাপোর্ট এবং পরবর্তী সেবা

৫.১.১ বেসিক লাইফ সাপোর্ট - এর গুরুত্ব (Importance of Basic Life Support)

বেসিক লাইফ সাপোর্ট (BLS) হল একটি জরুরি চিকিৎসা সেবা। যেকোনো জায়গায় একজন মরনাপন্ন ব্যক্তির জীবন বাচানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি খুবই সহায়ক হতে পারে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে BLS-এর উদ্দেশ্য ব্যক্তির 'রোগমুক্তি' করা নয় বরং জরুরি চিকিৎসা সহায়তা না আসা পর্যন্ত রোগীর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে না দেওয়া। BLS পদ্ধতিটি মূলত হৃদযন্ত্র বা শ্বাসযন্ত্রের বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্মুখীন ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে, ব্যক্তির শ্বাস এবং হৃদস্পন্দন পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। তবে পরবর্তীতে রোগীকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। BLS পদ্ধতিটি সঠিক উপায়ে প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত BLS প্রশিক্ষণের উপর প্রচুর জোর দেওয়া হয়। সঠিক উপায়ে BLS প্রদান করতে ব্যর্থ হলে রোগী ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পরতে পারে, তাই সঠিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই প্রশিক্ষণটি নেয়া জরুরি।

৫.১.২ বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রয়োজন এমন পরিস্থিতি (Situation where BLS is needed)

সাধারণত হৃদযন্ত্র বা শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রয়োজন হয়। যেমন:

- হার্ট অ্যাটাক
- করোনারি ধমনীর রোগ
- হার্ট ফেইলিউর
- হার্টের অনিয়মিত ছন্দ
- যেকোনো শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ

এছাড়া প্রয়োজন হতে পারে ইলেক্ট্রোকিউশন, প্রচুর রক্তক্ষরণ, এলার্জি প্রতিক্রিয়া, ডুবে যাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত মাদকসেবন প্রভৃতি পরিস্থিতিতে। একটি কার্ডিওপালমোনারী অ্যারেস্ট সাধারণত সতর্কতা ছাড়াই ঘটে। যদি কেউ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে থাকে, তবে সে,

- অজ্ঞান হয়ে যাবে
- প্রতিক্রিয়াহীন হবে এবং
- স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিবেনা

৫.১.৩ বেসিক লাইফ সাপোর্টের সময় প্রাথমিক পরিস্থিতি পরীক্ষা: (DR-AB)

ধাপ-১ পারিপার্শ্বিক বিপদচিহ্ন (Danger): আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থান ও স্থান এবং তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত কর। রোগীর আশেপাশের অবস্থা, রোগীর কোনো সংক্রমক রোগের চিহ্ন আছে কি না ইত্যাদি।

ধাপ-২ রোগীর প্রতিক্রিয়াশীলতা (Response): সাহায্যের জন্য আশেপাশের মানুষের কাছে আবেদন কর, রোগীকে উদ্দীপিত কর, রোগীর কাঁধে হাত দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকো। ১০ সেকেন্ডের জন্য এই লক্ষণগুলো আছে কি না লক্ষ্য কর:

- অজ্ঞান হওয়া
- প্রতিক্রিয়াহীনতা এবং
- শ্বাস-প্রশ্বাসহীনতা

চিত্র ৫.১.খ ধাপ-২

অভিজ্ঞরা ক্যারোটিড পালস পরীক্ষা করেও দেখতে পারে, তবে এটা জরুরি অবস্থায় অত্যাবশ্যক।

রোগী তোমার ডাকে সাড়া দিলে তাকে তার অবস্থানে থাকতে দাও ও তার কি সমস্যা হয়েছিল তা জানার চেষ্টা কর। প্রয়োজনে সাহায্য নাও। রোগী তোমার ডাকে সাড়া না দিলে পরবর্তী ধাপে যাও।

ধাপ-৩ রোগীর শ্বাসনালী (Airway):

এয়ারওয়ে ব্যবস্থাপনা মেরুদন্ডসহ অন্য যে কোনো আঘাতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্বাসনালীতে কিছু আছে কিনা পরীক্ষা করতে রোগীর মুখ খুলে দেখ এবং যদি থাকে তা বের করার জন্য মাথা একপাশে ঘুরিয়ে দাও। যদি কিছু বের না হয়, তাহলে রোগীর প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখার জন্য পুনরায় পরীক্ষা কর। শ্বাসনালী পর্যবেক্ষণ করার কৌশলগুলো মনে রাখতে হবে - প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে কপালে এক হাত রেখে মাথা পিছনের দিকে বা ঘাড়ের দিকে সামান্য ভাঁজ করবে ও অন্য হাত দিয়ে চিবুক সামান্য উঁচু করে ধরতে হবে, শিশুদের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে হবে।

চিত্র ৫.১.গ ধাপ-৩

ধাপ-৪ রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস (Breathing):

রোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা কর, মাথা এবং চিবুকের অবস্থান বজায় রেখে এটি কর, তোমার গাল এবং কান রোগীর মুখের উপর রাখো যেন বুক পর্যবেক্ষণ করার সময় শ্বাসযন্ত্রের যে কোনোও প্রচেষ্টা অনুভব করা যায় এবং বুকের উঠানামা দেখা যায়। ১০ সেকেন্ড ধরে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস আছে কি না তা মূল্যায়ন করা উচিত। যদি রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, কিন্তু অজ্ঞান থাকে, তাহলে রোগীকে চিত্র ৫.১.ঙ –এর ন্যায় পুনরুদ্ধার অবস্থানে (Recovery position) নিয়ে আসতে হবে।

চিত্র ৫.১.ঘ ধাপ-৪

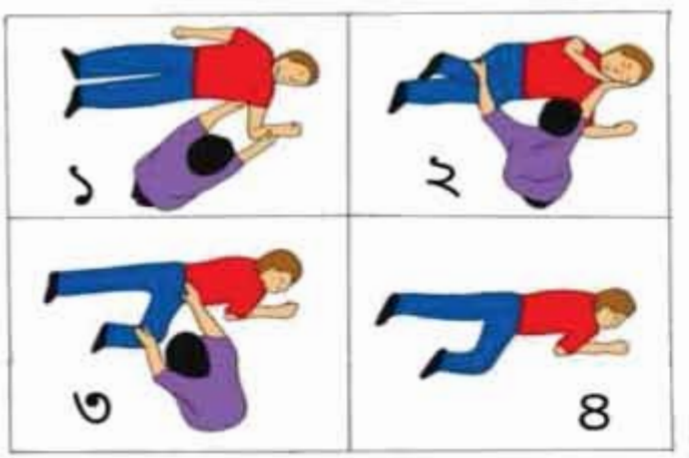

চিত্র ৫.১.ঙ: পুনরুদ্ধার অবস্থানে (Recovery position) নিয়ে আসার নিয়ম

১- ব্যক্তির হাত-পা সোজা কর। তার মাথার পাশে ডান হাতটি ভাঁজ করে রাখো।

২- ব্যক্তির বাম হাতটি তার ডান গালের নীচে রাখো।
৩- ব্যক্তির বাম পা হাঁটু বরাবর ভাঁজ কর। ব্যক্তির মাথা এবং ঘাড় সতর্কতার সাথে ধরে আলতোভাবে ভাঁজ করা হাঁটুটিকে ডানদিকে নিয়ে কাত করে শোয়াও।
৪- উপরের পা সামঞ্জস্য কর, যাতে নিতম্ব এবং হাঁটু উভয়ই ডান কোণে বাকানো থাকে। নিশ্চিত কর যে ব্যক্তিটি যেন ঘুড়ে না যায়।
যদি রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস না নেয়, তবে নিকটস্থ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা কর বা ৯৯৯ এ কল করে সাহায্যের জন্য আবেদন কর। অবিলম্বে তার উপর CPR শুরু কর।

৫.২ কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন (CPR- Cardiopulomonary resuscitation)

বেসিক লাইফ সাপোর্টের সময় প্রাথমিক পরিস্থিতি পরীক্ষার পরই যেই ধাপ তা হল, কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন। কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন শুরু করার আগে তোমার বাহু ও শরীর সঠিক অবস্থানে আনতে হবে।

৫.২.১ বুকে চাপ দিয়ে সংকোচন শুরু করার জন্য বাহু এবং শরীরের অবস্থানের নিয়ম নিচে বর্ণনা করা হল:

৮ বছরের শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য:

- ✓ তোমার দুই বাহু, কনুই ও কাঁধ সোজা কর যেন সব সমরেখায় থাকে।
- ✓ বুকের উপরে স্টার্নামের নিম্নের অংশে (চিত্র ৫.১.ক) এই অবস্থানে হাতের গোড়ালি রেখে, তার উপর আরেক হাত দিয়ে আঙ্গুলগুলো চিত্র ৫.২.ক-এর ন্যায় ইন্টারলক কর।

চিত্র ৫.২.ক: ১-৮ বছরের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের চেস্ট কম্প্রেশনের জন্য বাহু এবং শরীরের অবস্থান

১ – ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

- ✓ তোমার দুই বাহু, কনুই ও কাঁধ সোজা কর যেন সব সমরেখায় থাকে।
- ✓ বুকের উপরে স্টার্নামের নিম্নের অংশে (চিত্র ৫.২.ক ও চিত্র ৫.২.খ অনুসরণ কর) এই অবস্থানে এক হাতের গোড়ালি রাখো।

চিত্র ৫.২.খ: এক নজরে ১ বছরের ছোট শিশু, ১-৮ বছরের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের চেস্ট কম্প্রেশনের পার্থক্য

১ বছর বয়সী বা এর চেয়ে ছোট শিশুদের জন্য

- ✓ শিশুর নিপলের সাথে সংযোগকারী একটি রেখা চিত্র কল্পনা কর এবং সেই লাইনের ঠিক নীচে শিশুর স্টার্নামের উপর দুটি আঙুল রাখো।
- ✓ বুক চাপতে তোমার দুটি আঙুল ব্যবহার কর যেন শিশুর বুকের গভীরতার অন্তত ১ ইঞ্চি নিচে দেবে যায়।

৫.২.২ কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশনের নিয়ম:

৮ বছরের শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য: তুমি যদি সিপিআর-এ প্রশিক্ষিত হয়ে থাকো এবং তোমার দক্ষতা ব্যবহার করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ কর, তবে তুমি নিম্নোক্ত ধাপগুলো মেনে হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআর বা উদ্ধার নিঃশ্বাসসহ সিপিআর দিতে পারবে।

ক. হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআর

১। রোগীর পাশে হাঁটু গেড়ে বস এবং তোমার বাহু এবং শরীরের অবস্থান পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে বুকের মাঝখানে স্টার্নামের নিচের অংশের উপর রাখো।
২। তোমার শরীরের ভর ব্যবহার করে একটি অবিচলিত ছন্দে নিচের দিকে চাপ দাও, যেন রোগীর বুকের খাঁচা ৫ থেকে ৬ সেমি (২ থেকে ২.৪ ইঞ্চি) নিচে দেবে যায়। তার বুক যথাযথ অবস্থানে ফিরে যেতে দাও যেন সংকোচন ও প্রসারণের একটি সাইকেল পূর্ণ হয়।
৩। অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত বা যতক্ষণ তুমি ক্লান্ত না হচ্ছো ততক্ষণ প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার এই কম্প্রেশনগুলো পুনরাবৃত্তি কর।

খ. উদ্ধার শ্বাস (Rescue Breath) সহ সিপিআর

১। ব্যক্তির মাথাটি আলতোভাবে পিছনের দিকে কাত কর এবং ২ আঙুল দিয়ে চিবুকটি উপরে তুলো। ব্যক্তির নাকে চিমটি দিয়ে ধর যেন নাক দিয়ে বাতাস না বের হতে পারে।
২। তার মুখের উপর তোমার মুখ এমনভাবে রাখো যেন কোনো বাতাস বের হয়ে না যেতে পারে। প্রায় ১ সেকেন্ডের জন্য তাদের মুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং দৃঢ়ভাবে ফুঁ দাও। তার বুকের উঠা নামা পরীক্ষা কর। ২ টি উদ্ধার শ্বাস দাও।

৩। উপরের হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআরের নিয়মে প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার কম্প্রেশনগুলো পুনরাবৃত্তি কর। প্রতি ৩০টি কম্প্রেশনের পরে উপরের নিয়মে চিত্র ৫.২.খ – এর ন্যায় ২টি করে উদ্ধার শ্বাস দাও। বুকে ৩০টি কম্প্রেশন এবং ২টি রেসকিউ শ্বাসের চক্র চালিয়ে যাও যতক্ষণ না উন্নত জরুরি চিকিৎসা সাহায্য আসে।

চিত্র ৫.২.গ ৮ বছরের শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উদ্ধার শ্বাস

**বিশেষ দ্রষ্টব্য: অসুস্থ ব্যক্তিটির COVID-19 বা কোনো সংক্রমক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তাদের মুখে এবং নাকের উপর একটি কাপড় বা তোয়ালে রেখে একটি অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত শুধুমাত্র হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআর কর।

➢ **শিশুদের উপর সিপিআর:** শিশুদের হার্টের সমস্যার চেয়ে তাদের শ্বাসনালী এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে Rescue Breath দিয়ে শুরু করতে হয়।

ক. ১ – ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

১। শিশুর কপালে এক হাত রেখে, আলতোভাবে তাদের মাথা পিছনে কাত করে এবং চিবুকটি তুলে তার শ্বাসনালী খোল। তার মুখ এবং নাক থেকে কোনো দৃশ্যমান বাধা অপসারণ কর।

২। শিশুর নাকে চিমটি দিয়ে ধর যেন নাক দিয়ে বাতাস না বের হতে পারে। তার মুখের উপর তোমার মুখ এমনভাবে রাখো যেন কোনো বাতাস বের হয়ে না যেতে পারে। প্রায় ১ সেকেন্ডের জন্য তাদের মুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং দৃঢ়ভাবে ফুঁ দাও। তার বুকের উঠা নামা পরীক্ষা কর। প্রথমেই ৫ টি প্রাথমিক উদ্ধার শ্বাস (Rescue Breath) দাও।

৩। তোমার বাহু এবং শরীরের অবস্থান পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে বুকের মাঝখানে স্টার্নামের নিচের অংশের উপর রাখো। তোমার শরীরের ভর ব্যবহার করে একটি অবিচলিত ছন্দে নিচের দিকে চাপ দাও, যেন রোগীর বুকের খাঁচা অন্তত ২ ইঞ্চি নিচে দেবে যায়, যা বুকের ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বুকের সংকোচনের গুণমান (গভীরতা) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি এক হাত ব্যবহার করে ২ ইঞ্চি গভীরতা অর্জন করতে না পারলে ২ হাত ব্যবহার কর।

৪। উপরের হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআরের নিয়মে প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার কম্প্রেশনগুলো পুনরাবৃত্তি কর। প্রতি ৩০টি কম্প্রেশনের পরে উপরের নিয়মে চিত্র ৫.১.ট – এর ন্যায় ২টি করে উদ্ধার শ্বাস দাও। ৩০টি বুকে কম্প্রেশন এবং ২টি উদ্ধার শ্বাসের চক্র চালিয়ে যাও যতক্ষণ না উন্নত জরুরি চিকিৎসা সাহায্য আসে।

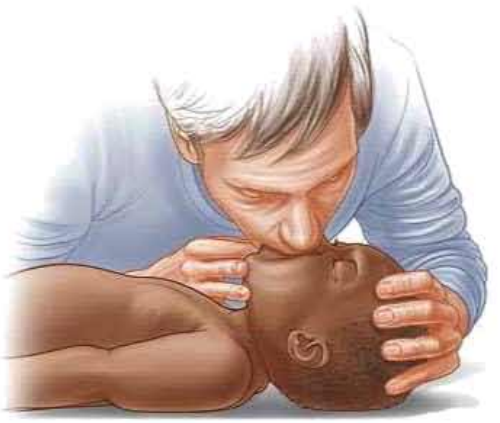

চিত্র ৫.১.ছ: ১ – ৮ বছর বয়সী শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উদ্ধার শ্বাস

খ. ১ বছরের কম বয়সী শিশু

১। শিশুর কপালে এক হাত রেখে, আলতোভাবে তাদের মাথা পিছনে কাত করে এবং চিবুকটি তুলে তার শ্বাসনালী খোল। তার মুখ এবং নাক থেকে কোনো দৃশ্যমান বাধা অপসারণ কর।

২। শিশুর নাকে চিমটি দিয়ে ধর যেন নাক দিয়ে বাতাস না বের হতে পারে। তার মুখের উপর তোমার মুখ এমনভাবে রাখো যেন কোনো বাতাস বের হয়ে না যেতে পারে। প্রায় ১ সেকেন্ডের জন্য তাদের মুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং দৃঢ়ভাবে ফুঁ দাও। তার বুকের উঠা নামা পরীক্ষা কর। প্রথমেই ৫ টি প্রাথমিক উদ্ধার শ্বাস (Rescue Breath) দাও।

৩। তোমার হাতের দুই আঙ্গুলের অবস্থান পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে বুকের মাঝখানে স্টার্নামের নিচের অংশের উপর রাখো এবং অবিচলিত ছন্দে নিচের দিকে চাপ দাও, যেন রোগীর বুকের খাঁচা অন্তত ১.৫ ইঞ্চি নিচে দেবে যায়, যা বুকের ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বুকের সংকোচনের গুণমান (গভীরতা) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি দুই আঙুলের ব্যবহার করে ১.৫ ইঞ্চি গভীরতা অর্জন করতে না পারলে ১ – ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য উল্লেখিত নিয়মে এক হাতের গোড়ালী ব্যবহার করতে পারো।

৪। উপরের হ্যান্ডস-ওনলি সিপিআরের নিয়মে প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার কম্প্রেশনগুলো পুনরাবৃত্তি কর। প্রতি ৩০টি কম্প্রেশনের পরে উপরের নিয়মে চিত্র ৫.১.ছ – এর ন্যায় ২টি করে উদ্ধার শ্বাস দাও। ৩০টি বুকে কম্প্রেশন এবং ২টি উদ্ধার শ্বাসের চক্র চালিয়ে যাও যতক্ষণ না উন্নত জরুরি চিকিৎসা সাহায্য আসে।

****বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

- মনে রাখতে হবে, শিশুদের ক্ষেত্রে প্রথমেই ৫ টি উদ্ধার শ্বাস এবং পরে ৩০টি বুকে কম্প্রেশন ও ২টি উদ্ধার শ্বাসের চক্র।
- শিশুদের উপর সিপিআরের নিয়ম অনেকাংশে তাদের ওজনের উপর নির্ভর করে।

৫.৩ চোকিং (Choking)

খাদ্য, পানীয়, নকল দাঁত অথবা দুর্ঘটনাক্রমে নাক বা মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া কোনো বস্তুর কারণে শ্বাসনালীর পথ আটকে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, যার কারণে দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে । এই অবস্থাকে চোকিং বলা হয়। বাতাস ফুসফুসে পৌঁছাতে না পারলে মৃত্যুও হতে পারে।

৫.৩.১ হেইমলিখ কৌশল (Heimlich maneuver)

হেইমলিখ কৌশল (Heimlich Maneuver) হল একজন চোকিং আক্রান্ত ব্যক্তি বা শিশুকে সাহায্য করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। এই কৌশলে পিঠে ধাক্কা (Back blow), পেটে চাপ (Abdominal thrust) এবং এক বছরের ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে বুকে চাপ (Chest thrust) দেওয়া হয়। বয়স ও বিশেষ অবস্থাভেদে হেইমলিখ কৌশল ভিন্ন। হেইমলিখ কৌশল সম্পাদন করার পূর্বে তোমাকে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে তা নির্ভর করে যে তুমি কাকে সাহায্য করছো:

- একজন ব্যক্তি যিনি গর্ভবতী না বা শিশু না
- একজন গর্ভবতী মহিলা বা স্থূলকার ব্যক্তি
- একজন শিশু যে এক বছরের কম বয়সী
- একজন শিশু যে এক বছরের বেশি বয়সী
- নিজেকে

ক. একজন ব্যক্তি যিনি গর্ভবতী না বা শিশু না

প্রথমে আক্রান্ত ব্যক্তির পেটে চাপ দেওয়ার (Abdominal thrust) প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ কর। দম বন্ধ হয়ে আসছে বলে মনে হলে, ব্যক্তিটি যদি সচেতন থাকে এবং কাশি দিতে পারে, তাহলে সে নিজেই বস্তুটিকে শ্বাসনালী থেকে বের করে দিতে সক্ষম হতে পারে। যদি ব্যক্তিটি নিম্নের অবস্থায় থাকে, তবে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু কর:

- কাশি দিতে পারছে না
- কথা বলতে বা শ্বাস নিতে অক্ষম
- সাহায্যের জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে (সাধারণত নিজের গলা হাত দিয়ে চেপে ধরে)

প্রথমত, যদি কোনো পথচারী থাকে, তাদেরকে বল জরুরি সাহায্যের জন্য স্থানীয় জরুরি ফোন নম্বরে কল করতে। তুমি যদি উপস্থিত একমাত্র ব্যক্তি হও, তবে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু কর:

১। আক্রান্ত ব্যক্তিকে দাঁড়াতে বল।

২। নিজে ব্যক্তির পিছনে গিয়ে দাঁড়াও।

৩। ব্যক্তিটিকে চিত্র ৫.৩.ক-এর ন্যায় সামনের দিকে ঝুঁকতে সাহায্য কর এবং তোমার হাতের গোড়ালি দিয়ে তার পিঠে পাঁচটি আঘাত কর (Back blow)।

৪। তার কোমরের চারপাশে তোমার এক হাত দিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধর। হাতটি দিয়ে একটি মুষ্টি তৈরি কর এবং এটি নাভির ঠিক উপরে রাখো (বৃদ্ধাঙ্গুল ভিতরের দিকে থাকে)।

৫। চিত্র ৫.৩.খ-এর ন্যায় তোমার অন্য হাতটি দিয়ে মুঠিটি ধর এবং একই সাথে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে চাপ দাও। এভাবে পর পর ৫টি চাপ (Abdominal thrust) সম্পাদন কর।

৬। বস্তুটি বের না হওয়া পর্যন্ত এই কৌশল পুনরাবৃত্তি কর এবং ব্যক্তিকে নিজে থেকে শ্বাস নিতে বা কাশি দিতে উদ্বুদ্ধ কর।

চিত্র ৫.৩.ক একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হেইমলিখ কৌশলের (Heimlich maneuver) প্রক্রিয়া

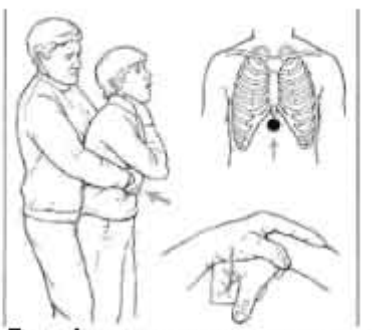

চিত্র ৫.৩.খ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হেইমলিখ কৌশলের (Heimlich maneuver) হাতের অবস্থান

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যদি ব্যক্তি উঠে দাঁড়াতে না পারে, শোয়া অবস্থায় তার কোমর ধরে একইভাবে মুষ্টি ভিতরের দিকে এবং উপরের দিকে চাপ দাও, যেভাবে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দিতে হতো।

খ. গর্ভবতী মহিলা বা স্থূলকায় ব্যক্তি

গর্ভবতী মহিলা বা স্থূলকায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, তোমার হাতটি তার খড় থেকে কিঞ্চিত উঁচুতে স্টার্নামের নিচের অংশে রেখে একইভাবে মুষ্টি ভিতরের দিকে এবং উপরের দিকে চাপ দাও। যদি সেই ব্যক্তি অজ্ঞান থাকে, তবে তাদের পিঠে রাখো এবং আঙ্গুল দিয়ে শ্বাসনালী পরিষ্কার করার চেষ্টা কর। যদি বস্তুটি সরাতে না পারো, তাহলে CPR শুরু কর।

চিত্র ৫.৩.গ একজন গর্ভবতী মহিলা বা স্থূলকায় ব্যক্তির হেইমলিখ কৌশল (Heimlich maneuver)

গ. একজন এক বছরের বেশি বয়সী শিশুর উপর

১। আক্রান্ত শিশুটিকে দাঁড়াতে বল। অথবা চিত্র ৫.৩.ঘ-এর ন্যায় তুমি একটা চেয়ারে বসে শিশুটির উচ্চতা ও ভর বিবেচনায় রেখে তাকে তোমার দুই উরুর উপর উপুড় করে নাও।

২। নিজে শিশুটির পিছনে গিয়ে শিশুর উচ্চতা বিবেচনা করে হাঁটু গেড়ে বস বা দাঁড়াও।

৩। শিশুটিকে চিত্র ৫.৩.ঘ-এর ন্যায় সামনের দিকে ঝুঁকতে সাহায্য কর এবং তোমার হাতের গোড়ালি দিয়ে তার পিঠে পাঁচটি আঘাত কর (Back blow)।

৪। তার কোমরের চারপাশে তোমার এক হাত দিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধর। হাতটি দিয়ে একটি মুষ্টি তৈরি কর এবং এটি নাভির ঠিক উপরে রাখো (বৃদ্ধাঙ্গুল ভিতরের দিকে থাকে)।

৫। চিত্র ৫.৩.খ-এর ন্যায় তোমার অন্য হাতটি দিয়ে মুঠিটি ধর এবং একই সাথে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে চাপ দাও। এভাবে পর পর ৫টি চাপ (Abdominal thrust) দাও।

৬। বস্তুটি বের না হওয়া পর্যন্ত এই কৌশল পুনরাবৃত্তি কর এবং ব্যক্তিকে নিজে থেকে শ্বাস নিতে বা কাশি দিতে উদ্বুদ্ধ কর।

ঘ. একজন এক বছরের কম বয়সী শিশুর উপর

১। চেয়ারে বস এবং চিত্র ৫.৩.ছ-এর ন্যায় তোমার উরুতে শিশুটিকে শুইয়ে নিয়ে সাবধানে তার মুখে কাছাকাছি কিছু আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখ। খেয়াল রাখবে যেন শিশুর মুখ পরীক্ষা করতে যেয়ে বস্তুটি আরো ভিতরে চলে না যায়।

২। শিশুটির উচ্চতা ও ভর বিবেচনায় রেখে চিত্র ৫.৩.ঙ বা চিত্র ৫.৩.ছ-এর ন্যায় তাকে তোমার উরুর উপর উপুড় করে নাও, যেন তার পেট হাঁটুর ভাঁজ বরাবর থাকে। তোমার বাহুর উপরে শিশুর মুখমন্ডলটি ধরে রাখো।

৩। তোমার হাতের গোড়ালি দিয়ে আলতো করে পিঠে পাঁচটি ধাক্কা দাও।

চিত্র ৫.৩.ঙ পিঠে ধাক্কা (Back blow)

৪। যদি এটি কাজ না করে, তাহলে শিশুকে উল্টিয়ে নিয়ে তোমার বাহু এবং উরু দ্বারা সাপোর্ট দিয়ে তোমার মুখোমুখি অবস্থানে নাও, যেন শিশুটির মাথা তার ট্রাঙ্কের চেয়ে নীচের অবস্থানে থাকে। তাদের স্টার্নামের নিচের অংশে রেখে দুটি আঙ্গুল রাখো এবং দ্রুত বুকে পাঁচটি চাপ দাও (চিত্র ৫.৩.চ)।

৬। এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি কর যতক্ষণ না বস্তুটি বের হয়ে যায় এবং শিশু নিজে থেকে শ্বাস নিতে পারে বা কাশি দিতে পারে।

চিত্র ৫.৩.চ বুকে চাপ (Chest thrust)

ঙ. নিজের উপর: তুমি যদি একা থাকো এবং চোকিং হয়, তবে এই পদক্ষেপগুলো অনুসরণ কর:

১। একটি মুষ্টি তৈরি কর এবং এটি তোমার নাভির ঠিক উপরে রাখো (বৃদ্ধাঙ্গুল ভিতরের দিকে থাকবে)।

২। তোমার অন্য হাত দিয়ে মুঠিটি ধর এবং একই সাথে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে চাপ দাও। এভাবে পেটে পর পর ৫টি চাপ (Abdominal thrust) দাও।

৩। এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি কর যতক্ষণ না বস্তুটি বের হয়ে যায় এবং তুমি নিজে থেকে শ্বাস নিতে বা কাশি দিতে পারো।

৪। এছাড়াও চিত্র ৫.৩.জ-এর ন্যায় তুমি টেবিলের কোণে বা চেয়ারের পিছনের মতো শক্ত কোনো প্রান্তে তোমার স্টার্নামের নিচের অংশ রেখে একই সাথে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে ধাক্কা দাও।

চিত্র ৫.৩.জ নিজের উপর হেইমলিখ কৌশলের (Heimlich maneuver) প্রক্রিয়া

৫.৪ অন্যান্য প্রাথমিক চিকিৎসা

এছাড়াও আমাদেরকে কিছু জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রায়শই যেতে হতে পারে। তার কিছু উদাহরণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিম্নে দেওয়া হল:

৫.৪.১ রক্তপাত

ক. হাত ধুয়ে ডিসপোজেবল গ্লাভস (যদি থাকে) পরে নাও। এটি তোমাকে সংক্রমক ব্যাধি থেকে রক্ষা করবে।

খ. পানি দিয়ে ক্ষত ধুয়ে ফেলো।

গ. রক্তের প্রবাহ বন্ধ করতে একটি গজ বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সরাসরি চাপ প্রয়োগ কর এবং জমাট বাধতে সাহায্য কর (যখন রক্ত স্বাভাবিকভাবেই ঘন হয়ে যায় তখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়)।

ঘ. রক্তপাত হওয়া ক্ষত অংশটি ব্যক্তির মাথার উচ্চতার উপরে উন্নীত কর।

ঙ. পেটিয়ে রাখা কাপড় ভিজে গেলে সরিয়ে ফেলবে না। প্রথম স্তরটি অপসারণ করলে জমাট বাধার প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করবে এবং এর ফলে আরও রক্তক্ষরণ বাড়বে। পরিবর্তে, প্রয়োজন হলে আরও স্তর যোগ কর।

চ. রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেলে ক্ষতস্থানে একটি পরিষ্কার ব্যান্ডেজ লাগাও।

হাসপাতলে নিয়ে যাও, যদি:

- ক্ষত গভীর হয়, ক্ষত বড় হয়
- চাপ প্রয়োগ করার পর আঘাতে রক্ত বের হয়
- আঘাত একটি পশু বা মানুষের কামড় থেকে হয়
- আঘাতটি পোড়া বা বৈদ্যুতিক আঘাত
- রক্তপাত বন্ধ না হয়

৫.৪.২ দহন বা পুড়ে যাওয়া ক্ষত

ক. পোড়ার চিকিৎসার প্রথম ধাপ হল দাহন প্রক্রিয়া বন্ধ করা। এর অর্থ হতে পারে:

- রাসায়নিক পদার্থ থাকলে তা পরিষ্কার করা
- বৈদ্যুতিক শকে পুড়লে বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ করা
- কল ছেড়ে চলমান পানি দিয়ে ক্ষতস্থান শীতল করা
- ঢেকে রাখা বা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সূর্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া

খ. পোড়া জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা: অতিরিক্ত পোড়ার জন্য জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন। জরুরি নয় এমন পোড়ার জন্য, তুমি এই প্রাথমিক চিকিৎসার পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারো:

- কয়েক মিনিটের জন্য ঠান্ডা চলমান পানি দিয়ে পোড়া জায়গাটি ধুয়ে ফেলো। বরফ ব্যবহার করবে না।
- একটি হালকা গজ ব্যান্ডেজ আলতো করে ক্ষতের উপর দিয়ে দাও। যদি পোড়া সামান্য হয়, এটি ঢেকে দেওয়ার আগে পোড়ার মলম লাগাতে পারো।
- প্রয়োজন হলে ব্যথা উপশমের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথা উপশমের ওষুধ দিবে।
- কোনো ফোস্কা হলে তা ফুটা করবে না।

৫.৪.৩ নাক দিয়ে রক্তপাত: নাক দিয়ে রক্তপাতের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল ট্রমা। রক্তাক্ত নাকের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে:শুষ্ক বা গরম বাতাস, উচ্চ উচ্চতা, রাসায়নিক ধোঁয়া, সর্দি এবং এলার্জি, নাকে ট্রমা, বিচ্যুত সেপ্টাম (বাকা নাকের তরুণাস্থি), অনুনাসিক পলিপ বা নাকের টিউমার, রক্তপাতের ব্যাধি (যেমন, হিমোফিলিয়া এবং লিউকেমিয়া), উচ্চ রক্তচাপ, গর্ভাবস্থা, অনুনাসিক স্প্রে, ডিকনজেস্ট্যান্ট এবং অ্যান্টিহিস্টামিনের ঘন ঘন ব্যবহার, NSAIDs, রক্ত পাতলাকারী (যেমন ওয়ারফারিন), কোকেন এবং অন্যান্য ওষুধ। এই জিনিসগুলোর মধ্যে অনেকগুলো তোমার নাকের সূক্ষ্ম ঝিল্লি শুকিয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যার ফলে সেগুলো খসখসে হয়ে যায় এবং ফেটে যায়।

তোমার নাক দিয়ে রক্তপাত হলে:

- একটু সামনে ঝুঁকো, পিছনে না।
- নাকের ব্রিজের ঠিক নীচে নাক চাপ দিয়ে ধরো।
- পাঁচ মিনিট পর দেখে নাও যে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে কিনা। যদি না হয়, নাক চাপ দিয়ে ধরে থাকো এবং আরও ১০ মিনিট পরীক্ষা কর।
- নাকের ব্রিজে একটি ঠান্ডা প্যাক প্রয়োগ কর।

উন্নত চিকিৎসা নিতে হবে যদি:

- ঘন ঘন নাক দিয়ে রক্তপাত হয়
- রক্ত সল্পতার লক্ষণ থাকে (যেমন, দুর্বলতা, অজ্ঞানতা, ক্লান্তি এবং ফ্যাকাশে ত্বক)
- রক্ত পাতলা করার ওষুধ সেবন করলে
- রক্ত জমাট বাধা বা রক্তপাতের ব্যাধি থাকলে
- অস্বাভাবিক ক্ষত থাকলে; প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে
- শ্বাস নিতে কষ্ট হলে
- মাথায় গুরুতর আঘাত পেলে

জব-১: ৮ বছরের শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক / ১ – ৮ বছর বয়সী শিশুদের / ১ বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন (CPR- Cardiopulmonary resuscitation)

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৩	হ্যান্ড গ্লোভ্স	রাবারের তৈরি	০১ জোড়া

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন): জব অনুযায়ী যদি প্রয়োজন হয়।

কাজের ধারা

ধাপ-১ পারিপার্শ্বিক বিপদচিহ্ন **(Danger)** লক্ষ্য কর। আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থান ও স্থান এবং তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত কর।

ধাপ-২ রোগীর প্রতিক্রিয়াশীলতা **(Response)** নিশ্চিত কর। রোগী তোমার ডাকে সাড়া দিলে তাকে তার অবস্থানে থাকতে দাও ও তার কি সমস্যা হয়েছিল তা জানার চেষ্ট কর। প্রয়োজনে সাহায্য নাও। রোগী তোমার ডাকে সাড়া না দিলে পরবর্তী ধাপে যাও।

ধাপ-৩ রোগীর শ্বাসনালী **(Airway)** পর্যবেক্ষণ কর। শ্বাসনালীতে কিছু আছে কিনা পরীক্ষা করতে রোগীর মুখ খুলে দেখ এবং যদি থাকে তা বের করার জন্য মাথা একপাশে ঘুরিয়ে দাও। যদি কিছু বের না হয়, তাহলে রোগীর প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখার জন্য পুনরায় পরীক্ষা কর।

ধাপ-৪ রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস **(Breathing)** পরীক্ষা কর।

ধাপ-৫ রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ভালো থাকলে তাকে পুনরউদ্ধার অবস্থানে (Recovery position) নিয়ে আসো। যদি রোগী শ্বাস-প্রশ্বাস না নেয়, তবে নিকটস্থ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা কর, বা ৯৯৯ এ কল করে সাহায্যের জন্য আবেদন কর। অবিলম্বে তার উপর CPR শুরু কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: প্রশিক্ষণার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়কেবার অনুসরণ করে মলি প্রিপারশন পদ্ধতি ও খাবার পরবিশেন দেখাতে পারবে।
ফলাফল বিশ্লেষণ ও মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব-২: প্রাপ্তবয়স্ক / ১ বছরের বেশি বয়সী শিশু / ১ বছরের কম বয়সী শিশু / গর্ভবতী মহিলার জন্য চোকিং-এর প্রাথমিক চিকিৎসা

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বিএলএস এর মানে কী?
২। একজন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সিপিআরের সঠিক অনুপাত কী?
৩। প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য বুকের সংকোচনের সঠিক হার কত?
৪। একটি শিশুর বুকে কম্প্রেশনের জন্য অবস্থান কি হবে?
৫। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বুকের সংকোচনের সঠিক গভীরতা কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কিভাবে শিশুদের উদ্ধারের শ্বাস দেওয়া হয়?
২। ১ বছরের ছোট শিশু, ১-৮ বছরের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের চেস্ট কম্প্রেশনের পার্থক্য কি?
৩। DR-AB বলতে কি বুঝো?
৪। চেইন অফ সারভাইভালো বলতে কি বুঝো?
৫। কোনো কোনো অবস্থায় চোকিং-এর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রিকভারী পজিশন সম্পর্কে লিখ।
২। নাক দিয়ে রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা উল্লেখ কর।
৩। একজন এক বছরের কম বয়সী শিশুর উপর হেইমলিখ কৌশল (Heimlich maneuver) লিখ।
৪। টিকা: সিপিআর
৫। টিকা: DR-AB

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

Patient Care Technique-1

দ্বিতীয় পত্র

দশম শ্রেণি

২০২৩

প্রথম অধ্যায়

খাদ্য ও পুষ্টির প্রাথমিক ধারণার প্রয়োগ

Application of basic concepts of food and nutrition

খাদ্য এবং পুষ্টি হল মানবদেহের জন্য জ্বালানী দ্রব্যের সমতুল্য, যা আমাদের শরীরে শক্তি সরবরাহ করে। প্রতিদিন সঠিক খাদ্য গ্রহণ এবং সুষম পুষ্টির কার্যকর ব্যবস্থাপনা সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে আছে স্নেহ, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং পানি। পুষ্টি এবং খাদ্যের সঠিক সমন্বয় দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা, রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে, প্রতিদিনের শক্তি যোগায় এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও সহায়তা করে। স্বাস্থ্য অনেকাংশে পুষ্টির উপর নির্ভর করে এবং পুষ্টি খাদ্য গ্রহণের উপর নির্ভর করে। এই অধ্যায়ে আমরা শিখবো কেন খাদ্য অপরিহার্য ও এর প্রয়োজনীয়তা, পুষ্টি কি, পুষ্টির উৎস ও তাদের কার্যাবলি এবং মানবদেহের ভিন্নতা অনুযায়ী খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয় পরিমাণ। আরও জানবো খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য পরিকল্পনা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- খাদ্যের প্রকারভেদ উদাহরণসহ উল্লেখ করতে পারবো।
- দৈনন্দিন সুষম খাদ্যের তালিকার পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবো।
- পুষ্টির প্রকারভেদ ও তার উৎস চিহ্নিত করতে পারবো।
- বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবো।
- অপুষ্টির কারণ চিহ্নিত করতে পারবো।

- অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারবো।
- ক্লায়েন্টের খাবার তালিকা অনুযায়ী খাবার বাছাই করতে পারবো।
- বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তির খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবো।
- খাদ্য নিরাপত্তার মূলনীতি সমূহ বর্ণনা করতে পারবো।
- খাদ্য প্রস্তুতের সময় স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে পারবো।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি মেনে চলার উপায় বর্ণনা করতে পারবো।

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান, খাদ্য নিরাপত্তার নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য তৈরির সময় স্বাস্থ্যবিধি খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি নিরূপন করতে পারব। জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

১.১ খাদ্য (Food)

খাদ্য হল তরল, অর্ধতরল বা কঠিন যেকোনো কিছু, যা পুষ্টি এবং শক্তি ধারণ করে এবং যা খাওয়া হলে শরীরে পুষ্টি যোগায়। খাদ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ রয়েছে যা চলাফেরা, চিন্তাশক্তি, দৈনন্দিন জীবনের কাজ ও আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ অব্যাহত রাখতে, আমাদের সুস্থ রাখতে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। যখন আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, তখন আমাদের শরীরে রক্তে দরকারী পুষ্টি শোষণ করে এবং সেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণ করে। সুতরাং, যে কোনো দ্রব্যকে খাদ্য বলতে হলে তার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তা হলো খাওয়ার যোগ্য হতে হবে এবং তা শরীরে পুষ্টি যোগাবে।

১.১.১ খাদ্যের প্রকারভেদ

খাদ্যের গ্রুপ, উৎস এবং কাজ অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। নিম্নের সারণী থেকে আমরা খাদ্যের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে জানব।

শক্তি প্রদানকারী খাবার (কার্বোহাইড্রেট/শর্করা এবং লিপিড/স্নেহ)

আমাদের প্রতিদিনের কাজ যেমন চলাফেরা, পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া, ঘরে বা বাইরে কাজ করার জন্য শক্তি প্রয়োজন। আমরা যা খাই, তা থেকে এই শক্তি পাই। এমনকি আমরা যখন বিশ্রাম করি তখনও শক্তির প্রয়োজন আছে। বলতে পারবে কি এমনটা কেন? আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্বদা কাজ করে, যেমন, হৃৎপিন্ড রক্ত পাম্প করছে, পাকস্থলী খাবার হজম করছে, ফুসফুস শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ইত্যাদি। এই সমস্ত অঙ্গগুলোর নিজ নিজ কাজের জন্য শক্তি প্রয়োজন, আর খাদ্য সেই শক্তি জোগায়।

কার্বোহাইড্রেট/শর্করা

শস্যদানা	মাটির নিচের সব্জী	ফল
সাদা চাল, ঢেঁকিছাটা চাল, চালের আটা, ঢেঁকিছাটা গমের আটা ও ময়দা (বাদামী), সাদা গমের আটা ও ময়দা, ভুট্টার তৈরি খাবার	আলু মিষ্টি আলু কুমড়া	কলা আম কাঁঠাল

লিপিড/স্নেহ	
স্যাচুরেটেড	আনস্যাচুরেটেড
প্রাণী উৎস: ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (মাখন, পনির, টক দই, দই), প্রাণীর (গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী,) চর্বি, মগজ, মাছের তেল উদ্ভিদ উৎস: বাদামের মাখন, নারকেল	উদ্ভিদ উৎস: সূর্যমুখী তেল, সয়াবিন, ভুট্টার তেল, তিলের তেল, বাদামের তেল, জলপাই-এর তেল, পাম তেল

চিত্র ১.১: শক্তি প্রদানকারী খাবার

শরীর গঠনকারী খাবার (প্রোটিন)

তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছো কিভাবে একটি ছোট শিশু বড় হয়? আমাদের শরীর হাজার হাজার ছোট কোষ দ্বারা গঠিত। শরীরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য কোষ বিভাজন হয় এবং নতুন কোষ তৈরি হয়। নতুন কোষ গঠনের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। আমাদের জীবদ্দশায় কিছু কোষ মারাও যেতে পারে বা আঘাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই কোষগুলো প্রতিস্থাপনের কাজ খাদ্যের মাধ্যমেই হয়।

প্রাণী উৎস	উদ্ভিদ উৎস:
গৃহপালিত পশু: গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগির মাংস ও কলিজা; বিভিন্ন ধরনের মাছ, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (মাখন, পনির, টক দই, দই)	শস্যদানা: বিভিন্ন ধরনের ডাল, ছোলা, মটরশুটি, সীমের বিচি, সয়াবিন; প্রক্রিয়াজাত সয়া পণ্য: সয়া দুধ, সয়া মরদা; বাদাম এবং বীজ: বিভিন্ন ধরনের বাদাম, তিল

চিত্র ১.২: শরীর গঠনকারী খাবার

প্রতিরক্ষামূলক খাবার (ভিটামিন ও মিনারেলস/খনিজ পদার্থ)

শরীরের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৬০ ফারেনহাইট। একইভাবে, হৃদস্পন্দনও ৬০ থেকে ১০০ বীট/মিনিটে বজায় রাখতে হয়। শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ নিয়মিত নির্গমন নিশ্চিত করতে হয়। তা না হলে কোষ্ঠকাঠিন্য সহ অন্যান্য জটিলতা শরীরে বাসা বাধে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া আমাদের গ্রহণ করা খাবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা সারাদিন যে খাবার খাই তা আমাদের রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি দেয়।

সবজি	ফল
সবুজ শাক-সবজি: পুঁই শাক, পালং শাক, কুমড়া পাতা, ব্রকলি, লেটুস, সবুজ মটরশুটি, সবুজ মরিচ লাল এবং কমলা সবজি: গাজর, কুমড়া, লাল মরিচ, মিষ্টি আলু, টমেটো অন্যান্য সবজি: অপরিশত ভুট্টা, বীটের শিকড়, বাধাকপি, বেগুন, শসা, ফুলকপি, মাশরুম, পেঁয়াজ	কলা, আনারস, পেঁপে, আম, জাম, পেয়ারা, কমলা, কাঁঠাল, জামরুল, লেবু, আপেল, কেল, অ্যাভোকাডো, তরমুজ, আঙ্গুর, ডেঁতুল, বেরি ইত্যাদি।

চিত্র ১.৩: প্রতিরক্ষামূলক খাবার

১.১.২ সুষম খাদ্যতালিকা ও তার প্রয়োজনীয়তা (Balanced diet and it's importance)

সুষম খাদ্যতালিকা হল এমন তালিকা যেখানে শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, পানি এবং আঁশজাতীয় খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সঠিক অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত করে সমস্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকবে। সুষম খাদ্য হল, যেই খাদ্যে সকল পুষ্টি উপাদান থাকে তা যেমন: দুধ। এই জাতীয় খাদ্য সুস্বাস্থ্যের প্রচার ও সংরক্ষণে সহায়তা করে। সুষম খাদ্য একজন ব্যক্তির জন্য রিকমেন্ডেড ডায়াটারী অ্যালাওএন্স (Recommended Dietary Allowances – RDA) পূরণ করে। RDA হল, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত প্রতিদিন পুষ্টির (বা ক্যালোরি) আনুমানিক পরিমাণ। নতুন জ্ঞান প্রতিফলিত করার জন্য RDA পর্যায়ক্রমে আপডেট করা হয়।

সুষম খাদ্যের উপকারিতা

- স্বাস্থ্যকর খাবার শরীরে শক্তি সরবরাহ করে, শরীরের কার্যকারিতা উন্নত করে, ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে এবং অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি রোধ করে।
- পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। বৈচিত্র্যময়, সুষম খাদ্য পুষ্টির ঘাটতি এড়াতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। স্বাস্থ্যকর খাবার ডায়াবেটিস, ক্যান্সার এবং হৃদরোগের মতো রোগের ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে পারে।
- বিশেষ ডায়েট অনুসরণ করলে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসা পদ্ধতি ভালোভাবে পরিচালনা করা যায়।
- স্বাস্থ্যকর খাদ্য মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করে এবং স্ট্রেস দূর করতে সহায়তা করবে।
- অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তি খাবার। পুষ্টি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, এটি ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক সহজতর করতে সাহায্য করে।
- চর্বিহীন মাংস এবং স্কিম দুগ্ধজাত পণ্য বেশি ব্যবহার করা উচিত। চর্বি বাদাম, বীজ, মাছ, জলপাই আকারে ভালো যখন তারা অন্যান্য পুষ্টির সাথে থাকে। রান্না করার সময় কিছু পরিমাণ চর্বি শরীরকে চর্বি-দ্রবণীয় ভিটামিন শোষণ করতে সাহায্য করে।

চিত্র ১.৪: সুষম খাদ্যের পিরামিড

১.২ পুষ্টি (Nutrition)

পুষ্টি বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যখন আমরা যা খাই তা শরীরের সমস্ত শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করার জন্য প্রস্তাবিত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। এটি মানুষের বয়স, শরীরবৃত্তীয় অবস্থা, শারীরিক কার্যকলাপের সক্ষমতা এবং লিঙ্গের উপর নির্ভর করে। আমাদের জীবনচক্রে প্রাক-গর্ভধারণ, গর্ভধারণ, গর্ভাবস্থা, শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন, সর্বদা পুষ্টিকর খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিকর খাদ্য একজন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনশীল করে তোলে এবং জীবনের মান উন্নত করে।

ভালো পুষ্টি মানে:

- সঠিক খাবার খাওয়া।
- সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া।

- সঠিক গুণমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত করে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করা।
- সঠিক উপায়ে এবং সঠিক জায়গায় সঠিক নিয়মে খাদ্য প্রস্তুত করা।

১.২.১ পুষ্টি উপাদান, উৎস ও গুরুত্ব (Nutrients and source and importance)

পুষ্টি উপাদান (Nutrients): পুষ্টি উপাদান হল খাবারে থাকা পদার্থ যা শরীরকে পুষ্ট করে। সাধারণ স্বাস্থ্য এবং শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখার জন্য এগুলো প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ: শক্তি সরবরাহ করা, শরীরের গঠন তৈরি করা, শরীরকে উষ্ণ রাখা, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা, যা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

প্রকারভেদ (Classification): খাদ্যের পুষ্টি উপাদানকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস এবং পানি।

চিত্র ১.৫: পুষ্টি উপাদানের প্রকারভেদ

১) ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস (Macronutrients)

এগুলো বেশি পরিমাণে প্রয়োজন:
ক. কার্বোহাইড্রেট/শর্করা
খ. প্রোটিন/আমিষ
গ. লিপিড/স্নেহ/তেল

ক. কার্বোহাইড্রেট/শর্করা (Carbohydrates): কার্বোহাইড্রেট/শর্করা শক্তির প্রাথমিক উৎস। এর মধ্যে রয়েছে স্টার্চ, ফাইবার/আঁশযুক্ত খাবার এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার। মিষ্টি খাবার যেমন চিনি, জ্যাম, কেক এবং চিনিযুক্ত পানীয়গুলো কার্বোহাইড্রেটের উৎস, তবে এগুলো ন্যূনতমভাবে খাওয়া উচিত। কারণ এগুলো অন্য কোনোও পুষ্টি সরবরাহ করে না এবং অতিরিক্ত ওজনের ঝুঁকি বাড়ায়।

(i) উপলব্ধ কার্বোহাইড্রেট (Available Carbohydrates): শর্করা স্টার্চ হিসাবে প্রচুর পরিমাণে শস্য, শিম, ডাল এবং আলুতে উপস্থিত থাকে। এগুলো চিনি, গুড়, ফল, মধু এবং দুধে সাধারণ কার্বোহাইড্রেট হিসাবে উপস্থিত থাকে। স্টার্চ এবং শর্করা সহজে হজম হয় এবং শরীরে শক্তি যোগায়।

(ii) অনুপলব্ধ কার্বোহাইড্রেট বা আঁশজাতীয় শর্করা (Unavailable Carbohydrates / Dietary fibers): এগুলো সেলুলোজ এবং হেমিসেলুলোজ আকারে উপস্থিত থাকে যা আমাদের শরীরে হজম হয় না। আঁশজাতীয় শর্করা শরীরের তৃপ্তির অনুভূতি বাড়িয়ে অতিরিক্ত খাওয়া প্রতিরোধ করে। আঁশজাতীয় শর্করা সমৃদ্ধ খাবার কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে রক্ষা করে। আঁশজাতীয় শর্করা শরীরের চিনি এবং কোলেস্টেরলের শোষণকে ধীর করে দিতে পারে, যা শরীরকে হার্ট ডিজিজস বা হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা করে। আঁশজাতীয় শর্করা প্রধান উৎস হল সম্পূর্ণ শস্য, উদাহরণস্বরূপ: ওটস, ভুসি ইত্যাদি সবজি, উদাহরণস্বরূপ: বাধাকপি, কুমড়া পাতা ইত্যাদি, মটরশুটি, মটর ইত্যাদি এবং আম, কমলা এবং আনারসের মতো ফল।

- **কার্বোহাইড্রেটের কাজ:**
  - কার্বোহাইড্রেট শক্তি যোগায়।
  - কার্বোহাইড্রেট শরীরের গঠনের জন্য অতিরিক্ত প্রোটিন তৈরি করে।
  - আঁশজাতীয় শর্করা মলের পরিমাণ বাড়ায় এবং মলত্যাগে সাহায্য করে।

**১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ৪ কিলোক্যালরি শক্তি দেয়।

- **কার্বোহাইড্রেটের খাদ্য উৎস:**
  - খাদ্যশস্য - গম, চাল, ভুট্টা ইত্যাদি
  - ডাল- রাজমা, ছানা, ডাল
  - শিকড় এবং কন্দ - আলু, মিষ্টি আলু, বিটরুট
  - চিনি, গুড়
- **শরীরে কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা:** শরীরে কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা কার্বোহাইড্রেটের বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক কার্যকলাপের সক্ষমতা এবং শরীরবৃত্তীয় অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। শরীরের প্রতিদিন মোট শক্তি/ক্যালোরি প্রয়োজন ২০০০ থেকে ৩০০০ কিলোক্যালরি (kcal), তার মধ্যে প্রায় ৪৫% থেকে ৬৫% আমরা পেয়ে থাকি কার্বোহাইড্রেট থেকে। এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট শরীরে চার কিলোক্যালরি শক্তি সরবরাহ করে।

খ. প্রোটিন/আমিষ (Proteins): প্রোটিন হল শরীর গঠনকারী খাবার। এটা বৃদ্ধি ও বিকাশ, দেহের কোষ-কলাগুলোর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, বিপাকীয় ও পাচক এনজাইম ও নির্দিষ্ট হরমোনের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড নামে পরিচিত ছোট ছোট একক দ্বারা গঠিত। সব মিলিয়ে ২২টি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, যার মধ্যে ৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, যা আমাদের শরীর তৈরি করতে পারে না, তাই খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। এগুলোকে ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। বাকি অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরের অভ্যন্তরে তৈরি হয়, যা নন- ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড বলে।

** ১ গ্রাম প্রোটিন ৪ কিলোক্যালরি শক্তি দেয়।

- **প্রোটিনের কাজ:**
  - টিস্যুসমূহের বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের জন্য প্রয়োজন।
  - এনজাইম, হরমোন, অ্যান্টিবডি, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়।
  - রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে
  - প্রয়োজনে শক্তি সরবরাহ করে

**প্রোটিনের অভাবজনিত রোগের নাম প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, যার মধ্যে আছে কোয়াশিওরকর এবং ম্যারাসমাস। নিচের ছবিতে এদের নমুনা দেখানো হল:

চিত্র ১.৬: প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন

➢ **উৎস:**

- মাংস, মুরগি, মাছ, ডিম
- দুধ, পনির, পনির, দই
- সয়াবিন, মটর, ডাল,
- সিরিয়াল, বাদাম এবং তৈলবীজ যেমন তিল, চীনাবাদাম ইত্যাদি।

***বিশেষ বৈশিষ্ট্য**

(i) পশুর প্রোটিন, অর্থাৎ, মাংস, ডিম, দুধ, ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনগুলো উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে, যেমন, ডাল, সিরিয়াল ইত্যাদি থেকে ভালো, এর কারণ হল উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে পাওয়া প্রোটিনে সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না।

(ii) প্রতিটি খাবারে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের দুই বা ততোধিক উৎস অন্তর্ভুক্ত করলে প্রোটিনের গুণমান উন্নত হয়।

➢ **শরীরে প্রোটিনের চাহিদা**

প্রতিদিন প্রোটিন গ্রহণের প্রস্তাবিত পরিমাণ হল শরীরের ওজনের প্রতি কিলোগ্রামে প্রায় ১ গ্রাম। উদাহরণ: একজন ব্যক্তির যদি ৬০ কিলোগ্রাম হয়, তাহলে তার প্রতিদিন ৬০ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হবে। এটি একটি ডিম বা একটি ডিমের আকারের এক টুকরো মাংসের সমান। শিশু, কিশোরী এবং গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রোটিনের চাহিদা নীচে দেওয়া হল:

- শিশু: ৩০ - ৫০ গ্রাম
- কিশোর: ৬০ - ৭৫ গ্রাম
- প্রাপ্তবয়স্ক: ৬০-৭০ গ্রাম
- গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা: ৯০ গ্রাম

***দ্রষ্টব্য:** যখন শরীর তার শক্তির চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত কার্বোহাইড্রেট বা চর্বি পায় না, তখন এই ক্যালোরি সরবরাহ করে শরীরে জমে থাকা প্রোটিন। যখন প্রোটিন শক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তারা তাদের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর জন্য উপলব্ধ হয় না।

গ. লিপিড/স্নেহ/তেল (Lipid/fat): লিপিড নামেও পরিচিত চর্বি এবং তেল প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয় উৎস থেকে প্রাপ্ত। চর্বি শক্তি জোগায়, শরীরের কোষ তৈরি করে, শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তা করে, শরীরের ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করে এবং ফ্যাট সলিউবল দ্রবণীয় ভিটামিন এ, ডি, ই, এবং কে এর শোষণ ও কাজ সহজতর করে। রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে, ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোকে স্যাচুরেটেড এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি

অ্যাসিডে তাপ করা হয়। সাধারণত স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত লিপিডগুলো ঘরের তাপমাত্রায় শক্ত থাকে এবং এর মধ্যে আছে প্রাণীর চর্বি (মাখন, ঘি) এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তেল (পাম, নারকেল)। স্যাচুরেটেড ফ্যাট হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে ঘরের তাপমাত্রায় তরল থাকে। এর মধ্যে রয়েছে মনোস্যাচুরেটেড এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যা সূর্যমুখী, ভুট্টা, সয়াবিন এবং জলপাই তেলের মতো উদ্ভিজ্জ তেলে পাওয়া যায়। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

**১ গ্রাম চর্বি ৯ কিলোক্যালরি শক্তি দেয়।

➢ স্নেহজাতীয় খাবারের কাজ:

- শক্তির কেন্দ্রীভূত উৎস প্রদান কর
- শক্তির জন্য প্রোটিনের ব্যবহার কমিয়ে দাও
- চর্বি দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E, K) শরীরে বহন করে এবং এই ভিটামিনগুলোকে শোষণে সাহায্য করে
- শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ত্বকের নিচের চর্বির স্তর শরীরের তাপ সংরক্ষণে সাহায্য করে
- নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর জন্য একটি কুশন হিসাবে কাজ কর
- টিস্যুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

উৎস: রান্নার তেল, ঘি, মাখন; তৈলবীজ, বাদাম; মাংস, মুরগি, মাছ, ডিম; পুরো দুধ, পনির

**বিশেষ বৈশিষ্ট্য: (i) চর্বি টেক্সচার উন্নত করে সেইসাথে শোষণ করে এবং স্বাদ ধরে রাখা যা খাবারকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। (ii) চর্বিগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা পেটে বেশিক্ষণ থাকতে পারে এবং ক্ষুধামন্দার অনুভূতি দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করে।

➢ শরীরে লিপিডের চাহিদা: লিপিড শরীরে উচ্চ পরিমাণে শক্তি সরবরাহ করে; ১ গ্রাম চর্বি ৯ কিলোক্যালরি উৎপন্ন করে। তেল দৈনিক গ্রহণকৃত মোট কিলোক্যালরির ৩০% এর বেশি হওয়া উচিত নয়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণের পরিমাণ প্রতিদিন মোট চর্বি খাওয়ার ১০% বা তার কম হওয়া উচিত। কোলেস্টেরল গ্রহণ ৩০০ মিলিগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়।

২) মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস (Micronutrients): এগুলো শরীরে অল্প পরিমাণে প্রয়োজন এবং এর মধ্যে আছে: ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ।

চিত্র ১.৭: একনজরে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসের খাদ্য উৎস

ক. ভিটামিন (Vitamins): ভিটামিন হল জৈব যৌগ যা দেহে নির্দিষ্ট বিপাকীয় কার্য সম্পাদন করে। ভিটামিনের দুটি রূপ আছে:

- **ফ্যাট সলিউবল (চর্বিতে দ্রবণীয়) ভিটামিন (Fat soluble vitamin):** এগুলো শরীরে সঞ্চিত হয়। এর মধ্যে আছে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে। ফ্যাট-সলিউবল ভিটামিন শরীরের টিস্যু এবং তাদের কাজের বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়; উদাহরণস্বরূপ: চোখ (ভিটামিন এ), হাড় (ভিটামিন ডি), পেশী এবং রক্ত জমাট বাধা (ভিটামিন কে), কোষের সুরক্ষা (ভিটামিন ই), এনজাইমগুলোর সংশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির শোষণ। ফ্যাট-সলিউবল ভিটামিনের উৎসগুলোর মধ্যে আছে গাজর, টমেটো, লিভার, কিডনি, হার্ট, দুধ এবং দুধের পণ্য এবং শাক।
- **ওয়াটার সলিউবল (পানিতে দ্রবণীয়) ভিটামিন (Water soluble vitamin):** এগুলো শরীরে সংরক্ষণ হয় না। এর মধ্যে আছে ভিটামিন সি (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড) এবং বি কমপ্লেক্স গ্রুপ। তাদের কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শক্তি উৎপাদন করা, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের মেটিবলিজমে সাহায্য করে এবং লোহিত রক্ত কণিকা সংশ্লেষণ করে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের উৎসের মধ্যে আছে ফলমূল, রঙীন শাক-সবজি, শস্যদানা, মাংস, মাছ, হাঁস-মুরগি এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যশস্য। সাইট্রাস ফল ভিটামিন সি-এর ভালো উৎস।

ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা

- পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন শরীরে জমা হয় না এবং প্রতিদিন খেতে হয়।
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো যকৃতে সঞ্চিত থাকে এবং প্রতিদিন গ্রহণ করতে হয় না, এই ভিটামিনগুলোর অত্যধিক গ্রহণ বিষাক্ত

সারণী ২: শরীরের সঠিক কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং তাদের উৎস

পুষ্টি উপাদান	খাদ্যের উৎস	কার্যকারীতা	অভাবজনিত রোগ
ওয়াটার সলিউবল (পানিতে দ্রবণীয়) ভিটামিন			
ভিটামিন বি১ (থায়ামিন)	সম্পূর্ণ শস্যের খাদ্যশস্য যেমন ভুট্টা, মরিচ, ডাল এবং তৈলবীজ, মাছ, কলিজা, দুধ এবং ডিম	• শরীরের জন্য শক্তি উৎপাদন করা, • রুচি বাড়ায় • এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপে সাহায্য করা।	• শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিতে বাধা; দুর্বল পেশী • দুর্বল স্নায়ু • বিষণ্নতা, বিরক্তি • বেরিবেরি

ভিটামিন বি$_2$ (রিবোফ্লাভিন)	মাছ, কলিজা, দুধ, মাংস এবং ডিম, গোটা শস্যের সিরিয়াল, ডাল	শক্তি উৎপাদনে অবদান রাখা	• দৈহিক বৃদ্ধিতে বাধা • ডার্মাটাইটিস; কনজেক্টিভাইটিস; কালশিটে ঠোঁট; জিহ্বার ইনফেকশন
ভিটামিন বি৩ (নিয়াসিন)	মাছ, মাংস, ডিম, গোটা শস্যের সিরিয়াল	• শরীরের জন্য শক্তি উৎপাদন করা, রুচি বাড়ায়, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপে সাহায্য করা।	**পেলাগ্রা:** • ডার্মাটাইটিস • ডিমেনশিয়া • ডায়রিয়া
ভিটামিন বি$_6$ (পাইরিডক্সিন)	ডাল, গাঢ় সবুজ শাক সবজি, গোটা শস্য, বাদাম এবং বীজ, বাধাকপি, কলা, কলিজা, মুরগির মাংস, মাছ, আলু, পানি, তরমুজ, সূর্যের ফুলের বীজ)	• চর্বি এবং প্রোটিনের বিপাক এবং শোষণকে সহজ করে, • লোহিত রক্তকণিকা গঠন, • প্রোটিন এবং নিউরোট্রান্সমিটার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উত্পাদনকে বৃদ্ধি করে	• ক্লান্তি, বিরক্তি, বিষণ্নতা • রক্ত সল্পতা, • জিহ্বাতে ব্যথা, • বমি বমি ভাব, • পেশী ব্যথা, • মাথা ঘোরা, • ডার্মাটাইটিস, • নিউরোপ্যাথি
ভিটামিন বি৯ (ফলিক অ্যাসিড)	কিডনি, লিভার, বাদাম, লেবু, ডিম, সবুজ শাকসবজি, গোটা শস্য, অ্যাভোকাডো, কমলা, মাছ	• লোহিত রক্তকণিকা গঠন • পরিপাকতন্ত্রের কোষের সংশ্লেষণে অবদান রাখা, • কোষ বিভাজন এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করে	• ডায়রিয়া • জিনজিভাইটিস • রক্ত সল্পতা, • অ্যাসিডিটি, • ক্লান্তি, বিভ্রান্তি, বিষণ্নতা; ডিমেনশিয়া
ভিটামিন বি১২ (সায়ানোকোবালামিন)	সীফুড, লিভার, কিডনি, হার্ট, গোটা শস্য, টুনা, দই, ডিম, পনির, মাংস, মুরগি	• লোহিত রক্তকণিকা গঠন, • শ্বেত রক্তকণিকাকে প্রভাবিত করে, • স্নায়ু এবং পরিপাকতন্ত্রের টিস্যুর ভারসাম্য বজায় রাখা	• ক্লান্তি, • রক্ত সল্পতা, • বিভ্রান্তি, • স্নায়ুর সমস্যা, • কানের সমস্যা, • ডিমেনশিয়া
ভিটামিন সি (অ্যাসকরবিক এসিড)	পেয়ারা, সবুজ শাক, কমলালেবু, লেবু, টমেটো, বেশিরভাগ ফল	• সুস্থ হাড়, দাঁত এবং মাড়ি তৈরি করে, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, আয়রন শোষণে সাহায্য করে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট	• মাড়ি থেকে রক্তপাত (Scurvy), রক্তশূন্যতা, • সহজেই ক্ষত সৃষ্টি ও ধীর নিরাময়, পেশী এবং জয়েন্টে ব্যথা,

		হিসেবে কাজ করে, প্রোটিন বিপাক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে	• ঘন ঘন সর্দি
ফ্যাট সলিউবল (চর্বিতে দ্রবণীয়) ভিটামিন			
ভিটামিন এ (রেটিনল)	হলুদ/কমলা ফল ও সবজি, ডিমের কুসুম, লিভার, দুধ চোখের সমস্যা এবং	• ইমিউন সিস্টেমের শক্তি বাড়ায় ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় • ভালো দৃষ্টিশক্তি, স্বাস্থ্যকর ত্বক, দাঁত এবং হাড়ের বিকাশ করে, • এপিথেলিয়াল কোষ এবং শ্লেষ্মা ঝিল্লির রক্ষণাবেক্ষণে করে	• রাতকানা (night blindness), • আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, • খসখসে ত্বক ও চুল, • দুর্বল দাঁত ও নখ, • সর্দি
ভিটামিন ডি	• সূর্যালোকের সংস্পর্শে ত্বকে তৈরি হয় • দুধ, পনির, মাখন, • সামুদ্রিক মাছ, মাছের ডিম এবং লিভার	• হাড় এবং দাঁতের সঠিক গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় • শরীরে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস শোষণ করতে সাহায্য করে	• আয়রন এবং ফসফরাসের শোষণের ঘাটতি দুর্বল হাড় এবং দাঁত গঠনের দিকি নিয়ে যাবে, শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিতে বাধা পরবে ও রিকেট হবে; গুরুতর ঘাটতি প্রাপ্তবয়স্ক/বয়স্কদের অস্টিওম্যালাসিয়ার কারণ
ভিটামিন ই	উদ্ভিজ্জ তেল, বাদাম এবং বীজ, গোটা শস্য, ডিম, লেবু	• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, এ এবং সি –কে অক্সিডেশন হতে রক্ষা করে; বার্ধক্য প্রতিরোধ করে	• ক্লান্তি, • শুষ্ক চুল, • পেশী দুর্বলতা, • স্নায়ুর সমস্যা • হৃদরোগ
ভিটামিন কে	শাক, লেটুস, ফুলকপি এবং বাধাকপি, ব্রকলি, মাছ, কলিজা, মাংস, ডিম	রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে	• অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাত • রক্ত জমাট বাধায় বিলম্ব

খ. খনিজ পদার্থ (Minerals): বৃদ্ধি, বিকাশ, পানির ভারসাম্য এবং স্নায়ুবিক সকল ক্রিয়াকলাপসহ শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য খনিজ প্রয়োজন।

সারণী ৩: অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ, উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত রোগ

খনিজ পদার্থ	উৎস	কাজ	অভাবজনিত রোগ
জিঙ্ক (Zinc-Zn)	গাঢ় সবুজ শাকসবজি, সামুদ্রিক খাবার, মাংস, কুমড়ার বীজ, দুধ, যকৃত, পুরো শস্য, ডিমের কুসুম, রসুন, মুরগির মাংস, মাছ, ডাল	• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং দেহকে শক্তিশালী করে, • ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে, হজম প্রক্রিয়া সহজ করে; মাংস পেশীর গঠনের জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।	• দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, • ঘ্রাণ ও স্বাদের অনুভূতি হ্রাস, • ক্ষুধা হ্রাস, • ডায়রিয়া, প্রোস্টেট গ্রন্থির সমস্যা, ক্ষত নিরাময় ও ত্বকের সমস্যা
ম্যাগনেসিয়াম (Magnessium-Mg)	ডাল, বাদাম, পুরা শস্য, অ্যাভোকাডো, গাঢ় সবুজ শাক সবজি	• স্নায়ুবিক কার্যকলাপে সহায়তা করা, পেশীর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা, চর্বি, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট থেকে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।	• খিঁচুনি, • কোষ্ঠকাঠিন্য
আয়োডিন (Iodine - I)	মায়ের বুকের দুধ, গরুর মাংস, সামুদ্রিক খাবার, যকৃত, বাদাম, মটরশুটি এবং পুরো শস্য।	থাইরয়েডের কার্যকারিতা এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য আয়োডিন গুরুত্বপূর্ণ।	• মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীতা, বধিরতা, মিউটিজম (শিশু কথা বলতে পারে না), ক্রিটিনিজম, গর্ভপাত, গর্ভে সন্তানের মৃত্যুবরণ, জন্মগত ত্রুটি, গলগন্ড (Goiter)
আয়রন (Iron/Ferrum-Fe)	মাংস, লিভার, ডিম, গাঢ় সবুজ শাক সবজি, বীজ, গোটা শস্য, লেবু, মাছ, সামুদ্রিক খাবার	শরীরের বিভিন্ন কোষে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন বিনিময়ের করে, এটি রক্তকে শক্তিশালী করে।	মাথাব্যথা, ক্লান্তি, বিরক্তি, ফ্যাকাশে রং, মাথা ঘোরা, রক্তশূন্যতা (Iron Deficiency Anemia)

ক্যালসিয়াম (Calcium-Ca)	ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস হল দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য। অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে ছোট মাছের কাঁটা, অস্থিমজ্জা এবং গাঢ় সবুজ শাকসবজি ।	হাড় এবং দাঁতের একটি মূল উপাদান। এটি শক্তিশালী কঙ্কালের জন্য অপরিহার্য। ক্যালসিয়াম রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে।	মাংসপেশীতে ব্যাথা, হাড় ক্ষয়, দাঁত ভঙ্গুর, রক্তক্ষরণ
ফসফরাস (Phosphorus-P)	দুগ্ধজাত খাবার, সিরিয়াল পণ্য, মাংস এবং মাছ	➢ ফসফরাস হল কোষের ঝিল্লি এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের একটি অপরিহার্য কাঠামোগত উপাদান। এটি হাড়ের গঠন, শক্তি উৎপাদন, ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোষের কাজ এবং শরীরে অম্ল-ক্ষারের (অ্যাসিড-বেস) ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ সহ বেশ কয়েকটি জৈবিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।	ক্ষুধা হ্রাস, পেশী দুর্বলতা, হাড়ের ভঙ্গুরতা, স্নায়ুর দুর্বলতা এবং শিশুদের রিকেট।
পটাসিয়াম (Potassium/ Kelium-K)	• সবজি-পালং শাক, ব্রকলি, গাজর, আলু, শসা, মিষ্টি আলু এবং বিটরুট; ফল-কলা, এপ্রিকট, কমলা এবং জাম্বুরা; পুরো শস্য-বাদামী চাল, গমের রুটি এবং ওট ব্রান; পেস্তা, হেজেলনাট, সূর্যমুখী বীজ, শণের বীজ এবং বিভিন্ন ধরনের বাদাম	• স্বাভাবিক রক্তচাপ বজায় রাখা • স্নায়ু সংকেত বহন করা • পেশী সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা • শরীরে পানির ভারসাম্য নিশ্চিত করা • অম্লতা এবং ক্ষারত্বের মধ্যে শরীরের pH ভারসাম্য রক্ষা করা • সঠিক হৃদস্পন্দন বজায় রাখা • সঠিক হজম প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা • স্ট্রোক এবং হৃদরোগ প্রতিরোধ করা • নিয়মিত হার্টের পেশীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা	

শরীরের বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত অন্যান্য খনিজগুলো হল ক্রোমিয়াম, তামা, ফ্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, নিকেল, সোডিয়াম এবং সেলেনিয়াম।

খ. পানি (Water): পানি আমাদের শরীরের প্রধান উপাদান। এটি শরীরের ওজনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গঠন করে। পানি সমস্ত কোষে উপস্থিত, সমস্ত জীবন্ত টিস্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি টিস্যু এবং অঙ্গগুলোকে ঘিরে রাখা এবং ক্ষত হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়। পানি হজম, শোষণ এবং শরীরে পুষ্টি পরিবহনে সাহায্য করে। এটি প্রস্রাবের আকারে অবাঞ্ছিত পদার্থ নির্গত করতে সাহায্য করে এবং ঘামের মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখা। আমাদের প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা উচিত। আমরা পানি রূপে দুধ, ফলের রস ইত্যাদিও গ্রহণ করতে পারি। বিশেষজ্ঞগণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২-৩ লিটার পানি পান করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। শিশুদের তাদের শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পান করা উচিত।

➢ **পানির প্রয়োজনীয়তা:**

- শরীরের অভ্যন্তরে পুষ্টি পরিবহণ করে,
- রক্ত, লালা, অশ্রু এবং ঘাম তৈরি করে
- হজম প্রক্রিয়া সক্রিয় করে,
- মুখ ও ফুসফুসকে আর্দ্র রাখা
- ত্বককে আর্দ্র ও শীতল রাখা
- অসুস্থতার সময় যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ঘাম হয়, যদি বমি বা ডায়রিয়া হয়, উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ করে শিশুদের ডিহাইড্রেশন হতে পারে। তখন শরীরে পানির অভাব পানি দিয়েই পূরণ করতে হয়।
- স্তন্যদানকালে দুধ উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত পানির প্রয়োজন হয়।
- খেলাধুলার মতো নিবিড় কার্যকলাপের পরে প্রচুর পানি পান করা উচিত।

চিত্র ১.৮: একনজরে ছয় প্রকার পুষ্টি উপাদান

১.৩ অপুষ্টি (Malnutrition)

অপুষ্টি হল এমন একটি অবস্থা যা তখন বিকশিত হয়, যখন শরীর সুস্থ টিস্যু এবং অঙ্গের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির সঠিক পরিমাণ পায় না। এতে অপুষ্টি, অত্যধিক পুষ্টি এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাবজনিত রোগ (যেমন ভিটামিন এ-এর অভাব, আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা, আয়োডিনের অভাবজনিত ব্যাধি এবং জিঙ্কের ঘাটতি) অন্তর্ভুক্ত।

➢ **অপুষ্টি বেশিরভাগই নিম্নলিখিত শ্রেণির মানুষদের প্রভাবিত করে:**

- গর্ভাবস্থা থেকে দুই বছর বয়সী শিশু

- বুকের দুধ না খাওয়া শিশু
- গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলারা
- দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি

১.৩.১ অপুষ্টির প্রকারভেদ:

ক) ঘাটতিজনিত অপুষ্টি (Under nutrition): খাদ্যের অপর্যাপ্ত গ্রহণের ফলে বা খাদ্য রূপান্তর বা শোষণে শরীরের অক্ষমতার ফলে ঘাটতিজনিত অপুষ্টি ঘটে। এই অপুষ্টিতে প্রচুর পরিমাণে পেশীর ক্ষতি হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি গর্ভাবস্থা থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রভাবিত করে, তাদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে এবং উচ্চতা বৃদ্ধি মন্থর হওয়ার দিকে পরিচালিত করে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অপুষ্টি (খনিজ ও ভিটামিনের অভাব) খাদ্যতালিকায় খনিজ লবণ এবং ভিটামিনের অপর্যাপ্ত গ্রহণের কারণে হয়। অপুষ্টির এই রূপটি সহজে শনাক্ত করা যায় না, যখন ক্লিনিকাল লক্ষণগুলো উপস্থিত হয় তখন বুঝা যায়। খনিজ এবং ভিটামিন খুব অল্প পরিমাণে শরীরের জন্য প্রয়োজন, তারা সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরকে রক্ষা করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খ) অত্যধিক পুষ্টি (Over nutrition): এর মানে হল, বিভিন্ন বয়স ভেদে খাবারে পুষ্টির অত্যধিক গ্রহণ যা ব্যক্তির খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। অতিরিক্ত পুষ্টির ফলে অতিরিক্ত ওজন, স্থূলতা বা ভিটামিন বিষাক্ততা দেখা দেয়। অত্যধিক পুষ্টি নিম্নলিখিত কারণগুলোর মধ্যে যে কোনো কারণে হতে পারে:

- খাদ্যাভ্যাস (অতিরিক্ত খাওয়া)
- স্বাস্থ্যের অবস্থা
- অনেকগুলো অনির্ধারিত খাদ্যতালিকাগত সম্পূরক গ্রহণ করা
- শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অভাব
- মনস্তাত্ত্বিক কারণ (স্ট্রেস)
- পরিবেশগত কারণ (অনিরাপদ খাবার, যেমন, খাবারে ভারী ধাতু, সহকর্মীর চাপ)
- ঔষধ, জিনগত কারণ

১.৩.২ অপুষ্টির কারণ

- অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ; উপযুক্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়া; খাদ্যের নিম্ন গুণমান
- সংক্রমক রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়াজনিত রোগ, তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, হাম এবং কৃমির উপদ্রব
- ভিটামিন সি এর মতো উপাদান কম গ্রহণ যা পুষ্টির শোষণ বাড়ায়
- খাদ্যে নিরাপত্তাহীনতা বা ভেজাল
- মহিলাদের জন্য ভারী কাজের চাপ এবং ঘন ঘন সন্তান প্রসব
- স্বাস্থ্যসেবা এবং অপর্যাপ্ত জল এবং স্যানিটেশনের দুর্বল অবস্থা
- পারিবারিক শিক্ষা, সচেতনতা, জ্ঞান এবং অনুপ্রেরণার অভাব
- অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা অবকাঠামো; পুষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অভাব
- বৈচিত্র্যময় পুষ্টিকর খাবারের কম উৎপাদন

১.৩.৩ অপুষ্টির পরিণতি

ক) ঘাটতিজনিত অপুষ্টির পরিণতি

- মাতৃত্বকালীন এবং প্রসবকালীন মৃত্যুর ঝুঁকি , কম ওজনের শিশু প্রসব
- অর্ধেকেরও বেশি শিশুমৃত্যু অপুষ্টির সঙ্গে যুক্ত, শিশুদের গর্ভকালীন ত্রুটির ঝুঁকি

- গর্ভকালীন ও জন্ম পরবর্তী সময়ে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে বাধা, ফলস্রুতিতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতা
- রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, শারীরিক দুর্বলতা, ক্লান্তি, অমনযোগী মনোভাব ও কাজে অক্ষমতা
- অল্প বয়সে দীর্ঘস্থায়ী রোগ

খ) অত্যধিক পুষ্টির পরিণতি

- করোনারি হৃদরোগ (হার্ট অ্যাটাক), ডায়াবেটিস (উচ্চ রক্তে শর্করা), গাউট (ফোলা বেদনাদায়ক জয়েন্ট), উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত ওজন, স্থূলতা, মৃত্যু

১.৩.৪ অপুষ্টি প্রতিরোধের লক্ষ্যে হস্তক্ষেপ অথবা কৌশল

- পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের উৎপাদন এবং পশু খামারের প্রচার করা
- বাড়ির উঠানে চাষ, বাগান ইত্যাদির প্রচার করা
- ছোট গবাদি পশু পালন এবং তাদের থেকে উপলব্ধ পণ্যের ব্যবহারকে উৎসাহ দেওয়া
- বায়োফোর্টিফাইড খাবারের উৎপাদন ও ব্যবহার প্রচার করা
- পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ এবং খাদ্য বৈচিত্র্যের প্রচার করা
- সঠিক খাদ্য তৈরি এবং খাওয়ানোর অনুশীলনকে উৎসাহ দেওয়া
- পুষ্টি শিক্ষা এবং শিশু যত্নের অনুশীলনগুলোকে প্রচার করা
- খাদ্য নিরাপত্তা প্রচার করা
- স্যানিটেশন এবং হাইজিনের অনুশীলনের প্রচার করা
- সংশোধনমূলক পদক্ষেপের জন্য দরিদ্র পরিবার ও কমিউনিটিগুলোকে ট্র্যাক করতে কমিউনিটি-ভিত্তিক খাদ্য এবং পুষ্টি তথ্য সিস্টেমের প্রচার করা
- কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় উপযুক্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি কর্ম একীভূত করা
- কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীতে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাদ্য পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা

১.৪ খাদ্য নিরাপত্তা (Food safety)

খাদ্য নিরাপত্তা (বা খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি) একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যা খাদ্যের প্রস্তুতি এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ানো রোগ প্রতিরোধ করে। খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। খাদ্য সরবরাহের নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য, উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের দেশসমূহে খাদ্যবাহিত রোগের প্রতুলতা একটি উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে থেকে গেছে। অনুমান করা হয় যে প্রতি বছর ১.৮০মিলিয়ন মানুষ ডায়রিয়া জনিত রোগের ফলে মারা যায় এবং এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত খাবার বা পানি এর জন্য দায়ী। গবেষণায় দেখা গেছে যে ২০০ টিরও বেশি পরিচিত রোগ খাবারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। সঠিক খাদ্য প্রস্তুতি বেশিরভাগ খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-র তথ্য থেকে জানা যায় যে, খাদ্য পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত খুব অল্প সংখ্যক কারণই সর্বত্র খাদ্যজনিত রোগের জন্য দায়ী। এই কারণগুলো হল:

- খাবার গ্রহণের কয়েক ঘণ্টা আগে খাবার তৈরি করা এবং অনুপযুক্ত তাপমাত্রায় তা সংরক্ষণ করা, যার কারণে সেই খাবারে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি অথবা বিষাক্ত পদার্থ তৈরির সম্ভাবনা।
- প্যাথোজেন কমাতে বা নির্মূল করার জন্য খাবার বার বার গরম করা।

- সব ধরনের খাবার একসাথে রেখে সংরক্ষণ করা।
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অপর্যাপ্ততা।

খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতির সাথে বেশ কিছু সুবিধা জড়িত, যেমন: বর্ধিত উৎপাদনশীলতার কারণে অর্থনৈতিক লাভ, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর চাপ কমানো এবং খাদ্য অপচয় কমানোর মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা।

১.৪.১ খাদ্য নিরাপত্তার নীতি প্রণয়ন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) দীর্ঘদিন ধরে খাদ্য সুরক্ষার জন্য বিশ্ববাসীকে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষিত করাতে সচেতন রয়েছে। ১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে, ডব্লিউএইচও নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতির জন্য দশটি সুবর্ণ নিয়ম তৈরি করেছিল, যেগুলো ব্যাপকভাবে অনুবাদ এবং সংশোধন করা হয়েছিল। খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রায় এক বছর আলোচনার পর, ডব্লিউএইচও ২০০১ সালে নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতের পাঁচটি মূলনীতি প্রবর্তন করে, যা ২০১৫ সালে পুনরায় পরিমার্জনা করা হয়। নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতির জন্য পূর্বের প্রবর্তিত দশটি সুবর্ণ নিয়মের সমস্ত বার্তা সহজ শিরোনামের অধীনে এই নতুন পাঁচটি মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "নিরাপদ খাদ্য, উন্নত স্বাস্থ্য" এই বছরের বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যা ২০২২ সালের ৭ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ এবং পন্থা বিবেচনা করার সময়, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (The Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (world health organization-WHO) বেশ কয়েকটি মূল বার্তা প্রচার করে:

- যদি খাদ্য সামগ্রী নিরাপদ না হয়, তবে তা খাদ্যই না; খাদ্য নিরাপত্তা স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে; খাদ্য নিরাপত্তার সবার দায়িত্ব; খাদ্য নিরাপত্তা বিজ্ঞানসম্মত; সবার একাগ্রতা খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করে; আজকে খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করলে আগামী দিনে সুন্দর ও সুস্থ জীবন লাভ করা যাবে।

১.৪.২ খাদ্য প্রক্রিয়াকালে খাদ্য নিরাপত্তার মূল নীতি: খাদ্য নিরাপত্তার পাঁচটি মূলনীতি হল:

মূলনীতি ১. বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি এবং নিরাপদ কাঁচামাল ব্যবহার করা
মূলনীতি ২. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা
মূলনীতি ৩. উপযুক্ত তাপমাত্রায় খাবার রান্না করা
মূলনীতি ৪. সঠিক তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ করা
মূলনীতি ৫. কাঁচা এবং রান্না করা খাবার আলাদা রাখা

নিম্নে এই মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হল।

মূলনীতি ১. বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি এবং নিরাপদ কাঁচামাল ব্যবহার করা

- নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে। পানিকে নিরাপদ ও ব্যবহার উপযোগী করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।
- তাজা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার নির্বাচন করতে হবে
- ক্ষেত্র বিশেষে নিরাপত্তার জন্য প্রক্রিয়াজাত খাবার বেছে নিন, যেমন - পাস্তুরিত দুধ
- ফল এবং সবজি ধুয়ে খেতে হবে, বিশেষ করে যদি তা কাঁচা খাওয়া হয়।
- মেয়াদের তারিখ শেষ হওয়ার পর সেই খাবার ব্যবহার করা যাবে না।

মূলনীতি ২. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

- খাবার ধরার আগে এবং খাবার তৈরির সময় হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- টয়লেটে যাওয়ার পরে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।
- খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত সমস্ত পৃষ্ঠ/স্থান এবং সরঞ্জাম পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- পোকামাকড়, ইঁদুর এবং অন্যান্য প্রাণী থেকে রান্নাঘরের এলাকা রক্ষা করতে হবে।

মূলনীতি ৩. উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় খাবার রান্না করা

- খাবার উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রান্না করতে হবে, বিশেষ করে মাংস, মুরগি, ডিম এবং সামুদ্রিক খাবার।
- স্যুপ এবং স্টুর মতো খাবারগুলোকে ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটাতে হবে, যেন মাংস বা মাছ থেকে নির্গত তরল পদার্থগুলো গোলাপী না দেখায়।
- রান্না করা খাবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপযুক্ত তাপমাত্রায় গরম করতে হবে।

কৌশল ৪. সঠিক তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ করা • ২ ঘণ্টার বেশি ঘরের তাপমাত্রায় রান্না করা খাবার ফেলে রাখা যাবে না। • সমস্ত রান্না করা এবং পচনশীল খাবার অবিলম্বে ফ্রিজে রাখতে হবে (৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে)। • পরিবেশন করার আগে রান্না করা খাবারের তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি রাখুন রাখতে হবে। • রেফ্রিজারেটরে বেশিদিন খাবার রাখা যাবে না • ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষিত খাবার খাওয়া যাবে না।	
কৌশল ৫. কাঁচা এবং রান্না করা খাবার আলাদা রাখা • অন্যান্য খাবার থেকে কাঁচা মাংস, মুরগি এবং সামুদ্রিক খাবার আলাদা করে রাখতে হবে। • কাঁচা খাবারের জন্য পৃথক সরঞ্জাম এবং পাত্র, যেমন ছুরি এবং কাটিং বোর্ড ব্যবহার করতে হবে। • কাঁচা এবং প্রস্তুত খাবারের মধ্যে সংযোগ এড়াতে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে।	

পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবার বেঁচে থাকার এবং সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। ক্ষতিকারক জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা পরজীবী) বা রাসায়নিক/বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা দূষিত হলে খাদ্য রোগ সংক্রমণের বাহন হতে পারে। পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অনিরাপদ খাদ্য রোগ এবং অপুষ্টির একটি দুষ্ট চক্র তৈরি করে, বিশেষ করে শিশু, ছোট শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থদের প্রভাবিত করে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখার পাশাপাশি, নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ জাতীয় অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং পর্যটনকেও প্রভাবিত করে, উন্নয়নকে উদ্দীপিত করে। খাদ্য বাণিজ্যের বিশ্বায়ন, ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল খাদ্য ব্যবস্থা খাদ্যের নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য বিশ্ব ও দেশ-পর্যায়ে অনিরাপদ খাদ্যের সাথে যুক্ত জনস্বাস্থ্যের হুমকি প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১.৫ দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা পরিকল্পনার নির্দেশনা (Daily meal preparation guidelines)

খাদ্যতালিকা পরিকল্পনা হল ব্যক্তি বিশেষে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে খাদ্য নির্ধারণ, নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা।

১.৫.১ খাবার পরিকল্পনা করার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

- পারিবারিক আয় এবং জীবনধারা
- স্বতন্ত্র অভ্যাস এবং পছন্দ
- ব্যক্তির পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা
- পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন রুটিন যেমন কাজ এবং স্কুল

- স্টোরেজ এবং রান্নার উপকরণের উপলব্ধতা
- খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং ঋতু
- রান্নার জন্য উপলব্ধ সময়
- খাদ্য পছন্দ করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য এবং বৈচিত্র্য
- খাবার যেন ক্ষুধা নিবারণ করে

১.৫.২ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের জন্য কিছু সাধারণ নির্দেশিকা:

- স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল কোনো খাবার এড়িয়ে যাওয়া না। খাবার এড়িয়ে যাওয়া শরীরে বিপাকীয় হার কমিয়ে দেয়। সাধারণত সারাদিনে ৫ বার খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, ৩ বার প্রধান খাবার এবং ২ বার স্ন্যাকস। এছাড়াও, সকালের নাস্তা কখনই বাদ দেওয়া যাবে না। এটা দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার।
- জেনে নাও খাবার তৈরির সহজ উপায়। স্বাস্থ্যকর খাওয়া মানে জটিল তালিকা তৈরি করে খাওয়া না। খাবারের প্রস্তুতি সহজভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, বেশি করে সালাদ, ফল এবং সবজির রস খেতে হবে এবং ক্যালোরির চেয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার আনন্দের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।
- যখন পেট ভরা মনে হবে, তখন খাদ্য গ্রহণ থামাতে হবে। তাহলে ওজন বজায় থাকবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে। কাজ করার সময় কাছে পানির বোতল রাখতে হবে।
- মেন্যুতে বিভিন্ন ধরনের খাবার ব্যবহার করতে হবে। কোনো একক খাবারেই সব পুষ্টি থাকে না।
- সিরিয়াল এবং ডাল প্রোটিনের গুণমান উন্নত করতে, ডাল প্রোটিনের সাথে সিরিয়াল প্রোটিনের ন্যূনতম অনুপাত ৪:১ হওয়া উচিত। শস্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা হবে আট ভাগ শস্যের এবং এক ভাগ ডাল।
- প্রতিদিন পাঁচ ভাগ ফল ও সবজি খেতে হবে।
- ক্ষুধার্ত অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- রান্না করার আগে খাবার থেকে সমস্ত দৃশ্যমান চর্বি সরিয়ে ফেলা উচিত।
- ক্যাফিন এবং পরিশোধিত চিনির মতো উদ্দীপক সীমিত করতে হবে।

১.৫.৩ খাদ্যতালিকা পরিকল্পনায় খরচ হ্রাস করার উপায়:

- খাবারের পুষ্টি উপাদান, খাদ্য গোষ্ঠী এবং খাদ্য নির্দেশিকা সম্পর্কে জ্ঞান।
- প্রয়োজনীয় পরিবেশন অনুযায়ী প্রতিটি গ্রুপ থেকে খাবার নির্বাচন করা।
- আগে থেকেই আগামী দিনের খাবারের পরিকল্পনা করা।
- ঋতু অনুযায়ী উপলব্ধ খাবার বিবেচনা করা।
- দামী খাদ্য উপাদান এড়িয়ে চলা ।
- বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যতীত, অন্তত এক সপ্তাহ আগে কিছু খাবারের পরিকল্পনা করা।

১.৫.৪ স্বাস্থ্যকর রান্নার টিপস

স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে পছন্দের খাবারগুলো ছেড়ে দিতে হবে। পছন্দের খাবারগুলোকে স্বাস্থ্যকর বিকল্পে পরিণত করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে:

- মাংস কমাতে এবং খাবারে আরও শাকসবজি যোগ করতে হবে।
- মিহি আটার পরিবর্তে পুরো গমের আটা ব্যবহার কর।
- অতিরিক্ত তেল বন্ধ করতে ভাজা খাবার কম খেতে হবে।

- মেয়োনিজের পরিবর্তে কম চর্বিযুক্ত দই খাওয়া ভালো। দইয়ে কাটা ফল যোগ করে খেলে আরো বেশি ভালো।
- স্কিমড দুধ খেতে হবে।
- রান্না করার জন্য তেলের প্রয়োজন কমাতে নন-স্টিক কুকওয়্যার ব্যবহার করা ভালো।
- পুষ্টির ক্ষতি এড়াতে শাকসবজি সিদ্ধ করার পরিবর্তে মাইক্রোওয়েভ বা বাষ্পীয় পাত্র ব্যবহার কর।
- খাবারে চর্বি একটি ন্যূনতম পরিমাণ বজায় রাখা উচিত।
- যখন ফল বা সবজি পাকতে শুরু করে, তখন সেগুলো কেটে হিমায়িত করতে হবে এবং স্যুপ বা স্টুতে ব্যবহার করতে হবে।

১.৫.৫ সুপারিশকৃত নিরাপদ রান্নার তাপমাত্রা

১। ১৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট
- পোল্ট্রি
- স্টাফিং যে মাংস অন্তর্ভুক্ত
- স্টাফড মাংস এবং পাস্তা
- পূর্বে রান্না করা খাবার ধারণকারী খাবার

২। ১৫৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট
- সামুদ্রিক খাবার
- ম্যারিনেট করা মাংস
- ডিম

৩। ১৪৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট
- গরুর মাংস
- ছাগলের মাংস

৪। ১৩৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট
- শাকসবজি, শস্য

এমনকি রান্না করার পরেও, খাবার তাপমাত্রার বিপদ অঞ্চলে চার ঘন্টার বেশি থাকা উচিত নয়। তাপমাত্রার বিপদ অঞ্চল ৪১ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং ১৩৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট এর মধ্যে পড়লে যেখানে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পায়।

১.৫.৬ খাদ্য প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম:

খাবার পরিবেশনের সরঞ্জাম:

খাওয়ার চামচ, কাঁটাচামচ এবং ছুরি	প্লেট	বাটি

পরিবেশনের চামচ	পানির জগ	পানির গ্লাস

রান্নাঘরের সরঞ্জাম

ছুরি- ভিন্ন কাজে ভিন্ন ছুরি ব্যবহার করা ভালো।	চপিং বোর্ড - সবজি এবং মাংসের জন্য চপিং বোর্ড আলাদা করা ভালো।	কড়াই- তরকারী রান্নার জন্য
হাড়ি- ভাত, স্যুপ, ডাল রান্নার জন্য	ফ্রাইং প্যান- ভাজি করার জন্য	জুইজার- ফলের রস করার জন্য

গ্রেটার- চীজ/সবজি কাটার জন্য	ভেজিটেবল পিলার- সবজি বা ফলের খোসা ছাড়ানোর জন্য	গ্রেন্ডার- ফলের রস, মশলা পেস্ট বা গুড়া করার জন্য
প্রেসার কুকার- মাংস, ডাল রান্নার জন্য	রাইস কুকার- ভাত রান্না বা যেকোনো কিছু সিদ্ধ করার জন্য	

১.৫.৭ দৈনন্দিন জীবনে সুষম খাদ্যতালিকা মেনে চলার উপায়:

➢ সারাদিনের খাবারের পরিমাণ বিবেচনা করে নিম্নলিখিত উপায়ে সুষম খাদ্যতালিকা তৈরি করা যায়।

১| সারাদিনের খাবারের পরিমাণের অর্ধেক ভাগ (৫০%) রঙিন শাকসবজি এবং ফলের আইটেম রাখতে হবে। দিনে অন্তত ৫ বার ফল ও শাকসবজী খাওয়া উচিত।

২| সারাদিনের খাবারের পরিমাণের এক চতুর্থাংশ (২৪%) পুরো শস্যের (যেমন- গম, বার্লি, ওটস, বাদামী চাল) আইটেম রাখতে হবে। এগুলো দিয়ে তৈরি খাবার যেমন পান্তা, সাদা রুটি, সাদা ভাত। এ ধরনের খাবার দিনে অন্তত ৩ থেকে ৪ বার খাওয়া উচিত।

৩| সারাদিনের খাবারের পরিমাণের এক চতুর্থাংশ (২৪%) প্রোটিন আইটেম রাখতে হবে। মাছ, মুরগি, মটরশুটি এবং বাদাম সবই স্বাস্থ্যকর, বহুমুখী উৎস থেকে ২ থেকে ৩ বার প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে এবং দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য থেকে ১ থেকে ২ বার প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। লাল মাংস সীমিত করতে হবে এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস এড়িয়ে চলতে হবে।

৪| পরিমিত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর উদ্ভিদ তেল থাকতে হবে। স্বাস্থ্যকর উদ্ভিজ্জ তেল যেমন জলপাই, সয়া, ভুট্টা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম বেছে নিন এবং আংশিক হাইড্রোজেনেটেড তেল এড়িয়ে চলুন, যাতে অস্বাস্থ্যকর ট্রান্স ফ্যাট থাকে। মনে রাখবেন যে কম চর্বি মানে "স্বাস্থ্যকর", কথাটা সঠিক না।

৫| পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় পান করতে হবে। চিনিমুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রতিদিন এক থেকে দুইবার খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে। প্রতিদিন একটি ছোট গ্লাসে ফলের রস পান করতে হবে।

চিত্র ১.৯: দৈনন্দিন জীবনে সুষম খাদ্যতালিকা

➢ সারণী ৪: বিভিন্ন বয়সের পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরির পরিমাণ:

বয়স	প্রয়োজনীয় ক্যালোরির পরিমাণ
অসক্রিয় শিশু: ২-৮ বছর	১০০০-১৪০০
সক্রিয় শিশু: ২-৮ বছর	১০০০-২০০০
মহিলা: ৯-১৩ বছর	১৪০০-২২০০
পুরুষ: ৯-১৩ বছর	১৬০০-২৬০০
সক্রিয় মহিলা: ১৪-৩০ বছর	২৪০০
অসক্রিয় মহিলা: ১৪-৩০ বছর	১৮০০-২০০০
সক্রিয় পুরুষ: ১৪-৩০ বছর	২৮০০-৩২০০
অসক্রিয় পুরুষ: ১৪-৩০ বছর	২০০০-২৬০০

গর্ভবতী মহিলা	প্রচলিত প্রয়োজনীয় ক্যালরীর সাথে অতিরিক্ত ৩০০ ক্যালরী যুক্ত করতে হবে।
দুগ্ধ সেবনকারী মহিলা (১ম ৬ মাস)	প্রচলিত প্রয়োজনীয় ক্যালরীর সাথে অতিরিক্ত ৫৫০ ক্যালরী যুক্ত করতে হবে।
দুগ্ধ সেবনকারী মহিলা (৬ মাস পরবর্তী সময়)	প্রচলিত প্রয়োজনীয় ক্যালরীর সাথে অতিরিক্ত ৪০০ ক্যালরী যুক্ত করতে হবে।
সক্রিয় ব্যক্তি: ৩০ বছর এবং তার বেশি	২০০০-৩০০০
অসক্রিয় ব্যক্তি: ৩০ বছর এবং তার বেশি	১৬০০-২৪০০

১.৬ খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান (Proper posture for food intake)

শরীরে সঠিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যের পরিপাকের জন্য বয়স বিবেচনায় ও ব্যক্তি বিশেষে খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ।

১.৬.১ খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থানের গুরুত্ব

- মাথাকে সমর্থন করার জন্য ধড়ের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে এবং সঠিকভাবে শ্বাস নেয়ার সুযোগ দেয়
- চোয়ালের স্থিতিশীলতায় সহায়তা করে
- নিরাপত্তা এবং স্বস্তি প্রদান করে
- খাওয়ার কাজে মনোযোগ বাড়াতে উৎসাহিত করে
- হাত ও মুখের সন্চালনের ভালো সমন্বয় করে
- শ্বাসনালীতে খাদ্য ও তরল পদার্থের আটকে যাওয়া রোধ করে
- হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়, ক্লান্তি হ্রাস করে
- খাওয়ার সময় সামাজিকতাকে উৎসাহিত করে
- নতুন ধরনের খাদ্যগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

১.৬.২ শিশুদের খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান

- শিশু চেয়ার-টেবিলে বসে খওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুদের জন্য সীটবেল্টসহ হাইচেয়ারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বেশিরভাগ শিশুই প্রায় ৫-৬ মাস বয়সে হাইচেয়ারে বসতে সক্ষম হয়। সীটবেল্ট পেলভিসকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। নিশ্চিত করতে হবে যেন সীটবেল্টগুলো তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করে বা তাদের পেটে চাপ সৃষ্টি না করে।
- খাদ্যগ্রহণের সময় শিশুর নিতম্ব, হাঁটু এবং পা ৯০ ডিগ্রী অবস্থানে সমানভাবে সমন্বয় করতে হবে।
- একটি আরামদায়ক অবস্থান বজায় রাখার জন্য চেয়ারের আসন এবং শিশুর পিঠ ৯০ ডিগ্রী অবস্থানে থাকতে হবে।

- চেয়ারের নিচে পা রাখার আয়োজন ব্যবস্থা করতে হবে। পা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখলে শিশু অস্বস্তি বোধ করবে। প্রয়োজনে পায়ের নিচে আরেকটি ছোট চেয়ার দিতে হবে।
- প্রয়োজনে বসার জায়গায় তোয়ালে বা কুশন ব্যবহার করতে হবে।
- খাওয়ার টেবিল বা ট্রে সবসময় শিশুর নাভি এবং বুকের মাঝ বরাবর থাকতে হবে।
- টেবিলের পৃষ্ঠ যেন মজবুত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- বাড়ির সবাই একসাথে খেতে বসতে হবে।
- শিশুর নিজ হাতে খাওয়াতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে কাটলারীর ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- খাওয়ার প্লেট ও সময়কে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হবে।

চিত্র ১.১০: শিশুদের খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান

**বিশেষ চাহিদা: সহায়ক সরঞ্জাম (Assistive device): সেরিব্রাল পালসি, মাসকুলার ডিস্ট্রোফি ইত্যাদি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য, খাওয়ার সময় অবস্থানের ক্ষেত্রে একই নীতিগুলো প্রযোজ্য। তবে তাদের এই অবস্থান বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত সহায়ক সরঞ্জাম দ্বারা উপকৃত হতে পারে। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারগুলোতে ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্টরা এধরনের যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

১.৬.৩ সুস্থ সবল প্রাপ্তবয়স্কদের খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান

- টেবিলের কাছাকাছি বসতে হবে, যেন পেটে চাপ না পড়ে।
- খাদ্যগ্রহণের সময় নিতম্ব, হাঁটু এবং পা ৯০ ডিগ্রী অবস্থানে সমানভাবে সমন্বয় করতে হবে।
- একটি আরামদায়ক অবস্থান বজায় রাখার জন্য চেয়ারের আসন এবং পিঠ ৯০ ডিগ্রী অবস্থানে থাকতে হবে।
- বসার সময় পা যেন নিচে সমতলপৃষ্ঠে রাখা যায়।
- প্রয়োজনে স্বস্তি লাভের জন্য পিঠের পিছনে কুশন দিতে হবে।
- অম্বল, বদহজম বা পেট ব্যাথার উপসর্গগুলো প্রতিরোধ করতে খাওয়ার ১০ থেকে ২০ মিনিটের জন্য সোজা হয়ে বসে থাকা ভালো।
- খাওয়ার সময় আঁটসাঁট পোশাক এড়িয়ে চলুন।
- চিবানোর সময় কথা না বলাই উত্তম।

১.৬.৪ বয়স্কদের খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান

- যদি গ্রাহক নড়াচড়া করতে পারে এবং গুরুতর অসুস্থ না হয়, তাহলে নিশ্চিত করতে হবে যে অচলাবস্থায়ও ব্যক্তি যেন মাথা, পিঠ ও ঘাড় সোজা করে বসতে পারেন। দরকার হলে বালিশ দিয়ে পিছনের দিকে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করতে হবে। মাথা সামনে দিকে নিয়ে চিবুক সামান্য নিচু করতে বলতে হবে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খাবার গলধকরণ করতে অসুবিধা হতে পারে। কারো কারো একপাশ বা উভয় পাশই দুর্বল হতে পারে। যে পাশ বেশি দুর্বল সেইপাশে সাপোর্ট দিতে হবে।
- খাওয়ানোর সময় ব্যক্তির চোখের লেভেলে বা তার নীচে বসতে হবে।
- খাওয়ানোর সময় ব্যক্তিকে ফিডিং গাউন পরিয়ে নিতে হবে।
- ব্যক্তির মুখে স্নায়ুজনিত কোনো দুর্বলতা থাকলে, অপেক্ষাকৃত সবল পাশে বসে খাওয়াতে হবে। ব্যক্তির মুখের অপেক্ষাকৃত সবল অংশে খাবার দিতে হবে।
- ব্যক্তি নিজের হাতে খেতে পছন্দ করলে তার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এমনভাবে তার সামনে খাবার রাখতে হবে এবং তার বসার ব্যবস্থা করতে হবে, যেন তিনি খাবার ভালো মতো দেখতে পান।
- শয্যাশায়ী ব্যক্তিদের বিছানায় খাবার পরিবেশন করতে ট্রলি ব্যবহার করতে হবে।

জব-১: মিল প্রিপারেশন পদ্ধতি ও খাবার পরিবেশন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল এবং স্ক্র্যাপগুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)**:** প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন): খাবার পরিবেশনের সরঞ্জাম-

সরঞ্জাম	টুলস	মেশিন
• খাওয়ার চামচ, কাঁটাচামচ এবং ছুরি • প্লেট • বাটি • পরিবেশনের চামচ • পানির জগ • পানির গ্লাস	• ছুরি- ভিন্ন কাজে ভিন্ন ছুরি ব্যবহার করা ভালো। • চপিং বোর্ড - সবজি এবং মাংসের জন্য চপিং বোর্ড আলাদা করা ভালো। • কড়াই- তরকারী রান্নার জন্য • হাড়ি- ভাত, স্যুপ, ডাল রান্নার জন্য • ফ্রাইং প্যান- ভাজি করার জন্য • স্কুইজার- ফলের রস করার জন্য • গ্রেটার- চীজ/সবজি কাটার জন্য • ভেজিটেবল পিলার- সবজি বা ফলের খোসা ছাড়ানোর জন্য	• ব্লেন্ডার- ফলের রস, মশলা পেস্ট বা গুড়া করার জন্য • প্রেসার কুকার- মাংস, ডাল রান্নার জন্য • রাইস কুকার- ভাত রান্না বা যেকোনো কিছু সিদ্ধ করার জন্য

কাজের ধারা

ধাপ ১- খাবার প্রস্তুতের আগে ভালো মতো বিশুদ্ধ পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধুঁয়ে নাও।
ধাপ ২- পূর্বে পরিকল্পিত খাদ্যতালিকা অনুযায়ী রেসিপি, খাদ্য উপাদান ও সরঞ্জামাদি বের করে নাও।
ধাপ ৩- খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত সমস্ত পৃষ্ঠ/স্থান এবং সরঞ্জাম পরিষ্কার কর নাও।
ধাপ ৪- চাল স্ট্রেইনারে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে ভালোমতো ধুয়ে হাড়িতে নিয়ে চুলায় বা রাইস কুকারে বসিয়ে দাও।
ধাপ ৫- সবজি ও ফল বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে ভালোমতো ধুয়ে নাও। নতুন কিনে আনা সবজি ও ফল পানিতে এক-তৃতিয়াংশ ভিনেগার মিশিয়ে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে ভালোমতো

ধুয়ে নাও। শাক জাতীয় সবজির নষ্ট পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে পানিতে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে তুলে ফেলতে হবে। সাবান দিয়ে সবজি ও ফল ধোয়া অস্বাস্থ্যকর।
ধাপ ৬- মাংসের অতিরিক্ত তেল/চর্বি ফেলে দিয়ে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে ভালোমতো ধুয়ে নাও।
ধাপ ৭- সবজি ও মাংস কাটার জন্য আলাদা ছুঁড়ি ও কাটিং বোর্ড বাছাই কর।
ধাপ ৮- রেসিপি অনুযায়ী সঠিক মাপে সবজি ও মাংস কেটে নাও।
ধাপ ৯- পূর্বে প্রস্তুত করে রাখা মশলা রেসিপি অনুযায়ী পরিমাপ করে রান্নার প্রক্রিয়া শুরু কর।
ধাপ ১০- উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত তাপমাত্রায় রান্না কর।
ধাপ ১১- রান্না শেষে সব ময়লা-আবর্জনা ঢাকনাযুক্ত ময়লা রাখার ঝুড়িতে ফেলে দাও এবং খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত সমস্ত পৃষ্ঠ/স্থান এবং সরঞ্জাম পরিষ্কার করে রাখো।
ধাপ ১২- উপযুক্ত পাত্র বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে ভালোমতো ধুয়ে খাবার পরিবেশন কর।
ধাপ ১৩- খাওয়ার সময় বয়স অনুযায়ী ব্যক্তির আদর্শ অবস্থান নিশ্চিত কর।
ধাপ ১৪- খাওয়া শেষে উচ্ছিষ্ট অংশ ঢাকনাযুক্ত ময়লা রাখার ঝুড়িতে ফেলে দাও এবং খাওয়ার স্থান ও ব্যবহৃত সমস্ত সরঞ্জাম ডিশওয়াশার দিয়ে পরিষ্কার করে জায়গা মত রেখে দাও। নিজের হাত বিশুদ্ধ পানি ও সাবান দিয়ে ধুঁয়ে নাও।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:
প্রশিক্ষণার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়কেবার অনুসরণ করে মলি প্রিপারশেন পদ্ধতি ও খাবার পরিবেশন দেখাতে পারবে।
ফলাফল বিশ্লেষণ ও মন্তব্য:
আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। খাদ্য কাকে বলে?

২। পুষ্টি কাকে বলে?

৩। খাদ্য নিরাপত্তা কি?

৪। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস কি ও কত প্রকার?

৫। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস কি ও কত প্রকার?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। খাদ্য কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ দাও।

২। পুষ্টি কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ দাও।

৩। বিভিন্ন ভিটামিনের একটি করে অভাবজনিত রোগ উল্লেখ কর।

৪। বিভিন্ন খনিজের একটি করে অভাবজনিত রোগ উল্লেখ কর।

৫। খাদ্য নিরাপত্তার মূলনীতি কয়টি ও কি কি?

৬। দুই ধরনের ভিন্ন উৎস (উদ্ভিদ ও প্রাণী) থেকে প্রোটিন মিশ্রিত করে তুমি বাড়িতে প্রস্তুত করতে পারবে এমন পাঁচটি খাবারের তালিকা কর। উদাহরণ- খিচুড়ি

নং.	খাবারের নাম	খাদ্য উৎস
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

৭। তুমি যে শেষ খাবারটি খেয়েছিলে তা মনে করে, নিম্নলিখিত কাজগুলো কর:

(i) তুমি যে সমস্ত খাবার খেয়েছো তার তালিকা কর।

(ii) ব্যবহৃত খাদ্য সামগ্রী (উৎস) সনাক্ত কর।

(iii) উপরের আইটেমগুলো থেকে, তাদের মধ্যে উপস্থিত ম্যাক্রো এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টসগুলো সনাক্ত কর।

নং.	খাবারের নাম	খাদ্য সামগ্রী (উৎস)	পুষ্টি উপাদান	
			ম্যাক্রো	মাইক্রো

৮। গত ২৪ ঘণ্টায় তুমি কি কি খেয়েছো তা চিন্তা করে নিচের ছকটি সম্পন্ন কর এবং বিবেচনা কর যে তুমি প্রতিদিন সুষম খাদ্য খাচ্ছো কি না:

খাবারের সময়	খাদ্য সামগ্রী	খাদ্য উপাদান			
		শাক-সবজি	কার্বোহাইড্রেট	প্রোটিন	ফ্যাট
	উদাহরণ: সিরিয়াল এবং দুধ	☐	☒	☐	☒
সকালের নাস্তা		☐	☐	☐	☐
সকালের নাস্তা		☐	☐	☐	☐
মধ্যাহ্নভোজ		☐	☐	☐	☐
বৈকালিক নাস্তা		☐	☐	☐	☐
সন্ধ্যার খাবার		☐	☐	☐	☐
মোট দৈনিক অংশ					

রচনামূলক প্রশ্ন

১। খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা কি?

২। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস সম্পর্কে যা জানো লেখ।

৩। শিশু / প্রাপ্তবয়স্ক / বয়স্কদের খাদ্যগ্রহণের আদর্শ অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

৪। টিকা: সুষম খাদ্য

৫। সারাদিনের খাবারের পরিমাণ বিবেচনা করে কি উপায়ে সুষম খাদ্যতালিকা তৈরি করা যায়?

৬। পাশে একটি অসম্পূর্ণ চিত্র দেওয়া আছে। চিত্রটি সম্পন্ন কর ও লেবেলিং কর।

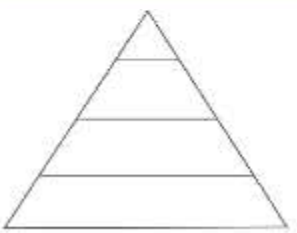

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাউজকিপিং এর ধারণা

Basic Concepts of Housekeeping

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা একটি ভালো অভ্যাস। এ অভ্যাস সকলের সমানভাবে রপ্ত করতে হয়। পেশাগত জীবনে কর্মস্থলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হাউজকিপিং-এর একটি বড় প্রায়োগিক ক্ষেত্র। হেলথকেয়ার ইনডাস্ট্রি একটি সেবামূলক খাত। হাসপাতাল, ক্লিনিক বা বাসাবাড়িতে রোগীর সেবা করার সময় হাউজকিপিং বা ব্যক্তিগত ও কর্মক্ষেত্রের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় রোগীর স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্র জীবাণুমুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার জন্য কতিপয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলতে হয়। কোনো একক ব্যক্তি বা দলের পক্ষে সব কিছু পরিচ্ছন্ন, ছিম ছাম ও সুন্দর রাখা সম্ভব নয়। এজন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে কিভাবে একজন কেয়ারগিভার হাউজকিপিং-এর মৌলিক দক্ষতাগুলো প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- হাউজকিপিং কী তা বলতে পারবো
- হাউজকিপিং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যখ্যা করতে পারবো
- হাউজকিপারের কাজ বর্ণনা করতে পারবো
- হাউজকিপিং এর বিভিন্ন সরঞ্জামাদি চিহ্নিত করতে পারবো
- জীবাণুমুক্ত কর্মস্থল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পরিষ্কারকরণের সাধারণ নিতিমালা উল্লেখ করতে পারবো
- রোগীর থাকার যায়গা পরিষ্কার রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারবো
- রোগীর বিছানা তৈরি করতে পারবো
- ক্লিনিং আইটেম সংরক্ষণ করতে পারবো

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা রোগীর বিছানা তৈরি করতে পারবো। জব সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই আমরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানবো।

২.১ হাউজকিপিং (Housekeeping)

হাউজকিপিং শব্দের অর্থ কর্মস্থল সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা ও তার সঠিক তত্ত্বাবধায়ন করা। এটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক কর্মকান্ড বুঝায় যার মাধ্যমে যেকোনো সেবামূলক খাতে নিরাপদ, আরামদায়ক ও সম্মানজনক উপায়ে ক্লায়েন্টের সেবা দেওয়া সম্ভব হয়। হাউজকিপিং সেবাটি বেশিরভাগ সময়ে হোটেল ও হসপিটালিটি ইন্ডাষ্ট্রিতে প্রয়োগ করা হলেও বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা খাতেও এর ব্যাপক প্রচলন বাড়ছে। কারণ রোগীর সুস্থতার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমক্ত সুন্দর পরবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় বিভিন্ন বড় বড় হাসপাতালে হাউজকিপিং নামে আলাদা ডিপার্টমিন্টই থাকে। তা সত্ত্বেও ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিষ্ট, প্যাথোলোজিষ্ট এরকম প্রত্যেকেই নিজের কর্মপরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট হাউজকিপিং কর্মকান্ডের সাথে অবশ্যই জড়িত। নার্সগণ কিছু কিছু কাজ সম্পাদন করে থাকেন যেগুলো সরাসরি হাউজকিপিং-এর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী বেড মেকিং করে দেওয়া, বিছানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তদারকি করা, ময়লা বিছানার চাদর ওয়াশের জন্য লন্ড্রিতে পাঠানো এবং নতুন চাদর রোগীদের জন্য সরবরাহ করা প্রভৃতি। মূলত হাসপাতালে রোগীর সেবায় পরিষ্কার-পরচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্ত রাখার সাথে সবাই জড়িত। ঠিক তেমনিভাবে কেয়ারগিভারকেও দক্ষতার সাথে হাউজকিপিং সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যাবতীয় কাজ করতে হয়।

২.১.১ একজন হাউসকিপারের কাজ কী?

হাউজকিপিং-এর প্রাথমিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে কেয়ারগিভারকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়।

- নিয়মিত রোগীর রুম, আসবাবপত্র পরিষ্কার করা, বিছানার চাদর ও বালিশের কাভার ময়লা হলে বদলে দেওয়া
- টয়লেটে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (যেমন, সাবান, তোয়ালে ও টয়লেট পেপার) সরবরাহ করা
- রুম থেকে আবর্জনার বিন সংগ্রহ করে নির্ধারিত জায়গায় রেখে আসা
- রোগীর রুমের কিংবা কোনো সরঞ্জামের কোনো ক্ষতি হলে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে জানানো
- রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা
- পরিষ্কার করার সরঞ্জামের (যেমন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার) রক্ষণাবেক্ষণ করা

কেয়ারগিভারকে হাসপাতাল ও বাসা দুই জায়গাতেই হাউজকিপিং-এর কাজগুলো সম্পন্ন করতে হয়। যেখানেই হউকনা কেনো কেয়ারভিরের জন্য প্রযোজ্য হাউজকিপিং-এর মৌলিক কাজগুলো একই রকম। স্বাস্থ্য খাতে কাজ করতে গেলে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ও সংক্রামক রোগ থেকে নিজেকে এবং অন্যকে রক্ষা করে যেতে হয়। এজন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবানুমুক্তকরণ একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এ সম্পর্কে

আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত জেনেছি। দেখা গেছে কর্মস্থল ও বাসাবাড়িতে কিছু কিছু স্থানে জীবানুর ব্যাপকতর উপস্থিতি বিদ্যমান। যেমন:

১। রোগীর বিছানা ও বালিশ
২। বিছানার পাশের লকার
৩। ব্লাড প্রেসার ও স্টেথোস্কোপ মেশিন
৪। টয়লেট কমোড
৫। দরজার হাতল বা নব
৬। টেলিভিশন রিমোট, টেলিফোন, বেসিন প্রভৃতি।

২.১.২ পরিষ্কার করার সাধারণ নিতিমালা

পরিস্কারের আগে

- অতিরিক্ত সতর্কতা নেয়ার জন্য পরিবেশ পরীক্ষা করতে হবে।
- নির্দেশিত সতর্কতা অনুসরণ করতে হবে।
- পরিষ্কার করার আগে ছড়ানো ছিটানো জিনিষপত্র থাকলে সেগুলো আগেই সরিয়ে বা গুছিয়ে রাখতে হবে।
- পরিষ্কারক পদার্থ পাতলা করার জন্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে।
- ঘরে প্রবেশ করার আগে পরিষ্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘরে ঢোকার আগে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

পরিস্কারের সময়

- সর্বনিম্ন নোংরা এলাকা (নিম্ন স্পর্শ) থেকে সর্বাধিক নোংরা এলাকায় (উচ্চ স্পর্শ) এবং উচ্চ পৃষ্ঠ থেকে নিম্ন পৃষ্ঠে পরিষ্কার করতে হবে।
- পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার আগে খালি চোখে দেখা যায় এমন বর্জ্য আগে অপসারণ করতে হবে।
- অণুজীব ছড়ানো রোধ করতে বা কমাতে কোনো কিছু ঝাড়া যাবে না।
- কখনই মপস ও ডাস্টার ঝাঁকানো যাবে না।
- ভেজা/স্যাঁতসেঁতে মপ ব্যবহারের আগে শুকনো ডাস্টার দিয়ে মুছে নিতে হবে।
- ভেজা মোপিং করার আগে পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
- মপের কাপড় 'ডাবল-ডিপ' করা উচিৎ নয় (পরিষ্কার দ্রবণে শুধুমাত্র একবার মপটি ডুবিয়ে নিতে হবে, কারণ এটি একাধিকবার ডুবিয়ে দিলে এটি পুনরায় দূষিত হতে পারে)
- দ্রবণে মপ পুনরায় ডুবানোর আগে ১২০ বর্গফুট এলাকা মুছতে হবে।
- ১২০ বর্গফুট এলাকা পরিষ্কার করার পরে পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত তরল পরিবর্তন করতে হবে
- মপ পরিবর্তন করতে হয় নিম্নোক্ত ঝুঁকির তালিকা অনুযায়ী:
    - উচ্চ ঝুকিপূর্ণ স্থান: প্রত্যেক শিফটে
    - মধ্যম ঝুকিপূর্ণ স্থান: প্রতিদিন

- নিম্ন ঝুকিপূর্ণ স্থান: সপ্তাহে অন্তত একদিন

- প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুযায়ী পরিষ্কার সমাধান বা পরিবর্তন করতে হয়। ভারী দূষিত এলাকায় ঘন ঘন, যখন দৃশ্যত নোংরা হয় এবং রক্ত ও শরীরের তরল ছিটকে পরিষ্কার করার পরপরই পরিবর্তন করতে হয়।
- সূঁচ এবং অন্যান্য ধারালো বস্তুর জন্য সতর্ক থাকতে হবে। পাংচার প্রুফ পাত্রে শার্পগুলো নিরাপদে হ্যান্ডেল এবং ডিসপোজ করতে হবে। সুপারভাইজারকে প্রয়োজনে রিপোর্ট করতে হবে।
- বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দেশিত প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখতে হবে, হাত দিয়ে ময়লাপূর্ণ ব্যাগে সংকুচিত করা যাবে না।
- রোগীর কক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে।

পরিষ্কারের পর:

- রুম জিনিসপত্র দিয়ে অতিরিক্ত বোঝাই করা যাবে না।
- পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলো ব্যবহারের পর অবশ্যই পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- মপের মাথা ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- পুনঃব্যবহারের আগে সমস্ত ধোয়া মপ হেড অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

২.১.৩ রোগীর থাকার যায়গা পরিষ্কার করা

বাসা হউক কিংবা হাসপাতালে হউক, রোগীর থাকা ও বিচরন যায়গা পরিষ্কার রাখা কেয়ারগিভারের দায়িত্ব। এ পরিষ্কার করাটা পরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী করতে হয়। যেমন:

১। মূল্যায়ন

- অতিরিক্ত সতর্কতা লক্ষণ পরীক্ষা কর এবং নির্দেশিত সতর্কতা অনুসরণ কর।
- কি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন (যেমন, টয়লেট পেপার, কাগজের তোয়ালে, সাবান, অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড রাব (গ্লাভস, ধারালো পাত্র) এবং কোনো বিশেষ উপকরণ প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করতে রোগীর বা স্বজনদের সাথে কথা বলতে হবে এবং নিজে পর্যালোচনা করতে হবে।

২। সরবরাহ সংগ্রহ

- পরিষ্কার কাপড়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুসারে নতুন জীবাণুনাশক দ্রবন প্রস্তুত করতে হবে।

৩। হাত ধুয়ে গ্লাভস পরে নিতে হবে।

৪। পরিষ্কার ঘর, পরিষ্কার থেকে নোংরা এবং ঘরের উঁচু থেকে নিচু যায়গায় কাজ করা:

- প্রতিটি রোগীর বিছানার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য ভালো কাপড় ব্যবহার করতে হবে
- দরজা, দরজার হাতল, পুশ প্লেট এবং ফ্রেমের স্পর্শ করা জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে হয় আগে।

- দৃশ্যমান ময়লা আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- বৈদ্যুতিক সুইচ পরিষ্কার করতে হবে।
- চেয়ার, জানালার সিল, টেলিভিশন, টেলিফোন, কম্পিউটার কীপ্যাড, ওভার বেড টেবিল ইত্যাদি সহ রুমের সমস্ত আসবাব এবং অনুভূমিক পৃষ্ঠগুলো পরিষ্কার করতে হবে।
- সাকশন বোতলের উপরিভাগ, ইন্টারকম এবং রক্তচাপ ম্যানোমিটারের পাশাপাশি স্যালাইনের স্টান্ড থাকলে সেগুলো মুছতে হবে।
- বেডরেইল এবং কলিং বেল পরিষ্কার করতে হবে।
- বাথরুম ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ঘরের মেঝে ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবানুমক্ত করতে হবে।

৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- ময়লা কাপড় ধোয়ার জন্য নির্ধারিত পাত্রে করতে হবে।
- ধারালো বর্জ্য রাখার পাত্র দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হলেই সেগুলো যথাস্থানে ফেলে পাত্রটি খালি করতে হবে।
- নির্ধারিত কালার কোডের বিনে বর্জ্য ফেলতে হবে।
- নিয়মিতভাবে বর্জ্য অপসারণ করতে হবে।

৬। সবশেষে নিজেকে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৭। প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষ্কারক জিনিসপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, যেমন: টিস্যু, সাবান, ডিটারজেন্ট, গ্লাস ক্লিনার, টাওয়েল, মপ, ডাস্টার প্রভৃতি।

২.২ গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয়

গৃহের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, নিরাপদে চলাফেরা, আরাম ও বিশ্রামের জন্য গৃহ পরিবেশ পরিষ্কার-পরচ্ছন্ন, পরিপাটি রাখা প্রয়োজন। গৃহে এরকম পরিবেশ বজায় রাখলে রোগীর জন্য গৃহ নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। বাড়ির পরিবেশ যদি নিরাপদ না থাকে তবে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে কেয়ারগিভারের করণীয় বিষয়সমূহ হচ্ছে:

- আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখা, যাতে করে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে রোগীর কোনো অসুবিধা না হয়।
- কোনো আসবাবপত্র ভেঙে গেলে সেটা সরিয়ে ফেলা বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করা।
- গৃহে চলাচলের জায়গায়, সিঁড়িতে, টয়লেটে, রান্নাঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রাখা।
- সিঁড়ি, বেলকোনি ও ছাদের চারপাশে রেলিং এর ব্যবস্থা রাখা
- বাথরুম, রান্নাঘর, গোসল খানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মেঝে যাতে পিচ্ছিল না থাকে সে জন্য ঝাড়ু বা ব্রাশ দিয়ে ঘষে শ্যাওলা বা পিচ্ছিল পদার্থ দূর করা।
- মেঝেতে কাচের টুকরা, পিন, সুচ ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখলে সাথে সাথে তা তুলে নিরাপদ স্থানে ফেলা।

- ঘরের মেঝেতে পানি পড়লে সাথে সাথে মুছে ফেলা।
- ছুরি, কাঁচি, বটি, নেইল কাটার এরকম ধারালো বস্তু কাজ শেষে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা। রোগী বা শিশুদের কাছ থেকে নিরাপদ অবস্থানে রাখতে হবে।
- রান্নাঘরের ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিন বা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।
- বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গেলে বা সুইচ ভেঙে গেলে তা মেরামত করার জন্য সাথে সাথে যথাযথ ব্যক্তিকে অবহিত করা।

পরিবারের অন্যান্যদের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা ছাড়া রোগীর কক্ষে তথা গৃহে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা কেয়ারগিভারের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা। এজন্য এসকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে রোগীর স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত করা কেয়ারগিভারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

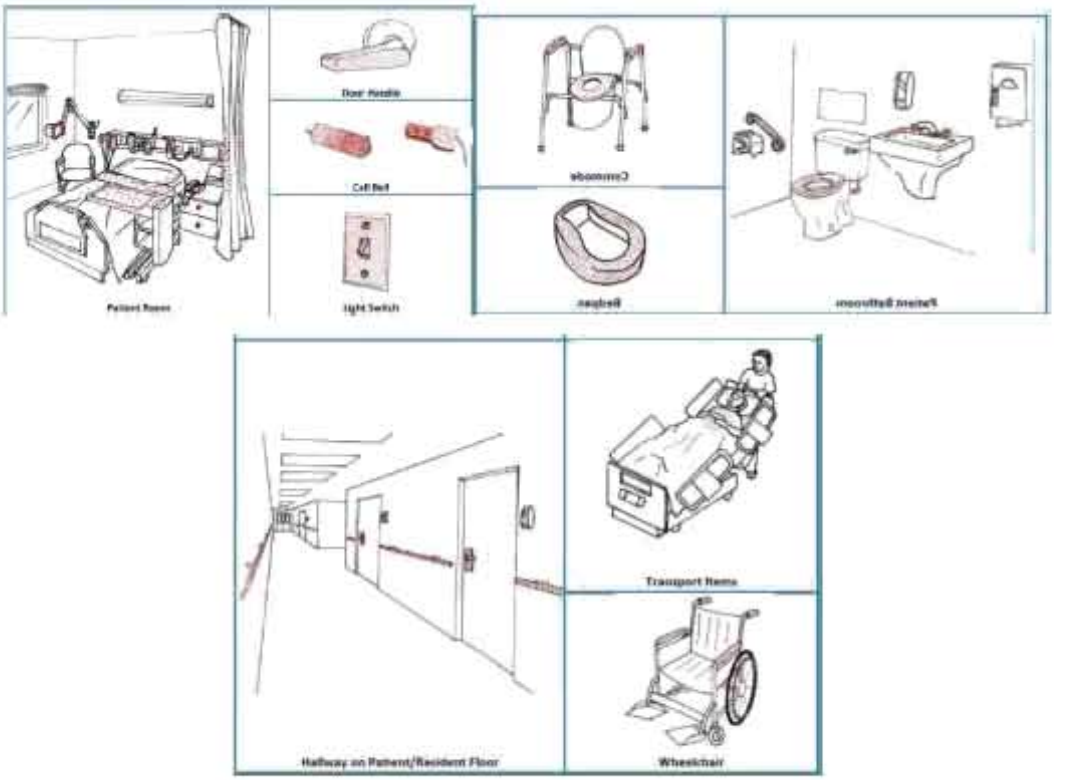

চিত্র ২.১: নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন এরকম কিছু স্থান

২.২.১ রোগীর ঘর বা বেডরুম পরিষ্কার করা:

বাড়িতে একজন রোগী বেশিরভাগ সময় তার শোবার ঘরেই অবস্থান করে থাকেন। আবার হাসপাতালেও রোগীরা একটি নির্দিষ্ট কক্ষে অবস্থান করেন। উভয় ক্ষেত্রেই মৌলিক কার্যাবলি একই রকম। এই অংশে আমরা হোম কেয়ার সেটিংসে রোগীর শোবার ঘর পরিষ্কারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবো। রোগীর শোবার ঘর পরিষ্কারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

১. বিছানা, বিছানার চাদর ও বালিশ ইত্যাদি প্রস্তুত করা ও গুছিয়ে রাখা
২. বিছানা ও বিছানার চারপাশ পরিষ্কার করা
৩. বিছানার পাশে অবস্থিত আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখা
৪. অন্যন্য আসবাব, চেয়ার, টেবিল, ওয়াল কেবিনেট, আলমারি, ওয়্যারড্রোব ইত্যাদি পরিষ্কার করা
৫. ড্রেসিং টেবিল, সাইড টেবিল, সোফা ইত্যাদি গুছিয়ে রাখা
৬. কার্পেট পরিষ্কার করা
৭. মেঝে মুছে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখা

এর মধ্যে ঘরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি স্থাপন ও পুনঃস্থাপনও অন্তর্ভুক্ত। সার্বিক কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো রোগীর জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা

২.২.২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পন্য ও সরঞ্জাম ব্যবহার করা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পন্য ও সরঞ্জাম সঠিক উপায়ে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হয়। কখন কোনো ধরনের পদার্থ ব্যবহার করতে হবে সেটি জানতে হয়, যার মধ্যে আছে বেডরুম পরিষ্কার করার ৪টি মৌলিক এজেন্ট যথা:

১. সাধারণ পরিষ্কার ও চেয়ার টেবিল মোছার জন্য ক্লিনিং এজেন্ট
২. সাবান ও ডিটারজেন্ট দেওয়া পানি গোসল করা, ধোয়া, কাপড় কাচা ও থালা-বাসন মাজার জন্য ব্যবহার করা হয়
৩. পরিষ্কার করা কঠিন এমন জায়গাগুলোকে ঘষে পরিষ্কার করার জন্য ক্লিনসার
৪. বিশেষ জিনিষপত্র পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ ধরনের ক্লিনিং এজেন্ট যেমন: গ্লাস ক্লিনার।

পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত পণ্যগুলো মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ থাকতে পারে। এজন্য এই কাজগুলো সর্বদা গ্লাভ্স ও অন্যন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করে সম্পাদন করা উচিৎ। রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কাজ করার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তারপর পরিষ্কার করতে হবে। অন্যথায় রাসায়নিক পদার্থটি ভালোমত কাজ নাও করতে পারে। বাথরুমের অভ্যন্তরের মেঝে, দেওয়াল বা অন্য কোনো পৃষ্ঠ জীবাণুমুক্ত করার জন্য যদি নির্দেশিত ক্যামিকেল না পাওয়া গেলে ব্লিচিং পাউডারের দ্রবন ব্যবহার করা যেতে পারে। কাজের শুরুতেই ব্লিচিং পাউডার দ্রবন তৈরি করে নেয়া উচিৎ প্রতিদিন।

ময়লা ফেলা বা ডিজপোসিং অফ ট্র্যাশ

রোগীর সেবায় এবং লাইট হাউজকিপিং করতে গেলে অনেক ময়লা আবর্জনা উৎপন্ন হতে পারে। পেশেন্ট কেয়ারে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে জেনেছি। বাসাবাড়িতেও অনেক সময় রোগীর সাথে সংশ্লিষ্ট ময়লা আবর্জনা ফেলার কাজটি কেয়ারগিভারকে করতে হয়। এ ময়লা আবর্জনা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের, যেমন: খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ, বডি ফ্লুইড্স, কাগজের টুকরা বা অন্যান্য শুকনো আবর্জনা, ঔষধের খালি প্যাকেট ইত্যাদি। প্রতিদিনের ময়লা ট্র্যাশব্যাগে ভালোমতো বেঁধে ডাস্টবিনে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় ঘর দূর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং বিভিন্ন রোগ জীবানুর আবির্ভাব ঘটতে পারে।

২.৩ স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত কতিপয় আসবাবপত্র

স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত আসবাবপত্র সমূহকে মূলত মেডিকেল ফার্নিচার বলা হয়। এর পাশাপাশি সাধারণ ফার্নিচারও ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন:

ক. এডজাস্টেবল বেড, যেগুলো রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী উপর-নিচে, সামনে-পিছনে সরিয়ে এডজাস্ট করা যায়। এর সাথে থাকে বিশেষ রোগীর জন্য বিশেষ ধরনের বেড যেমন: এইর বেড, বিকল্প প্রেসার বেড, অপারেশন বেড, ডেলিভারি বেড, চাইল্ড কেয়ার বেড ইত্যাদি।
খ. ওভার বেড টেবিল, বিশেষ ধরনের টেবিল যেগুলো রোগীর বিছানার পাশ বা উপর দিয়ে রোগীর কাছ পর্যন্ত নেয়া যায়। বিছানায় বিভিন্ন স্বাভাবিক কাজকর্ম যেমন: খাওয়া, মুখ ধোয়া, লেখাপড়া করা প্রভৃতি কাজে এগুলো বেশ উপযোগী।
গ. পেশেন্ট ওয়্যারড্রোব যেখানে রোগীর ঔষধপত্র, টেস্ট রিপোর্ট ইত্যাদি রাখা হয়।

চিত্র: 2.2 এডজাস্টেবল পেশেন্ট বেড (হসপিটাল বেড)

অন্যান্য জিনিষপত্র যেমন: বাথিং ব্রাংকেট, ড্র শীট, বেড প্রটেক্টর, ফোম প্যাড, ফুট বোর্ড বা ফুট রেস্ট, বিছানার রেলিং বা সাইড রেইল ইত্যাদি

২.৪ বেড মেকিং-এর পদ্ধতি

সুন্দরভাবে রোগীর প্রয়োজন ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী নির্দেশিতভাবে বিছানা প্রস্তুত করাকেই মেডিকেলের পরিভাষায় বেড মেকিং বলা হয়। রোগীর বিছানা অনেক ধরনের হতে পারে যেমন: ক্লোজড বেড, ওপেন বেড, এডমিশন বেড, অকুপাইড বেড, অপারেশন বেড, কার্ডিয়াক বেড, ফ্র্যাকচার বেড, এম্পুটেশন বেড প্রভৃতি। বেড মেকিং বা বিছানা প্রস্তুত ও টিপ-টপ রাখা একজন কেয়ারগিভারের অত্যাবশ্যকীয় একটি দায়িত্ব। নিচে এর কিছু সাধারণ ধাপ উল্লেখ করা হলো:

১. বেড মেকিং এর প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে, যেমন: বেডশীট, রাবার শীট, বালিশ, বালিশের কাভার ইত্যাদি।
২. রোগীর কাছে গিয়ে সম্ভাষণ করে অনুমতি নিতে হবে এবং কি করতে চাচ্ছি তার বিবরণ দিতে হবে।
৩. রোগীর প্রাইভেসি রক্ষা করতে হবে।

৪. রোগী যদি সচেতন হয় ও সহযোগীতা করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে বিনয়ের সাথে বিছানা থেকে নেমে অন্য কোথায় বসতে বলতে হবে। সেক্ষেত্রে ওপেন বেড প্রস্তুত করতে পারবো। আর যদি রোগী অচেতন হন অথবা বিছানা থেকে নামতে না সক্ষম হন তাহলে আমরা প্রস্তুত করবো অকুপাইড বা আবদ্ধ বেড, অর্থাৎ যে বেডে রোগী ইতোমধ্যেই আছেন।

চিত্র ২.৩: বিভিন্ন ধরনের পেশেন্ট বেড

ওপেন বেড মেকিং এর ধাপসমূহ

১. প্রথমেই বালিশ কাভার খুলে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে বালিশটিকে শুকনো ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে।

২. টপ শীট, ড্র শীট, ম্যাকিনটোশ (যদি থাকে) সরিয়ে নিয়ে ময়লা রাখার পাত্রে রাখতে হবে।

৩. রোল করে বা ভাঁজ করে ব্যবহৃত চাদরটিও সরিয়ে নিতে হবে। কোনোভাবেই এটিকে জোরে ঝাড়া যাবে না।

৪. শুকনো ডাস্টার দিয়ে ম্যাট্রেসটি পরিষ্কার করতে হবে।

৫. এরপর পরিষ্কার বিছানার চাদর বিছিয়ে ম্যাট্রেসের চারপাশে ভালোভাবে গুজে দিতে হবে যাতে কোথাও কোনো অংশ কুচকে না থাকে।

৬. এরপর একে একে পরিষ্কার টপ শীট, ড্র শীট বা ম্যাকিনটোশ প্রয়োজন মত বিছিয়ে দিতে হবে

চিত্র ২.৪: ওপেন বেড করার নিয়ম

ক্লোজ্‌ড বেড মেকিং এর ধাপসমূহ

- রোগীকে এক পাশে আলতো করে রোল করে এমনভাবে সরিয়ে নিতে হবে যাতে রোগী কোনো ব্যথা না পায় বা পড়ে না যায়।
- এরপর বেডশীট উঠিয়ে ধীরে ধীরে রোল করে রোগীর কাছ পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে এবং নতুন বেড শীট সেই খালি জায়গায় অর্ধেকটা বা তার কম বিছিয়ে দিতে হবে।
- এরপর রোগীকে গড়িয়ে অন্যপাশে যেখানে আংশিক বিছানা চাদর পাতা হয়েছে সেখানে নিতে হবে।
- তারপর পুরানো বেডশীট বিছানার বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে।
- রোগীর শরীরের নিচ দিয়ে এবার আংশিক পাতা চাদরটি ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে বাকি অংশ জুড়ে বিছিয়ে দিতে হবে
- এরপর ওপেন বেডের মতই এটিকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে দিতে হবে যাতে করে কোনো কুচকানো কাপড় না থাকে।
- প্রয়োজনবোঁধে রাবার শীট, ড্র শীট, কম্বল ইত্যাদি সংযোজন করা যেতে পারে।
- যথাস্থানে প্রয়োজনমত বালিশ রাখতে হবে এবং রোগীকে আরামদায়ক অবস্থানে যেতে সহায়তা করতে হবে।
- গ্লাভ্‌স খুলে ময়লা বেড শীট ধোপাখানায় বা বাড়িতে ধোয়ার জন্য দিতে হবে।
- সবশেষে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিতে হবে।

জব শীটঃ বেড মেকিং এর পদ্ধতি

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুল্‌স, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন): নতুন বিছানার চাদর, বালিশ ও বালিশের কাভার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ম্যাকিনটোশ, টপ শীট, ড্র-শীট, ময়লা ফেলার বিন ইত্যাদি।

কাজের ধারা: সাধারণ নির্দেশনা-

১. বেড মেকিং এর প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে, যেমন: বেডশীট, রাবার শীট, বালিশ, বালিশের কাভার ইত্যাদি।
২. রোগীর কাছে গিয়ে সম্ভাষণ করে অনুমতি নিতে হবে এবং কি করতে চাচ্ছি তার বিবরণ দিতে হবে।

৩. রোগীর প্রাইভেসি রক্ষা করতে হবে।
৪. রোগী যদি সচেতন হয় ও সহযোগীতা করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে বিনয়ের সাথে বিছানা থেকে নেমে অন্য কোথায় বসতে বলতে হবে। সেক্ষেত্রে ওপেন বেড প্রস্তুত করতে পারবো। আর যদি রোগী অচেতন হন অথবা বিছানা থেকে নামতে সক্ষম না হন তাহলে আমরা প্রস্তুত করবো অকুপাইড বা আবদ্ধ বেড, অর্থাৎ যে বেডে রোগী ইতোমধ্যেই আছেন।

ওপেন বেড মেকিং এর ধাপসমূহ

১. প্রথমেই বালিশ কাভার খুলে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে বালিশটিকে শুকনো ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে।
২. টপ শীট, ড্র শীট, ম্যাকিনটোশ (যদি থাকে) সরিয়ে নিয়ে ময়লা রাখার পাত্রে রাখতে হবে।
৩. রোল করে বা ভাঁজ করে ব্যবহৃত চাদরটিও সরিয়ে নিতে হবে। কোনোভাবেই এটিকে জোরে ঝাড়া যাবে না।
৪. শুকনো ডাস্টার দিয়ে ম্যাট্রেসটি পরিষ্কার করতে হবে।
৫. এরপর পরিষ্কার বিছানার চাদর বিছিয়ে ম্যাট্রেসের চারপাশে ভালোভাবে গুজে দিতে হবে যাতে কোথাও কোনো অংশ কুচকে না থাকে।
৬. এরপর একে এক পরিষ্কার টপ শীট, ড্র শীট বা ম্যাকিনটোশ প্রয়োজন মত বিছিয়ে দিতে হবে

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: প্রশিক্ষণার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার পর রোগীর বিছানা প্রস্তুত বা বেড মেকিং এর ধাপসমূহ সম্পন্ন করতে পারবে।

ফলাফল বিশ্লেষণ ও মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.হাউজকিপিং বলতে কি বুঝায়?
২.হাউজকিপিং সংক্রান্ত কেয়ারগিভারের মৌলিক ৫ টি কাজের নাম লিখ।
৩.কর্মস্থল ও বাসাবাড়িতে জীবানুর ব্যাপকতর উপস্থিতি বিদ্যমান এরকম পাঁচটি স্থান ও বস্তুর নাম লিখ।
৪. বেড মেকিং কি? কত প্রকার ও কিকি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রোগীর বেডরুম পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় খেয়াল রাখা উচিৎ?
২. ওপেন বেড ও ক্লোজ্ড বেড কি? সংক্ষেপে লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিষ্কার করার সাধারণ নীতিমালা বর্ণনা কর।
২. গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তা রক্ষায় কেয়ার গিভারের করণীয় কী? বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়
কমিউনিকেশন এন্ড কাউন্সেলিং
Communications and Counseling

মানুষ পৃথিবীতে আর্বিভাবের পর থেকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। মানুষ একে অপরের সাথে শব্দ বা বাক্যের বিনিময়ে ইশারায়, আকারে ইঙ্গিতে বা সাংকেতিক ভাষায় যোগাযোগ রক্ষা করে। বর্ণমালা আবিষ্কারের পর মানুষ লিখিত যোগাযোগের প্রচলন ঘটায়। পরবর্তীতে যোগাযোগ প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে যোগাযোগ মাধ্যমের বিপ্লব ঘটে। বর্তমানে, রেডিও, টেলিভিশন, প্রিন্ট মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যোগাযোগ মাধ্যমকে করেছে অধিক গতিশীল। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমেই রোগীকে নিরাপদ সেবা দিতে পারে। এর সাথে আছে রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের অনুপ্রেরণা দেওয়া ও কাউন্সেলিং করা। এই অধ্যায়ে আমরা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানদের জন্য প্রযোজ্য কার্যকর যোগাযোগ ও কাউন্সেলিং-এর মৌলিক কিছু বিষয় আলোচনা ও অনুশীলন করবো।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- যোগাযোগের বিভিন্ন ধরন বর্ণনা করতে পারবো
- কেয়ারগিভারের কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবো
- হেলথ কেয়ার টীমের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবো
- রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের মোটিভেশন ও কাউন্সেলিং সেবা দিতে পারবো
- সেবা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার উত্তর পেশাদারিত্বের সাথে দেওয়ার কৌশল অনুশীলন করতে পারবো

- রোগী ও তার পরিবারের সদস্যেদের চ্যালেঞ্জিং আচরণ মোকাবেলার কৌশল অনুশীলন করতে পারবো

৩.১ যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন (Communication)

যোগাযোগ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Communication. এই Communication শব্দটি ল্যাটিন Communicare থেকে এসেছে। যোগাযোগ বলতে আমরা একে অপরের সাথে ভাবের এবং তথ্যের আদান প্রদানকে বুঝে থাকি। Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে, যোগাযোগ বলতে বুঝায় কোনো কিছু জ্ঞাত করা, প্রদান করা এবং অংশ গ্রহণ করা। যোগাযোগের কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো:

- যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তথ্য, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধারণা কিংবা মতামত অর্থবহ ও কার্যকরীভাবে কথা, লেখা বা আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে।
- দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ধারণা, ইচ্ছা, অনুভূতি ইত্যাদি বোধগম্য আকারে বিনিময় করাকে যোগাযোগ বলে।
- যোগাযোগ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, বিশ্বাস, অনুভূতি, ধারণা ইত্যাদি এমনভাবে বিনিময় করা হয় যেন, প্রেরক ও প্রাপক উভয়েই যোগাযোগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সাধারণ সমঝোতায় পৌঁছায়।

যোগাযোগের প্রাথমিক ধারণা সকল ব্যক্তি, শ্রেণি বা পেশাজীবিদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। একজন শুস্রুসাকারীকে যোগাযোগের দক্ষতাগুলো খুব ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সর্বাত্বক চেষ্টা করতে হবে। সেবামূলক পেশায় কার্যকর যোগাযোগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অধ্যায়ে আমরা যোগাযোগের প্রাথমিক ধারণা লাভের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট, তার পরিবার ও হ্যাল্‌থ কেয়ার টীমের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং এর বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো।

যোগাযোগ কেন করা হয়?

যোগাযোগ করা হয় অনেক কারণেই। মোট কথা বলতে গেলে নিচের পয়েন্টগুলো উল্লেখযোগ্য:

- তথ্য প্রচার বা আদান-প্রদান করা
- কাউকে কোনো নতুন বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা বা জানানো
- একে অন্যের মতামত ও ধারণা বোঝা
- নতুন কোনো বিষয় অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা
- কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রভৃতি।

৩.১.১ কার্যকর যোগাযোগ বলতে কি বুঝায়?

কার্যকর যোগাযোগ হল যোগাযোগের এমন এক অন্তর্নিহিত বিষয় যার মাধ্যমে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য সর্বোত্তম সফলতাকে বুঝানো হয়। সহজ কথায় বলতে গেলে, যখন একজন প্রেরকের বক্তব্য একজন প্রাপক সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারেন, তখন সংঘটিত হয় কার্যকর যোগাযোগ। মূলত যোগাযোগ বলতে কার্যকর যোগাযোগকেই বুঝানো হয়।

কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়া সম্ভবত সমস্ত জীবন দক্ষতা বা লাইফ স্কীল (Life Skill)-এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটিই আমাদের অন্যান্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রেরণে এবং আমাদেরকে কী বলা হয়েছে তা বুঝতে সক্ষম করে। তোমার যোগাযোগের দক্ষতা বিকাশ করা তোমার পেশাগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক সমাবেশ এবং এর মধ্যের সবকিছুতে তোমার জীবনের সমস্ত দিককে সহায়তা করতে পারে। ভালো যোগাযোগ দক্ষতা ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগতভাবে, তুমি যদি চাকরীর জন্য আবেদন কর বা নিয়োগকর্তার সাথে পদোন্নতির বিষয়ে বলতে চাও এক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো যোগাযোগ দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে। তোমার ব্যক্তিগত জীবনে ভালো যোগাযোগের দক্ষতা তোমাকে অন্যে বোঝার জন্য এবং জানার জন্য সহায়তা করে তোমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি করতে পারে।

৩.১.২ যোগাযোগ ব্যবস্থার উপাদানসমূহ

যোগাযোগ প্রক্রিয়া বলতে সফলভাবে তথ্য আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে গৃহীত কতগুলো ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড বা পদক্ষেপের সমষ্টিকে বুঝানো হয়। এই পদক্ষেপ বা কর্মকাণ্ডগুলোকে সহজ ভাষায় যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদান বলা হয় যেগুলোর মধ্যে প্রেরক, বার্তা, বার্তার এনকোডিং (Encoding), বার্তা গ্রহণকারী এবং বার্তাটির ডিকোডিং (Decoding)-এর মতো কতগুলো বিষয় জড়িত। নিচে যোগাযোগের এই সকল অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

১। **সূত্র:** যোগাযোগ সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে পূর্বের কোনো সূত্র থাকলে তা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। কেননা পূর্ব সূত্র কার্যকর বিষয়টির গতিশীলতা প্রদান করে। এই সূত্র হতে পারে শারীরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিংবা চিঠিপত্র বা দলিল পত্র।

২। **প্রেরক (এনকোডার বা সেন্ডার):** লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রেরক একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট। প্রেরকের সামাজিক পরিচিতি, ব্যক্তিগত পরিচিতি অনেক সময় তথ্য পেতে ভূমিকা রাখা এবং তথ্য দাতাকে প্রভাবিত করে।

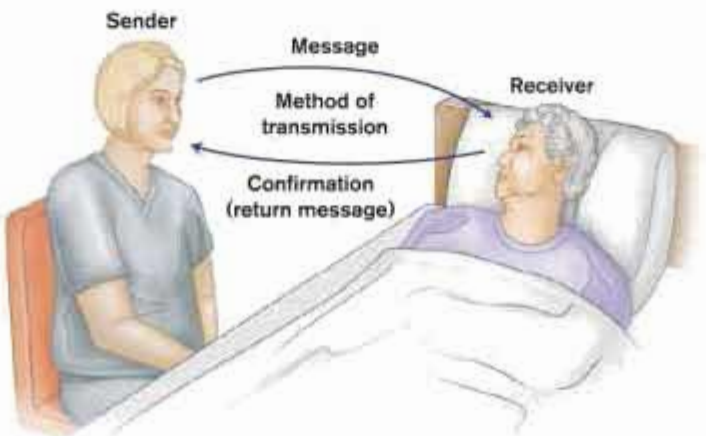

চিত্র ৩.১: কার্যকর যোগাযোগের মডেল

৩। বার্তা বা ম্যাসেজ: যোগাযোগ ব্যবস্থায় বার্তা বা ম্যাসেজ হলো মূল অনুসঙ্গ। বার্তা হতে হবে বোধগম্য, সরলীকরণ এবং সু-স্পষ্ট। কোনো কিছু লোকানো বা কূটকৌশল অবলম্বন করা যাবে না। বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগের প্রাসঙ্গিতা উল্লেখ করতে হবে। এবং কেন প্রয়োজন এবং কিকি কাজের যোগাযোগ করা হচ্ছে তা উল্লেখ থাকবে।

৪। মাধ্যম: কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় তৃতীয় কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় হাতে হাতে কিংবা নিজে স্ব-শরীরেও যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারে।বর্তমানে ইলেকট্রিক মাধ্যম জনপ্রিয়তার শীর্ষে।এছাড়া পূর্বের ন্যায় ডাক ব্যবস্থা প্রচলন আছে।

৫। প্রাপক বা ডিকোডার: যার কাছ থেকে তুমি তথ্য পাবে কিংবা যারকাছে বার্তা পাঠিয়েছ তাকে প্রাপক বা ডিকোডার বলে অর্থাৎ যিনি বা যে বা যন্ত্র তথ্য গ্রহণ করে তাকে প্রাপক বলা হয়। প্রাপকের কাছে তোমার প্রশ্ন পৌঁছা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রাপকের কাছে প্রশ্ন না পৌঁছালে তুমি তার থেকে প্রতিক্রিয়া পাবে না।

৬। ফিডব্যাক: ফিডব্যাক হলো তোমার জিজ্ঞাসিত তথ্যের উত্তরে প্রাপক যা বলেছে (রিপ্লাই প্রদান) করেছে তা। অর্থাৎ ফিডব্যাক হলো প্রশ্ন কর্তার উত্তরে প্রশ্নদাতা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ফিডব্যাক গুরুত্বপূণ। ফিডব্যাক না আসলে উপরের সবগুলো কর্ম ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হবে।

যোগাযোগের 4R

৩.১.৩ যোগাযোগের প্রকারভেদ

যোগাযোগ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোনো থেকে এটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যোগাযোগের একটি সহজতম প্রকারভেদ হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। Formal (ফরমাল) বা আনুষ্ঠানিক: আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মূলত কোনো পেশাগত বা দাপ্তরিক ক্ষেত্রে তথ্য আদান প্রদানকে বোঝায়। এক্ষত্রে যোগাযোগের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় খুব সতর্কতার সাথে। অফিসিয়াল মিটিং, দাপ্তরিক আদেশ বা পরিপত্র, রিপোর্ট প্রভৃতি এই ধরনের যোগাযোগের উদাহরণ। এ ধরনের ক্ষেত্রে কথা বলা বা সার্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষাগত, আচরণগত, পরিবেশগত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলতে হয়।

২। Informal (ইনফরমাল) বা অনানুষ্ঠানিক: এটি একটি নিত্ত নৈমত্তিক ও স্বাভাবিক যোগাযোগের প্রকারভেদ যেখানে আমাদেরকে খুব বেশি পেশাগত আচরণ অনুসরণ করতে হয়না। সুনির্দিষ্ট অফিসিয়াল বাধ্যবাদকতা না থাকায় এ ধরনের যোগাযোগ সাধারণত খুবই সতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক।

৩। **Verbal (ভারবাল) বা মৌখিক:** আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সবচেয়ে বেশি যে ধরনের যোগাযোগ করে থাকি, সেটি হচ্ছে ভার্বাল বা মৌখিক যোগাযোগ। মৌখিক যোগাযোগ যেভাবে স্থাপিত হয়ে থাকে সেগুলো হলো-

(ক) সামনা-সামনি সংলাপ বা আলাপ আলোচনা।

(খ) সভা সমাবেশ।

এটি আবার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এই দুই ভাবে বিভক্ত হতে পারে।

৪। নন ভার্বাল **(Non-verbal)** বা অ-মৌখিক যোগাযোগ: অ-মৌখিক যোগাযোগগুলো হলো-

(ক) একাধিক ব্যক্তির মধ্যে অঙ্গভঙ্গি বা শারীরিক ভাষা (সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ)

(খ) অভিব্যক্তি প্রকাশ।

(গ) হাত নাড়াচাড়া।

(ঘ) মাথা নাড়ানো।

(ঙ) বিশেষ পতাকা উত্তোলন।

(চ) সাংকেতিক চিহ্ন দেখানো।

৫। **Written (রিটেন) বা লিখিত:** লিখিত যোগাযোগও মৌখিক যোগাযোগের মত প্রয়োজনভেদে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এই দুই রকমের হতে পারে। লিখিত যোগাযোগগুলো হলো: প্রতিবেদন, বুলেটিন ও সাময়িকী বা ম্যাগাজিন, পরিপত্র জারি, নিউজ বা বার্তা, চিঠি-পত্র প্রভৃতি।

৬। **Visual (ভিজ্যুয়াল) বা দৃষ্টি সংক্রান্ত:** সজ্ঞানুযায়ী, ভিজ্যুয়াল যোগাযোগ হ'ল দক্ষতার সাথে কার্যকরভাবে অর্থ তৈরি করার জন্য তথ্যকে চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা। ইনফোগ্রাফিক্স, ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট, মোশন গ্রাফিক্স এরকম কয়েকটি নাম ভিজ্যুয়াল যোগাযোগের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার এর সাথে, শব্দ বা অডিও সংযোজন করে যে ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়, তাকে বলা হয় অডিও-ভিজ্যুয়াল (Audio Visual) কমিউনিকেশন।

যোগাযোগের আরো কিছু ধরন: যোগাযোগের উপরোক্ত প্রকারভেদ ছাড়াও আরো কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন:

নিচে এগুলো সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ: আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ হচ্ছে মুখোমুখি, বাচনিক এবং অবাচনিক উপায়ে দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, ধারণা ও অনুভূতি বিনিময় প্রক্রিয়া:

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য:

- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ ব্যক্তির পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ হচ্ছে নতুন স্বাস্থ্য আচরণের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য আচরণের চর্চা চালিয়ে যাওয়া
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ এবং কাউন্সেলিং করা হয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে, স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারী, সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে এবং কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে যা আসলে সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার জন্য একটি প্রধান উপাদান।
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ গণমাধ্যমে উপস্থাপিত/প্রচারিত বার্তা সমূহের পরিপূরক, যা বার্তাকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করে থাকে আবার আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগকে শক্তিশালী করার জন্য তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুইজনের মধ্যে যোগাযোগ: দুইজনের মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে এমন ধরনের যোগাযোগ যেখানে একজন সরাসরি আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করেন।

দলীয় যোগাযোগ: ব্যক্তি বা একটি দলের সাথে অপর একটি ব্যক্তি বা দলের যোগাযোগই হচ্ছে দলীয় যোগাযোগ। দলীয় যোগাযোগ পদ্ধতি হতে পারে :

- দলীয় আলোচনা
- দলীয় সভা
- বক্তৃতা

চিত্র ৩.২: একটি ভালো আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের উদাহরণ

চিত্র ৩.৩: একটি নিম্নমানের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের উদাহরণ

গণযোগাযোগ কি?

সমাজের সবার জন্য যোগাযোগ কার্যক্রমকে গণযোগাযোগ বলা যায়। গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা পৌঁছানো এবং তথ্য প্রচারের জন্য বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। যেমন- রেডিও,

টিভি, পত্রিকা ইত্যাদি। গণযোগাযোগে সাধারণত শ্রোতার সাথে বক্তার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে না এবং তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক পাওয়া যায় না।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিবেচ্য বিষয়:

- কার্যকরী/ সক্রিয়ভাবে শোনা
- এমনভাবে প্রশ্ন করা যাতে সেবাগ্রহীতা কথা বলতে উৎসাহিত হয়
- বাচনিক ও অবাচনিক উৎসাহ প্রদান
- সেবাগ্রহীতার সাথে সহজ ভাষায় কথা বলা যাতে একে অন্যকে বুঝতে পারে
- স্পষ্ট, সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান
- ব্যাখ্যাকরণ ও পুনরাবৃত্তিকরণ
- প্রতিবার্তা

৩.১.৪ মিডিয়া অফ কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের মাধ্যম

মিডিয়া হ'ল যোগাযোগ চ্যানেল বা সরঞ্জাম যা তথ্য বা ডেটা সঞ্চয় এবং সরবরাহ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'মিডিয়া' ও 'চ্যানেল' শব্দটি প্রায়শই সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সহজে বলা চলে যে, যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সকল চ্যানেল বা সিস্টেমের একটি সম্মিলিত নাম যার মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে মোবাইল, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে গণমাধ্যম যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সংবাদ পত্র, রেডিও-টেলিভিশন ও ইলেকট্রিক মিডিয়া। তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে একটি আলোচিত যোগাযোগ মাধ্যম। সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে বর্তমানে ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, ইনষ্টাগ্রাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর বার্তা আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে- ইমো, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াট্স অ্যাপ, ভাইভার, স্কাইপি ইত্যাদি অ্যাপগুলো ভালো অবস্থানে আছে। বর্তমান লিখিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইলেকট্রিক মেইল বা ই-মেইল গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ফ্যাক্স, টেলিফোনও ব্যবহার করা হচ্ছে আগের মত। যোগাযোগ ব্যবস্থায় মোবাইল কমিউনিকেশন এনেছে বিপ্লব। প্রতিটি ঘরে ঘরে মোবাইল ডিভাইসের আধিক্য চোখে পড়ার মত। মোবাইল কমিউনিকেশন ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। নিচে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত কয়েকটি অতি পরিচিত যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

১। লেটার: লেটার বা চিঠিপত্র যোগাযোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। নানা প্রয়োজনে আমাদেরকের চিঠিপত্র লিখতে হয়। বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে একে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে যথা: ব্যক্তিগত, সাময়িক ও ব্যবহারিক। ব্যক্তিগত পত্র সাধারণত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে লেখা হয়। আবার ব্যবহারিক পত্রাদি সাধারণত আবেদন-নিবেদন, অভাব-অভিযোগ, চাকরি-বাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে লেখা হয়।

২। রিপোর্ট: এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো প্রতিবেদন। রিপোর্ট হলো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে একদল সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে লিখিত বা মৌখিক আকারে কোনো কিছু দাখিল করা। প্রতিবেদনের সারমর্ম মৌখিক আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু পূর্নাঙ্গ বিবরন সাধারণত লিখিত আকারেই হয়ে থাকে।

৩। ই-মেইল: ই-মেইল তথা ইলেক্ট্রনিক মেইল হল ডিজিটাল বার্তা যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় একজন প্রেরক ও প্রাপক বিভিন্ন প্রয়োজনে লিখিত বার্তা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট

টেকনোলোজির মাধ্যমে নিমিশেই আদান-প্রাদন করতে পারেন। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ছাড়াও এই সুবিধা পেতে হলে অবশ্যই প্রয়োজন হয় একটি ই-মেইল আইডি বা ঠিকানার। ইমেইল ঠিকানা দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি হল ব্যবহারকারীর নাম। এর ঠিক পরপরই থাকে @ চিহ্নটি। তার পরে থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম। যেমন: abc@cde.com এই ঠিকানাটিতে abc হল ব্যবহারকারী নাম, cde.com হল ব্যবহারকারীর মেইল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম। জনপ্রিয় ই-মেইল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুগল, ইয়াহু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪। টেলিফোন বা মোবাইল: বর্তমান যুগের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল কিংবা টেলিফোন। তবে আনুষঙ্গিক অনেক সুবিধাদির জন্য মোবাইল ব্যবস্থাটিই বেশি জনপ্রিয়। টেলিফোন বা মোবাইল মানুষের মুখের কথা যুগপৎ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যার মাধ্যমে একে অপরের থেকে বহু দূরে অবস্থিত একাধিক ব্যক্তি মৌখিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। এগুলো সস্তা, সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করা যায়; এই সমস্ত সুবিধা অন্য কোনোও মাধ্যমে সম্ভব নয়।

৫। সোশ্যাল মিডিয়া: এটিকে এক কথায় বলা যায় যে এটি এমন ইন্টারনেট ভিত্তিক ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশান যার মাধ্যমে ইউজার কনটেন্ট (টেক্সট,ইমেজ,অডিও, ভিডিও, ইনফর্মেশন ইত্যাদি) বানাতে ও শেয়ার করতে পারে এবং সে তার মতামত জানাতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া গণযোগাযোগের একটি বৃহৎ অংশ দখল করে আছে। কয়েকটি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৬। বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মঃ এছাড়াও কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবসাইট ও রিসোর্স আছে, যা কাজে লাগিয়ে অনলাইনে যোগাযোগ করা যায়। এর মধ্যে বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যম উল্লেখযোগ্য।

৩.১.৫ যোগাযোগের বাধা (Communication Barrier)

নানা কারণে আমাদের যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। নিচে তিনটি প্রধান দিক তুলে ধরা **হলো:**

যোগাযোগকারী	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী	পরিবেশগত
• বয়স • মহিলা/পুরুষ • শিক্ষা • অর্থনৈতিক অবস্থা • ভাষা/ব্যবহৃত শব্দ • সময় জ্ঞান • সরবরাহ সামগ্রী বা লজিস্টিকস	• মানসিক অবস্থা • অনিচ্ছা • ভয়, লজ্জা • অনেক জানি ভাব • ভুল ধারণা • সময় • বাচ্চা বিরক্ত করা • লিংজনিত বাধা	• গোলমাল/বিশৃঙ্খলা • প্রাকৃতিক দুর্যোগ • যোগাযোগের স্থান (যেমন বেশি/কম আলো) • কথার মাঝখানে তৃতীয় কারো আগমন • ভৌগোলিক অবস্থান • সামাজিক বাধা ইত্যাদি

নির্দিষ্ট বাধা বিবেচনা করে কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি অনুশীলন করার মাধ্যমে যোগাযোগের এইসকল ব্যারিয়ার পরিহার করা সম্ভব। ক্রমাগত যোগাযোগ দক্ষতার উন্নতি সাধন ও অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে অনেক সহায়তা প্রদান করতে পারে। একজন ভালো যোগাযোগকারীর জন্য যোগাযোগের বাধাসমূহ এবং কিভাবে তা অতিক্রম করা যায় তা চর্চা করা খুবই দরকার।

৩.১.৬ ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপায়

ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিম্নের বিষয়গুলোর উপর খেয়াল রাখতে হয়:

- **সার্বিক বিষয় আয়ত্ব করা:** যেকোনো যোগাযোগ (আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক) শুরু করতে হলে সার্বিক বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা জরুরি, নচেৎযোগাযোগের উদ্দেশ্য ফলপ্রস্যু হয়না।
- **পরিবেশ:** অপজিশন পার্টি বা প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ সূচনার পূর্বে সার্বিক পরিবেশের উপর খেয়াল দেওয়া উচিৎ। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগের ধরন যদি সময়োপযোগী না করা হয় তাহলে হিতে বিপরতীত হতে পারে।
- **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ:** যোগাযোগ কি জন্য করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। সম্ভব হলে যার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে তাকে এবিষয়ে আগে থেকেই অবহিত করা জরুরি। তা না হলে ভালো ফল বা কাঙ্খিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।
- **শারীরিক ভাষা:** ফেস টু ফেস বা সরাসরি সাক্ষাতে যোগাযোগ করলে শারীরিক ভাষা হতে হবে স্বাভাবিক। অতিরিক্ত স্মার্ট, চনমনে ভাব কিংবা আগ্রাসী বা উগ্রভাব পরিহার করা বাঞ্চণীয়।
- **মনোযোগ ধরে রাখা:** যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় মনোযোগ ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।যোগাযোগে পূর্ণ মনোযোগ না থাকলে অনেকগুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনেক সময় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না বা মিসড হয়ে যেতে পারে।
- **কাঙ্খিত বা নির্ধারিত বিষয়ে প্রশ্ন সাজানো:** যোগাযোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে কাঙ্খিত বিষয়ে যথা সম্ভব আগে থেকেই প্রশ্ন তৈরি করে রাখতে হবে।
- **প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা:** প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও জরুরি।
- **গোপনীয়তা:** যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে, যাতে তথ্য দাতার মনে কোনোরূপ ভয় বা চিন্তা উদয় না হয়।

৩.১.৭ ক্লায়েন্ট বা ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ

কেয়ারগিভারদের জন্য কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা এবং কৌশল জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকর যোগাযোগের অর্থ একজন কেয়ারগিভার তার রোগী, পরিবারের সদস্য এবং সহকর্মীদের মধ্যে তথ্য কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। মূলত একজন কেয়ারগিভার যে কিনা **হাসপাতাল, ক্লিনিক**, হোম কেয়ার কিংবা অন্য কোনো কমিউনিটি সেটিংস-এ অসুস্থ ব্যক্তিকে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করে থাকেন, তিনিই জানেন ঐ ব্যক্তির সাধারণ সমস্যার সব রকম খবরাখবর।

রোগী বা ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ: সেবার এই মহৎ পেশায় ক্লায়েন্ট, ব্যক্তি, রোগী অথবা সেবাগ্রহিতা সামগ্রিক যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। মূলত এই পেশায় সামগ্রিক যোগাযোগ সংঘটিত হয়ে থাকে ক্লায়েন্টকে ঘিরেই।

ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ কেন দরকার?

ক্লায়েন্ট বা সেবাগ্রহীতা কেয়ারগিভিং পেশার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানকারী হিসেবে একজন কেয়ারগিভারই হচ্ছেন 'First Point of Contact' (ফার্ষ্ট পয়েন্ট অফ কনটাক্ট) বা 'যাবতীয় যোগাযোগের প্রথম ব্যক্তি'। প্রথমত, সুচারুভাবে সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে কেয়ারগিভারকে তার সেবা গ্রহীতার সাথে একটি সুন্দর সহযোগীতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করে যেতে হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যক্তির সামর্থ্য ও সুযোগের উপর বিবেচনা রেখে যোগাযোগের মাধ্যম ও পন্থা নির্বাচন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্লায়েন্টের যেকোনো প্রয়োজনে পরিবারের লোকজন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলের সাথে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে যোগাযোগ অপরিহার্য। একটি কার্যকর যোগাযোগ ক্লায়েন্ট সম্পর্কিত সকল বিষয়ে কেয়ারগিভারকে জানতে সহায়তা করবে। আর তখনই সম্ভব হবে একটি পরিপূর্ণ কেয়ারগিভিং সার্ভিস নিশ্চিত করা।

৩.১.৮ যোগাযোগ উপকরণ ও উপায়

বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক অবস্থাসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ক্লায়েন্ট গ্রুপের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য কিছু অতি পরিচিত উপকরণ ও উপায়ের প্রয়োজন হয়। যেমন:

উপকরণ:	**উপায়:**
• পেপার বা লিখার কাগজ • কলম বা মার্কার • পোষ্টার • ছবি সম্বলিত বই • ভিডিও ও অডিও ডিভাইস • মোবাইল বা টেলিফোন সেট • অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া	• ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন বা মুখভঙ্গি • অঙ্গভঙ্গি • অঙ্গুলি-নির্দেশনা • লেখা • চিত্র অংকন • স্পর্শ • আই কন্টাক্ট বা দৃষ্টি বিনিময়

৩.১.৯ বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট গ্রুপ

কেয়ারগিভারের সেবাগ্রহিতার তালিকা বস্তুত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সামগ্রিকভাবে কয়েকটি ক্লায়েন্ট গ্রুপে বিভক্ত করতে পারি। যেমন:

- Infant (সাধারণত এক বছরের কম বয়স্ক শিশু)
- Toddler (সাধারণত এক থেকে তিন বছরের বয়স্ক শিশু)
- Children (শিশু-কিশোর শ্রেণি, যাঁদের বয়স সাধারণত ১৮ বছরের নিচে)
- Elderly (সাধারণত ৬৫ বছর বা তার অধিক বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ)
- Disabled (শারীরিক বা মানসিক কারণে সাধারণ কর্ম সম্পাদনে অক্ষম)
- Sensory impaired (সংবেদনশীল বৈকল্য)
- Mentally challenged (মানসিক প্রতিবন্ধকতা)
- Person with dementia (ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি)

একজন কেয়ারগিভার যখন তার ক্লায়েন্টদেরকে সেবা দিতে যান, তখন তিনি তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে থাকেন। যোগাযোগ দক্ষতার পরিপূর্ণ আত্তীকরণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে এই সংযোগগুলোকে আরও শক্তিশালী করা যায় যাতে করে রোগী ও তার পরিবারকে কার্যকরভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং নির্দেশনা প্রদান করা যায়। কার্যকর যোগাযোগের জন্য তোমাকে তোমার ক্লায়েন্টের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে হবে, যাতে আপনি প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কৌশলটি তৈরি ও প্রয়োগ করতে পার। তুমি বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করার সময় অনুসরণ করার জন্য এখানে Client Communication বা রোগীর সাথে যোগাযোগের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৩.১.১০ বয়স্ক ব্যক্তির সাথে কার্যকর যোগাযোগের কিছু পরামর্শ

একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব মার্জিত ও ভদ্রভাবে আচরণ করতে হয়। একই সাথে খুবই ধৈর্য্য ও সহনশীলও হতে হবে। নিচে এ সম্পর্কিত কিছু পরামর্শ দেওয়া হল:

১। সময় নিন: হাতে সময় নিয়ে কথা বলতে হবে। সাধারণ বিবেচনার চেয়ে এক্ষেত্রে প্রায়ঃশই সময় বেশি লেগে থাকে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি সাধারণত খুবই মনোযোগ ও সম্মান প্রত্যাশা করেন। অনেক সময় কথা শুনা ও বলার ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ হারিয়ে যেতে পারে অথবা তারা অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারেন। তাই, খুবই আস্তে স্পষ্ট ও মার্জিতভাবে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনে কথা পুনরাবৃত্তি করতে হবে এবং তারা কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

২। বিশেষ চাহিদা পূরণ করতে হবেঃ যদি সেবাগ্রহীতা কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগে থাকেন যেমন: দৃষ্টি বা শ্রবনের সমস্যা তাহলে তার কাছাকাছি ও মুখোমুখি বসতে হবে। এটি ক্লায়েন্টকে তুমি যা বলছো তার দিকে ফোকাস করতে এবং ব্যাঘাত কমাতে সহায়তা করে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর বড় করে কথা বলতে হতে পারে যাতে করে ক্লায়েন্ট তোমার কথা শুনতে পান; তথাপি মনে রাখতে হবে যে একটু জোরে কথা বলা ও চিৎকার করে কথা বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

৩। কথাগুলো সহজবোধ্য রাখতে হবেঃ সহজ শব্দ ও ছোট বাক্য ব্যবহার কর। তুমি যদি খুব বেশি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহার কর, তাহলে ক্লায়েন্ট কথাগুলো নাও বুঝতে পারেন। ক্লায়েন্টের বুঝার সুবিধার জন্য প্রয়োজনে সহজ বাংলায় কথা বলতে হবে।

৩.১.১১ বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আসা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ:

সেবা প্রদান করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার থেকে আসা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও চিন্তা-ভাবনার অধিকারী ক্লায়েন্টের যোগাযোগের পছন্দ ও ধরন ভিন্ন ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এসকল ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

১। ভাষার জটিলতা মেনে নিতে হবেঃ ভাষা খুব একটা সহজ বিষয় নয়; হোক সেটা ইংরেজী, বাংলা কিংবা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষা। তাই জটিল ও কঠিন ভাষার প্রয়োগ কিংবা চিকিৎসা পরিভাষা ব্যক্তির নিকট দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। কাজেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই সহজ-সরল ভাষায় যোগাযোগের চর্চা করতে হবে।

২। নিরবতা কাজে লাগাওঃ অনেক ব্যক্তির কাছেই কথা বলার মাঝখানে নিরবতা একটু অস্বস্তিকর লাগতে পারে। আপনার কথা শুনার সময় কিংবা নিজে কথা বলার মাঝেও ব্যক্তি খানিকটা বিরতি নিতে পারে।

সেই সময় ধৈর্য্য ধরতে হবে। কথা বলার মাঝখানে বিরতির সময় রোগীর মুখ ও শরীরের অঙ্গভঙ্গি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফুটে উঠতে পারে। ব্যক্তি কথা বুঝতে পেরেছে কিনা তা জানার জন্য তিনি কি বুঝেছেন সেটি জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

৩। শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ও এক্সপ্রেশন বা অভিব্যক্তি পরিহার করতে হবে। যেমন, 'এখন সময় 10 a.m.'- এই কথাটিও ব্যক্তি সহজে না বুঝতে পারেন। তাই বলা যেতে পারে 'এখন সকাল ১০টা বাজে'। অপরিচিত উপমা বা বাঘধারা মূলক শব্দ বা বাক্যও পরিহার করা শ্রেয়।

৩.১.১২ মরণাপন্ন বা মুমূর্ষু রোগী বা ব্যক্তির সাথে কথা বলাঃ

একজন মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির ক্ষেত্রে চাপ বা স্ট্রেস ও আবেগ খুব বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হওয়াটা স্বাভাবিক, যেটা কার্যকর যোগাযোগকে প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপ অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

১। খারাপ সংবাদ এড়ানোর চেষ্টা করবে না। তোমাকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠভাবে আবেগতাড়িত না হয়ে ব্যক্তি ও তার পরিবারকে খারাপ সংবাদ বলতে হবে। পুনশ্চ তাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেটির উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে রাখতে হবে। যেমন; ক্যান্সারে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করতেই পারেন যে আমি কি সত্যিই মারা যাব? এক্ষেত্রে এধরনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা থাকলে তা কখনোই এড়িয়ে যাওয়া যাবেন না। বরং, সঠিক তথ্য দিয়ে ব্যক্তিকে তার অন্যান্য প্রস্তুতি নিতে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

২। তথ্য প্রদানে পরিষ্কার থাকতে হবে। সেবাগ্রহীতার অসুস্থতা ও গৃহীত চিকিৎসার সুদুরপ্রসারী ফলাফল আগেভাগেই বলে রাখা ভালো।

৩। সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, জীবনের শেষ পর্যায়ের সেবা ও অন্যান্য প্রস্তুতি বিভিন্ন সংস্কৃতি, পরিবার কিংবা ধর্ম ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে থাকতে পারে। এক্ষত্রে পরিবার বা ব্যক্তির বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডকে বিচার-বিশ্লেষণ না করে সহমর্মীতা প্রদর্শন করতে হবে।

৪। সর্বোপরী এ ধরনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ধৈর্য্য ধরতে হবে। একজন ব্যক্তি যখন তার দুরারোগ্য ব্যাধীর কথা জানতে পারেন তখন তার আবেগ, চিন্তা অনেক বেশী সংবেদনশীল হতে পারে। তখন ব্যক্তি দুঃখ, হতাশা, অধিক উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ দেখাতে পারে। এক্ষেত্রে হাল ছেড়ে না দিয়ে ধৈর্য্য সহকারে কাজ করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান যে, ক্লায়েন্ট গ্রুপের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে আরো কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অনেক কাজে আসতে পারে। যেমন:

১। Open-ended (ওপেন এন্ডেড) বা উন্মুক্ত ধরনের প্রশ্ন করতে হবে। এমন ধরনের প্রশ্ন করা থেকে সাধারণত বিরত থাকতে হবে যেটার উত্তর ব্যক্তি কিংবা শুধু মাথা নাড়িয়ে দিতে পারেন। 'না' বা 'হ্যা' আপনি এখন, যেভাবে বুঝার সুযোগ থাকে। যেমনপূর্ণা অনুভূতি ,ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন করলে ব্যক্তির আবেগ আপনি সরাসরি কিভাবে চিন্তা করছেন বিষয়টিকে ওজন কমানোর ব্যাপারে কি কি পরিকল্পনার কথা ভাবছেন। এগুলো কয়েকটি ওপেন এন্ডেড প্রশ্নের উদাহরণ হতে পারে।

২। ব্যক্তির কথা paraphrase (প্যারাফ্রেজ) বা শব্দান্তরিত করে বলার চেষ্টা করা যাতে করে আপনি তার কথা ঠিকমত বুঝতে পেরেছেন কিনা সেটি নিশ্চিত হতে পারেন। একইভাবে, আপনার কোনো গুরুর্বপূর্ণ নির্দেশনা ব্যক্তি ঠিকমত বুঝেছেন কিনা সেটি যাচাই করার জন্য তিনি কি বুঝেছেন তা নিজের ভাষায় বলতে বলুন।

৩। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা লিখে রাখা যেতে পারে। যেমন, খাবারের সময়, কিংবা গোসল করার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ নির্দেশনা সহজ ভাষায় বুলেট পয়েন্ট বা চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে ব্যক্তির দৃষ্টির সামনে রাখা যেতে পারে।
৪। ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। তার যেকোনো জিজ্ঞাসা তার মত করে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতে পারলে ব্যক্তি কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন।

৩.১.১৩ সেনসরি ইমপেয়ারমেন্ট বা ইন্দ্রিয় বৈকল্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ:

কার্যকর যোগাযোগের জন্য আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর খুব নির্ভর করে থাকি। আমাদের সেবাগ্রহীতা অনেক ব্যক্তির মাঝে এই ধরনের ইন্দ্রিয় অনুভুতির সমস্যা থাকতে পারে যেমন, আংশিক ও সম্পূর্নরুপে দেখতে ও শুনতে না পারা। এই ধরনের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেবাদান করার সময় সাধারণ উপায়ে যোগাযোগের কৌশল অবলম্বন করলে তা সাধারণত ফলপ্রসু হয়না। বিশেষ কিছু পন্থা অবলম্বন করলে এক্ষেত্রে সফল্ভাবে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।

দৃষ্টি সংক্রান্ত বৈকল্যঃ

নানান কারণে এই ধরনের সমস্যার সৃস্টি হতে পারে যেমন, চোখের ছানি পড়া (ক্যাটারেক্ট) যেটা বয়োঃবৃদ্ধি, পক্ষাঘাত বা অন্য কোনো অসুস্থথার জন্য ঘটতে পারে। দৃষ্টি প্রতিবন্দি ব্যক্তির যত্ন নেওয়ার সময় ব্যক্তিকে পারিপার্শ্বিকতা এবং ঘটনাক্রম বুঝতে সহায়তা করার জন্য যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োগ করতে হবে।

- ঘরে প্রবেশের পুর্বে ব্যক্তির দরজায় কড়া নাড়ুন বা তৎক্ষণাৎ তাকে আপনার উপস্থিতি ও অবস্থান সম্পর্কে বলুন যেন তিনি হঠাত করে চমকে না উঠেন। এতে মারাত্মক সমস্যা তৈরি হতে পারে। তিনি যেখানে আপনাকে দেখতে পাবেন অথবা আপনার অবস্থান উপলব্ধি করতে পারবেন সেখানে দাঁড়ান এবং নাম দিয়ে অথবা অন্য কোনো সঠিক উপায়ে তাকে সম্ভাষণ করেন যেমন, "শুভ সকাল, মা!"আমি অমুক, আপনার সেবা প্রদানকারী"।
- কোনো সেবা কর্মকান্ড সম্পাদনের সময় প্রতিটি ধাপ বর্ণনা করা বাঞ্চনীয়। কোনো যন্ত্রপাতি বা বস্তু ব্যাবহারের সময় সেটি যদি তার জন্য ক্ষতিকারক না হয়, তাকে তা স্পর্শ করতে দিন।
- তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন, ব্যক্তিকে আপনার হাতের উপরের অংশ বা কাঁধ শক্ত করে ধরতে বলতে পারেন। তবে অবশ্যই বর্ণনা করতে হবে কোথায় তাকে নেয়া হচ্ছে, কেনইবা নেয়া হচ্ছে এবং পথিমধ্যে যদি বিশেষ কিছু থাকে সেই সম্পর্কে। যেমন, মা আমরা এখন তিনটি সিড়ির ধাপ পার হয়ে উপরের দিকে যাবো।

শ্রবন সংক্রান্ত বৈকল্যঃ শ্রবণ-প্রতিবন্ধী কিছু লোক হতে পারেন একেবারে বধির, আবার অন্যদের ক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট শব্দ শুনতে সমস্যা হতে পারে। এটা জানা অত্যন্ত জরুরি যে, এই ধরনের ব্যক্তি কি শুনতে পারেন এবং কি পারেন না। হেয়ারিং এইড এক্ষেত্রে শ্রবনের কিছুটা উন্নতি ঘটাতে পারে, কিন্তু এককভাবে তা

সবক্ষেত্রে বা সবসময় কার্যকরী হয়ে উঠেনা। যদি কেউ হেয়ারিং এইড ব্যবহার করে থাকেন, তাকে নির্দেশনা প্রদান কর যাতে করে তিনি জেগে থাকা অবস্থায় সার্বক্ষণিকভাবে তা ব্যবহার করেন এবং পরীক্ষা করে দেখেন যে সেটি ঠিকমত কাজ করছে কিনা। তাকে শ্রবন সহায়ক যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার ও যত্ন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এছাড়াও, এই ধরনের পরিস্থিতিতে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য আরো কিছু উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে যেমন,

- সর্বদা সামনে থেকে ব্যক্তির কাছে যান এবং কথা বলার আগে ব্যক্তির দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য হাত বা বাহুতে আলতোভাবে স্পর্শ কর।
- যদি কেউ এক কানের চেয়ে অন্য কানে আরও স্পষ্ট শুনতে পান তবে কোনো কানটি ভালো তা খুঁজে বের কর এবং কথা বলার সময় নিজেকে সেই কানের কাছে অবস্থান করাতে হবে।
- শ্রবণ-প্রতিবন্ধী লোকেরা প্রায়শই ঠোঁট পড়তে পারেন এবং কোনো কিছু বুঝতে বক্তার মুখের নড়াচড়া উপর নির্ভর করে থাকেন। ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময় নিজেকে এমন অবস্থান কর যাতে সে আপনার মুখ এবং মুখের ভাবগুলো দেখতে পায়। আপনার শব্দটি ধীরে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন এবং সংক্ষিপ্ত বাক্যে কথা বলুন।
- যদি ব্যক্তিটি আপনি কী বলছেন কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, তাহলে শব্দগুলো পরিবর্তন করে দেখা যেতে পারে, ভয়েসের ভলিউম নয়। চিৎকার কখনও কখনও ব্যক্তির জন্য আরও ঝামেলা সৃষ্টি করে এবং সে তখনও নাও বুঝতে পারে আপনি কী বলছেন।
- আশেপাশের কোলাহল যতটা সম্ভব কমাতে হবে, কারণ টেলিভিশন বা রেডিওর শব্দ মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।
- আপনি কী বলছেন তা বোঝাতে সহায়তা করার জন্য অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা, যদি ব্যক্তিটি পড়তে পারে তবে কাগজে বার্তা লিখুন।

এই উপায়ে কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা নির্দেশনা থাকলে কেয়ারগিভারকে অবশ্যই সেবাগ্রহিতাকে পাল্টা প্রশ্ন করানোর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে যে সেটি তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা। অনেক সময় শুনতে অসুবিধা হয় এমন ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

চিত্র ৩.৪: বিভিন্ন ধরনের হিয়ারিং এইড

৩.১.১৪ কঠিন এবং স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার উপায়:

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন, যা প্রায়শই জটিল আবেগের সাথে জড়িত। ক্লায়েন্ট বা তাদের পরিবারের সদস্যর এই আবেগ এবং চিন্তা প্রকাশ

করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি সবেমাত্র নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন তিনি বলতে পারেন, "আমার পরিবার আমার আর কোনো খোজ খবর রাখেনা" " বা হোম কেয়ারের ক্ষেত্রে পরিবারের কোনোও সদস্য, যার মা টার্মিনাল অসুস্থতার শেষ পর্যায়ে আছেন, তিনি বলতে পারেন, "আমি আশা করি আমার মা কেবল মারা যাক" অথবা, "আর ভালো লাগছেনা এই বৃদ্ধ পিতার পিছনে টাকা ও সময় নষ্ট করতে, মনে হয় আত্মহত্যা করি"। এ ধরনের মন্তব্য তোমাকে অস্বস্তি, ভয়, নার্ভাসনেস বা অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে দিতে পারে এবং তখন ঠিক কিভাবে রেসপন্স করতে হবে সে ব্যাপারে দ্বিধায় পড়তে হয়।

প্রথম প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন যে তুমি এই ধরনের কথোপকথন দ্রুত এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ওই স্থান ত্যাগ করছো অথবা খুব দ্রুত কথার প্রসঙ্গ বদলাচ্ছো। অথবা এমন কিছু বলতে পারো যাতে করে মনে হতে পারে যে এই ধরনের ধারণা বা বক্তব্য থেকে উনারা চট করে সরে আসবেন। যেমন অনেকে বলে থাকে যে, "বোকার মত কথা বলবেননা" কিংবা, "এটা কোনো কথা হলো" অথবা "আপনি আসলে যা বলছেন সত্যি কি তাই বুঝাতে চাচ্ছেন?" প্রভৃত। কিন্তু বস্তুত, এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির সাথে কার্যত কেয়ায়রগিভারের যোগাযোগ এবং বিশ্বাসের জায়গাটাকে বিনষ্ট করে দেয়। কেয়ারগিভারের কাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে অসুস্থ ব্যক্তি, সেবা গ্রহীতা ও তার পরিবারের লোকদের সাথে যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। তাই, উক্ত উপায়ে রেসপন্ড করলে সেবার মূল কর্মকান্ড একেবারে ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের জটিল বিষয়ে যোগাযোগ বা কথা বলার দরকার হলে নিম্নলিখিত বিবেচনাগুলো সহায়তা প্রদান করতে পারে:

- সর্বোতভাবে ব্যক্তিটিকে বুঝতে দাও যে তুমি তার আবেগ-অনুভুতিকে যত্নসহকারে গুরুত্ব দিচ্ছো। এক্ষেত্রে, সহানুভুতিশীল আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি কোনো কাজে ব্যাস্ত থাকলে চেষ্টা করা কাজটিকে আপাতত বন্ধ রেখে সম্পূর্নভাবে মনোনিবেশ করা এবং সঠিকভাবে দৃষ্টি সংযোগ বা আই কন্টাক্ট বজায় রাখা। যদি উপযুক্ত মনে হয় তবে আলতো করে তার হাতটি চেপে ধর বা কাঁধে স্পর্শ কর। কখনও কখনও ব্যক্তির মূলত প্রয়োজন কেউ তার কষ্টের কথাটি শুধু শুনুক। যদি ব্যক্তি তোমার আগ্রহ এবং সহানুভুতি অনুভব করে তবে তোমার নীরব সমর্থন কখনও কখনও শব্দের চেয়ে আরও অধিক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে।
- প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত কর (উদাহরণস্বরূপ, "আপনি কি বলছেন যে আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছাকাছি থাকাটা অনুভব করছেন?") বা ব্যক্তির বার্তাটি নিজের কথায় পুনরাবৃত্তি করে নিশ্চিত কর "মনে হচ্ছে আপনি বলছেন যে আপনি নিজের পরিবারের কাছ থেকে দেখাশুনা করাটাকে খুব অনুভব করছেন"।
- যদি সেই ব্যক্তির কোনো বিষয়ে সহায়তার প্রয়োজন হয় যা তুমি ঐ মূহর্তে করতে অক্ষম, তাহলে হ্যাল্থকেয়ার টীমের অন্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। অভিজ্ঞ কেয়ারগিভার কলিগ কিংবা কেয়ার সুপারভাইজর এক্ষেত্রে ভালো সহায়তা করতে পারে। তবে ঐ মূহর্তে অবশ্যই ব্যক্তিকে আশ্বস্ত কর যে তুমি এই বিষয়ে সিনিয়র কারো কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পরে জানাবে। পরবর্তীতে অবশ্যই ফলো-আপ রাখতে হবে।

পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ: কেয়ারগিভার হিসাবে কাজ করতে গেলে তোমাকে অবশ্যই সেবাগ্রহীতার পরিবারের সদস্যদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে হবে। যেহেতু কেয়ারগিভার সেবাগ্রহিতা ব্যক্তির সাথে প্রচুর সময় অবস্থান করে থাকে এবং রুটিন/প্রাত্যহিক কাজে সর্বাধিক সহায়তা প্রদান করে থাকবে, সেহেতু প্রায়শই তুমিই হবেন হ্যাল্থ কেয়ার টীমের প্রথম সদস্য যার কাছ থেকে পরিবারের সদস্যরা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য ও সক্ষমতা তথা সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইবেন। পরিবারের কোনোও সদস্য যদি এমন কোনো কিছু জানতে চায় যে বিষয়ে তোমার উপস্থিত জ্ঞান বা

বিষয়বস্তু অজানা থাকে তাহলে তাদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নাও এবং আপনার টীমের অন্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা; বিশেষ করে অভিজ্ঞ নার্স বা ডাক্তার অথবা আপনার কেয়ার সুপারভাইজারের সাথে কথা বলা। পরবর্তীতে অবশ্যই উক্ত বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে ফলো-আপ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, তুমি কিভাবে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলছো বা যোগাযোগ রক্ষা করছো সেটি তোমার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের ভালোবাসার মানুষটি কি ধরনের সেবা পাচ্ছে তার সম্পূর্ন চিত্রটি ফুটিয়ে তুলছে। যত্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমার ভূমিকা এবং কার্যধারা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে তুমি পরিবারের সদস্যদের আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে সহায়তা করতে পারো।

পরিবারের সদস্যদের সাথে পরিচিত হয়ে, তাদের ফ্যামিলি হিষ্টরি জেনে, তাদের সাথে কথা বলে এবং তাদের কথা শুনে সমগ্র পরিবারের সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারাটা একজন কেয়ারগিভারের একটি চমৎকার কর্মদক্ষতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। পরিবারের সদস্যরা প্রায়শই মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, কী কী কৌশল অবলম্বন করলে তাদের প্রিয়জনের যত্ন নেয়াটা কার্যকরী হবে ইত্যাদি। পরিবারের সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত তথ্যগুলো তোমার কাজকে আরও সহজ করে তুলতে পারে এবং তোমার করা যত্নের মান শুরু থেকেই অনেকগুন বাড়িয়ে তুলতে পারে। কখনও কখনও, পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিবারের সদস্যদের যত্ন সম্পর্কে পূর্বের বা বর্তমানের কোনোও অভিযোগ বা উদ্বেগের কথা বলতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতে পেশাদারিত্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মপক্ষ সমর্থন বা রাগান্বিত স্বরে তর্ক করা পরিহার করতে হবে। বরং, কার্যকরীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে পরিবারের উদ্বেগের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে এবং তাদেরকে আস্বস্ত করতে হবে যে আপনি তাদের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং আপনি উক্ত বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৩.১.১৫ হ্যাল্‌থ কেয়ার টীমের সাথে যোগাযোগ

সমন্বিত, উচ্চ-মানের যত্ন বা সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা দলের সদস্যদের অবশ্যই একে অপরের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে হবে। কেয়ারগিভার হিসেবে তুমি তোমার প্রাত্যহিক সেবা দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার মতো অবস্থানে রয়েছো। এই সকল তথ্য ঠিক কিভাবে রেকর্ড ও প্রতিবেদন করবে সে বিষয়ে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে যাতে করে হ্যাল্‌থকেয়ার টীমের অন্যান্য সদস্যরা প্রয়োজন মত সেই তথ্য গুলো সংগ্রহ করতে পারে। পাশাপাশি, কোনো কঠিন বা জটিল পরিস্থিতিতে রোগীর অবস্থা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হতে পারে। হ্যাল্‌থ কেয়ার টীমের সাথে যোগাযোগ বলতে মূলত এই বিষয়গুলোকেই বুঝানো হয়। প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা ইতোমধ্যেই হেল্‌থ কেয়ার টীম বা স্বাস্থ্য সেবা দল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করেছি। এক্ষেত্রে যোগাযোগটা মূলত পেশাগত যোগাযোগ। তাই এপ্রোচটাই হতে হয় পেশাগত ও আনুষ্ঠানিক। সাধারণত নির্দিষ্ট কতগুলো উপায়ে এই যোগাযোগটি সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন; ডেইলি রেকর্ড ও রিপোর্ট, গুরুত্বপূর্ণ ফর্মস, কেয়ারপ্ল্যান, ফ্লো শীট, কেয়ার নোট্‌স, পেশেন্ট ফাইল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর তাই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একজনে কেয়ারগিভারের অবশ্যই ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। নিচে হ্যাল্‌থ কেয়ার টিমের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে কেয়ারগিভারের জন্য প্রযোজ্য অত্যাবশ্যকীয় যোগাযোগের মৌলিক কিছু নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হল।

১। চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিচিত শব্দ ও সংক্ষিপ্ত রুপঃ স্বাস্থ্য খাতের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কাজ করতে গেলে কেয়ারগিভারকে অবশ্যই কিছু সুপরিচিত মেডিক্যাল শব্দ ও পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নতুন মেডিক্যাল পরিভাষা মনে রাখা কঠিন লাগাটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, মেডিক্যাল পরিভাষার কিছু কিছু শব্দ অনেক দীর্ঘ, কিছু কিছু আছে উচ্চারন ও বানান করাই অনেক কষ্টসাধ্য আবার অনেক

গুলো আছে যেগুলো সচরাচর কথাবার্তায় একদমই ব্যবহৃত হয়না। মেডিক্যাল পরিভাষা সম্পর্কে ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২। রিপোর্টিং: রিপোর্টিং হচ্ছে হ্যাল্‌থ কেয়ার টিমের সদস্যদের মধ্যে লিখিত বা মৌখিকভাবে তথ্যের আদান-প্রদান। সাধারণত কেয়ারগিভার শিফটের শুরুতে ও শেষে তার কেয়ার সুপারভাইজর বা ইনচার্জের কাছে রিপোর্ট করে থাকে। যেহেতু কেয়ারগিভার সবচেয়ে বেশি সময় অসুস্থ ব্যক্তির সাথে অতিবাহত করেন, তাই কেয়ারগিভারই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন। রোগীর পরিবর্তন গুলো জানার পরে সেই সম্পর্কিত তথ্যাদি স্বাস্থ্য সেবা কাজে নিয়োজিত দলের অন্যান্য সদস্যদের কাছে যোগাযোগ করার জন্য মূলত দুইটি উপায়ে।

৩। অবজেকটিভ অবজার্ভেশন বা উদ্দেশ্যমূলক পর্যবেক্ষনঃ একজন ব্যক্তি যদি তার যেকোনো একটি সেন্সরি অরগান ব্যবহার করে কোনো তথ্য নিজে সরাসরি উতঘাটন করে তখন তাকে উদ্দেশ্যমূলক পর্যবেক্ষণ বলে। যেমন: রোগীর শরীরের তাপমাত্রা কম, বেশী নাকি স্বাভাবিক; অথবা চামড়া অতিরিক্ত শুকনো কিনা অথবা শরীরের রক্তচাপের পরিমাপ কত। এইসকল পর্যবেক্ষণ যদি কেয়ারগিভার নিজে নির্নয় করে থাকে, তখন তাকে উদ্দেশ্যমূলক বা অবজেক্টিভ অবসার্ভেশন সংঘটিত হয়।

৪। বিষয়গত পর্যবেক্ষণ বা সাবজেক্টিভ অবজার্ভেশনঃ যে সমস্ত তথ্য ও উপাত্ত নিজের সেন্সরি অরগানের সাহায্যে সরাসরি পরিমাপ করা যায়না বা কোনো যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাপা যায়না সেগুলো হল সাবজেক্টিভ অবসার্ভেশন। যেমন, একজন ব্যক্তি তার মাথা ব্যথা বা যন্ত্রনার কথা আপনাকে বলতে পারেন অথবা বলতে পারেন তার সারারাত অনিদ্রা থাকার বিষয়ে। যেহেতু এই তথ্যাদি মেপে দেখার কোনো সুযোগ নাই, রোগী বা ক্লায়েন্টের কথার উপরই নির্ভর করতে হয়, তাই এগুলো হলো সাবজেক্টিভ তথ্যাদি।

এ সমস্ত ক্ষেত্রে গৃহীত তথ্য ও উপাত্তের মধ্যে কোনো কোনো বষয়গুলো রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেটি নির্দেশনা অনুযায়ী করতে হবে। তবে সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

- মুড বা মন-মেজাজ
- মানসিক সচেতনতা
- লেভেল অফ ইনডেপেনডেন্স বা স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা
- আচার-আচরণ
- ভাইটাল সাইন্স
- প্রস্রাব বা পায়খানা সম্পর্কিত তথ্য।
- স্কিন বা চামড়ার অবস্থা ও রং
- ক্ষুধা ও খাদ্যাভ্যাস
- ঘুমের অভ্যাস
- কমফোর্ট লেভেল অর্থাৎ, রোগী কতটা আরামদায়ক অনুভব করছেন।

দৃশ্যকল্পঃ

মিসেস রহিমা ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত। আজ সকালে কেয়ারগিভার যখন তার সকালের কাজে কর্মে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন, তখন তিনি একটি ব্রাশ তুলে তার দিকে ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে বললেন, "বেরিয়ে যাও!" সাধারণত ঐ কেয়ারগিভারকে মিসেস রহিমা তার সেবাদানের ক্ষেত্রে সহযোগীতা করে থাকে।

এখন এক্ষেত্রে রোগীর আচরণের এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কেয়ার সুপারভাইজার বা সংশ্লিষ্ট অন্য কারো কাছে জানানোর জন্য কেয়ারগিভারকে কার্যকর যোগাযোগের দক্ষতা প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, ইতিবাচক ভাবে লিখিত বা মৌখিক রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, “আজ সকালে আমি যখন মিসেস রহিমাকে পোশাক পরিধানে সাহায্য করার চেষ্টা করছিলাম তখন তিনি তার চুল আচড়ানোর ব্রাশটি তুলে আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং আমাকে বাইরে যেতে বললেন। তবে তিনি সাধারণত এই ধরনের আচরণ করেননা।“ আবার, কম কার্যকরীভাবে বলা যায় “মিসেস রহিমা আমাকে আজ সকালে চুল আচড়ানোর ব্রাশ দিয়ে আঘাত করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন।”

৫। রেকর্ডিং বা ডকুমেনটেশন বা নথীকরনঃ এটি হ্যাল্থকেয়ার টীমের সাথে যোগাযোগ করার একটি প্রধানতম উপায়। রুটিন বা প্রাত্যহিক সেবা দানের কার্যাবলি থেকে শুরু করে বিশেষ কোনো ঘটনা বা অবস্থা সবই আসতে পারে এর ভিতর। এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি ফর্ম বা তথ্য লিপিবদ্ধকরণের নির্দিষ্ট নথি হতে পারে নিম্নরুপঃ

- কেয়ারপ্ল্যান
- ইনটেক-আউটপুট চার্ট
- ভাইটাল সাইন লিপিবদ্ধকরণের ফর্ম
- হ্যান্ডওভার বা দ্বায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য ব্যবহৃত নমুনা ফর্ম
- ডায়েট চার্ট প্রভৃতি।

৬। মোবাইল ফোনে কথা বলাঃ

আধুনিক যুগে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ খুবই নৈমত্তিক একটি বিষয়। নানবিধ উপযোগীতার কারণে এটি এখন সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু, মোবাইল ফোনে কথা বলার কিছু নিয়ম-কানুন ও শিষ্ঠাচার রয়েছে। এগুলো রোগী বা ক্লায়েন্ট, তার পরিবার, সহকর্মী তথা যে কারো সাথে মোবাইলে কথা বলার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

- **পেশাদার হতে হবে।** আউটগোইয়িং কল করা, ইনকামিং কলগুলোর উত্তর দিতে, কাউকে অপেক্ষায় রাখতে, কল স্থানান্তর করতে এবং অন্য কোনোও বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে কীভাবে টেলিফোন সিস্টেমটি ব্যবহার করবে তা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে।
- **নিজের পরিচয় সঠিকভাবে আগে দেওয়ার চেষ্টা কর।** তুমি যখন টেলিফোনের উত্তর দাও তখন কলকারীকে অভিবাদন জানিয়ে তোমার নাম, পদবী এবং যেখানে কাজ করছো সেটা বলে কীভাবে সহায়তা করতে পারো তা জিজ্ঞাসা কর (উদাহরণস্বরূপ, "হ্যালো, রুবিনা বলছি, কেয়ারগিভার, এবিসি হোম কেয়ার। কীভাবে সহায়তা করতে পারি? যখন তুমি নিজে কল করছো, তখন ওপাশ থেকে ফোন রিসিভ করা মাত্রই অভিবাদন জানিয়ে নিজের পরিচয় দিন।

- **নম্র ব্যবহার কর।** ফোনটি বেজে উঠার সাথে সাথেই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর। আস্তে আস্তে এবং স্পষ্টভাবে কথা বল, মনোরম সুরে। যদি কোনোও কলারকে হোল্ডে রাখতে হয় তবে এটি অল্প সময়ের জন্য কর। যদি অপেক্ষাটি এক মিনিটেরও বেশি দীর্ঘ হবে বলে মনে হয় তবে আগেই অনুমতি নিয়ে নাও।
- **সঠিক বার্তা নাও।** যদি কোনোও বার্তা নিতে বলা হয় তবে তা সাবধানে লিখ এবং পুনরাবৃত্তি কর যাতে তথ্যটি সঠিক কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়। বার্তাটি সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত কর। কোনোও ভুল হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে, বার্তা দেওয়ার আগে তুমি কী লিখেছো তা পরীক্ষা করে দেখ।
- **গোপনীয়তা বজায় রাখ।** কলকারীরা কারও স্বাস্থ্যের বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারে। সচেতন থাক এমনকি কোনোও ব্যক্তি বাসায় নাকি বৃদ্ধাশ্রমে কোথায় সেবা নিচ্ছে নিজে থেকে সেটি বলাও গোপনীয়তা ভঙ্গের কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে। নিয়োগকর্তার অনুমতি ব্যাতিত কোনো তথ্য আদান-প্রদান করা যাবে না। কলকারীকে কী তথ্য সরবরাহ করতে হবে সে সম্পর্কে যদি অনিশ্চিত থাক তবে সুপারভাইজারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

৩.১.১৬ ক্লায়েন্টের অনুরোধে কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়া

ক্লায়েন্টের অনুরোধে কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়া বলতে যোগাযোগ ও কর্মদক্ষতার এমন একটি তৎপরতাকে বুঝানো হয় যেখানে রোগীর বিভিন্ন রকম তাতক্ষিক ও মানবিক চাহিদায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সেবা দিতে গিয়ে কেয়ারগিভারকে প্রায়শই অনেক ধরনের অনুরোধের কথা শুনতে হয়। এসব অনুরোধের সবগুলো আবার তৎক্ষণাৎ পালনযোগ্য নয়। কিছু আছে অপ্রতিকর বা অস্বস্তিকর।

এক্ষেত্রে কেয়ারগিভারকে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নিচের সাধারণ বক্তব্যটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

১। অনুরোধটি কি? বিভিন্ন ধরনের অনুরোধ সম্পর্কে ধারণা রাখা উচিৎ। যেমন: কেউ অনুরোধ করতে পারে তার বাজার করে দেওয়ার জন্য, কিংবা খাবারটা রান্না করে দেওয়ার জন্য। আবার কেউ অনুরোধ করতে পারে তার পরিবারকে না জানিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে যাতে করে বয়স্ক ব্যক্তিটি নিজের পছন্দমত চিকিৎসা নিতে পারে। আবার কিছু কিছু অনুরোধ হতে পারে যেটা খুবই বিব্রতকর। এ ধরনের অসংখ্য অবস্থার মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারে।

২। রাখা যাবে কিনা? অনুরোধটি শুনার পর নিরূপন করতে হবে সেটি রাখা যাবে কিনা? যদি পালন করার মত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সহায়তা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। আর যদি কেয়ারগিভার নিশ্চিত না হয়, তাহলে অত্যন্ত মার্জিতভাবে সময় চেয়ে নিতে হবে যাতে করে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ভালো কোনো দিক নির্দেশনা নিতে পারেন। পরে অবশ্যই ফলো আপ রাখতে হবে রোগীর সাথে। আর যদি কোনো বিব্রতকর অনুরোধ হয়, তাহলে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে ঐ সময়টাতে কার্যকর যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখার চেষ্ঠা করতে হবে। নিজের কোনো ঝুকির সম্ভাবনা থাকলে অবশ্যই তাতক্ষনিকভাবে কেয়ার সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করতে হবে।

৩। উপযুক্ত জায়গার সুপারিশ করা: কোনো অনুরোধ রাখা না গেলে কার কাছে বা কোথায় গেলে সঠিক সেবা পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে সুপারিশ করা যেতে পারে। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে প্রদায়িত তথ্য সঠিক।

৩.২ কাউন্সেলিং এর প্রাথমিক ধারণা

কাউন্সেলিং শব্দটি এসেছে ইংরেজি Counsel থেকে যার আভিধানিক অর্থ হলো পরামর্শ দান করা। মূল শব্দটি ল্যাটিন Consilium থেকে এসেছে যার অর্থ পরামর্শ (Consultation) বা উপদেশ (Advice). কাউন্সেলিং স্বাস্থ্যসেবায় ব্যাবহৃত একটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার সময় সেবাগ্রহণকারী ও সেবাদানকারী ব্যক্তিদ্বয় এমন একটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাক্ষাত করেন, কথা বলেন ও আলোচনা করেন যে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিটি নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের উপর আত্মবিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে সমস্যাটি সমধানের উপায় খুঁজে পান। কাউন্সেলিং পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন ও ভালো আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। মূলত কাউন্সেলিং-এর সামগ্রিক সফলতাই নির্ভর করে এই দুটি বিষয়ের উপর। ব্যক্তি ও পরিবারের সাথে কাজ করার সময় কাউন্সেলিং-এর সুযোগ আমাদের প্রায়শই তৈরি হয়ে থাকে সেটা রোগীর বাসায় বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যেখানেই হউক না কেন। কাউন্সেলিং-কে একজন অসুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা ও যত্ন প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং এটিকে কেয়ারপ্ল্যানের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এটি রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা এর ফলে একজন রুগ্ন বা অসুস্থ বা বয়স্ক ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা অসুস্থতা এড়াতে এবং জীবনমান উন্নীত করতে কী করা প্রয়োজন তা বুঝতে সহায়তা পেয়ে থাকেন।

মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত কাউন্সেলিং-এর সংজ্ঞা: J. F. Perez (১৯৬৫) কাউন্সেলিং সমন্ধে একটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেন। তার মতে, "কাউন্সেলিং একটি মিথষ্ক্রিয়ামূলক প্রক্রিয়া যেখানে থাকেন একজন ক্লায়েন্ট যার সাহায্যের প্রয়োজন ও আরেকজন কাউন্সেলর যিনি সেই সাহায্য প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও শিক্ষিত।" G. E. Smith (১৯৫৫) মনে করেন "কাউন্সেলিং এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কাউন্সেলর ক্লায়েন্টের পছন্দ, পরিকল্পনা ও উপযোজনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রয়োজনমত সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে।"

৩.২.১ কাউন্সেলিং এর লক্ষ্য

কাউন্সেলিং-এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে এবং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে ভালো উপায়টি খুঁজে বের করতে সাহায্য করা। কাউন্সিলিং হচ্ছে এমন একটি ধারণা যেখানে একটি পদ্ধতিগত ও পেশাগত পরিবেশে ব্যক্তিকে তার সমস্যা ও মানসিক অবস্থা নিয়ে একটি নিরাপদ ও গোপনীয় পরিবেশে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন মতবাদ ও ব্যক্তিভেদে কাউন্সিলিং-এর লক্ষ্যে ভিন্নতা থাকলেও কাউন্সিলিং-এর প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হলো (Krumboltz, 1966):

১. **আচরণের পরিবর্তনে সহায়ক কাউন্সিলিং:** ব্যক্তির সমস্যা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই আচরণগত অসামঞ্জস্যতার কারণে ব্যক্তি কর্মজীবনে ও সমাজে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। কাউন্সিলিং-এর লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে তার কাঙ্খিত আচরণ করতে সাহায্য করা।

২. **খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা বৃদ্ধি:** শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মানুষ সমাজে বহুবিদ ঘটনা, সমস্যার সম্মুখীন এবং উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে। এই প্রক্রিয়ায় যখন কোনো ব্যক্তি সমস্যার উত্তরণের পথটি হারিয়ে ফেলে অথবা উত্তরণের পথটি সহজে গ্রহণ করতে পারে না তখনই সে সমস্যাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাকে সমাজ বা পরিবেশের সাথে সর্বোচ্চ খাপ খাওয়ানোর জন্য সহায়তা করা হয়।

৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** ব্যক্তি জীবন প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা স্বাভাবিক জীবনকে রুদ্ধ করে।

কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করা হয় এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সিদ্ধান্ত থেকে সঠিক সিদ্ধান্তটি বেছে নিতে সেবা গ্রহীতাকে সাহায্য করা হয়।

৪. সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করা: মানুষের অনেক সমস্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে ব্যক্তির সম্পর্ক তৈরি এবং বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়া। প্রতিটি মানুষ ভন্নি ভন্নি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণে সম্পর্ক তৈরি এবং বজায় রাখা অনেক সময় একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ সমাজ নিয়ে চলে বলে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি এবং বজায় রাখা স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এক্ষেত্রে কাউন্সিলিং সম্পর্কটি সঠিকভাবে অনুধাবন করে সম্পর্ক তৈরি এবং বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৫. ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা: প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো সক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ব্যক্তি পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে উক্ত ক্ষমতা, দক্ষতা, বা পারদর্শীতার বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকে না অথবা জানা থাকলেও যথাযথ প্রয়োগের সুযোগ ব্যবহার করতে পারে না। কাউন্সিলিং-এর লক্ষ্য হলো ব্যক্তির স্বকীয় ক্ষমতাকে চিহ্নিত ও বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা।

৩.২.২ কাউন্সিলিং-এর মূলনীতিঃ

কাউন্সিলিং একটি পেশাগত প্রক্রিয়া। দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা বিষয়ে যে সাধারণ উপদেশ, নির্দেশ বা পরামর্শ দিয়ে থাকি তা থেকে এটি সম্পূর্ণ ভন্নি । কাউন্সিলিং সেবায় গবেষণা এবং বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতার আলোকে সেবা গ্রহীতাকে একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সহায়তা প্রদান করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সে জন্য কতকগুলো পেশাগত নীতি রয়েছে-

- **গ্রহণযোগ্যতা বা Acceptance:** কাউন্সিলিং-এ প্রতিটি মানুষ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রত্যেক সেবা গ্রহীতাকে একজন একক ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী কাউন্সিলিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাও একটি প্রক্রিয়াগত নীতি। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক শক্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্ম, শ্রেণিভেদে ব্যক্তির প্রতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা যাবে না।
- **সংহতিপূর্ণতা বা Solidarity:** কাউন্সিলিং প্রক্রিয়ায় সংহতিপূর্ণতা বা Solidarity একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই নীতির আওতায় কাউন্সিলর সেবা গ্রহীতার প্রতি কতকগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ে একই রকম ধারণা পোষণ করেন এবং সম্পর্ক বজায় রাখান। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলর ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে স্বচ্ছতা, সততা, দায়িত্ববোধ, শ্রদ্ধা এবং পেশাগত মনোভাব বজায় রাখতে হয়।
- **গোপনীয়তা বা Confidentiality:** সেবা গ্রহীতার তথ্যাদির গোপনীয়তা বজায় রাখা কাউন্সিলিং-এর একটি অন্যতম পেশাগত নীতি। এই নীতির আওতায় সেবা গ্রহীতাকে নিশ্চিত করতে হবে যে তার দেওয়া তথ্য সর্বদা গোপন রাখা হবে। সেবা গ্রহীতার বিশ্বাস অর্জনই সফল কাউন্সিলিং-এর প্রধান শর্ত। কাউন্সিলিং-এ তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সেবা গ্রহীতার সম্মান বজায় রাখা এবং অন্যান্য মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক সম্ভাব্য নেতিবাচক ঝুঁকি থেকে সেবা গ্রহীতাকে মুক্ত রাখা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন সেবা গ্রহীতার আত্মহত্যার প্রবণতা বা যেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতার অনুমোদন সাপেক্ষে 'যতটুকু তথ্য না দিলেই নয়' এই নীতি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে তথ্য সরবরাহ করা।
- **নৈর্ব্যক্তিকতা বা Objectivity:** কাউন্সিলিং সেবায় সেবা গ্রহীতা সম্পর্কে কোনো পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব পোষণ করা যায় না। সেবা গ্রহীতা সম্পর্কে কোনো রকম ঔফমবসবহঃধষ না হওয়া অর্থাৎ সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যেমন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে বিচার না করা। এই নীতির আওতায় সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত তথ্যাদির ভিত্তিতে কাউন্সিলর সেবাদান প্রক্রিয়ায়

কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। অথবা নিজস্ব, ধর্মীয় বা আদর্শগত বা মানসিক অবস্থার তারতম্য দ্বারা সেবা গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক এবং মনোভাবে অসম আচরণ করবেন না।

কাউন্সেলিং এপ্রোচ বা প্রসেস: কাউন্সেলিং এপ্রোচ বা প্রসেস বলতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাউন্সেলিং-এর ধারাবাহিক পদ্ধতিটিকে বুঝানো হয়। কাউন্সেলিং-এর দুটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া খুবই কার্যকরিঃ REDI ও GATHER. মূলত প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় এই এপ্রোচ দুটি ব্যাবহৃত হলেও আমাদের বয়স্ক সেবাদানের ক্ষেত্রেও মূল বৈশিষ্টটি একইরকম। প্রায় সকল ধরনের কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রেই এই দুটি মৌলিক উপায় অবলম্বন করা হয়। নিচে REDI সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হল:

R: Rapport Building (সুসম্পর্ক স্থাপন): এটি হচ্ছে দুজন বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক তৈরির প্রক্রিয়া। যিনি কাউন্সেলিং করবেন তার সাথে কাউন্সেলিং প্রাপ্ত ব্যক্তির একটি বন্ধুসুলভ সুসম্পর্ক তৈরি হওয়া খুবই বাঞ্চনীয় এবং এটি কাউন্সেলিং এর পূর্বশর্ত। সমস্যাগ্রস্ত একজন ব্যক্তি তার সমস্যার কথা তখনই বলতে চাইবেন যখন তিনি আস্থা পাবেন যে তার সমস্যাটি নিয়ে কেউ ঠাট্টা-মশকরা করবেনা কিংবা হেও প্রতিপন্ন করবেনা। বরং তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে, মনের কথাগুলো গোপন রাখবে ও সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করবে। এই সম্পর্কের ভিত্তি হলো শর্তহীন ইতিবাচক সম্মান, নিখুঁত সমানুভূতি ও অকৃত্রিমতা। সম্পর্কটি আগেভাগেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কেননা এই সম্পর্কের মাধ্যমেই জানা যাবে ক্লায়েন্ট কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটিতে আদৌ যোগ দেবে কিনা এতে যুক্ত হলেও চালিয়ে যাবে কিনা। প্রাথমিক পর্যায়ের সাক্ষাৎকারগুলোর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিম্নরুপঃ

ক. ক্লায়েন্টের সঙ্গে সুসময় ও ইন্তিবাচক সম্পর্ক স্থাপন
খ. ক্লায়েন্টকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ও তাতে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব কী তা পরিষ্কার করে বোঝান
গ. কথোপকোথন যাতে নির্বিঘ্নে ঘটে তাতে ক্লায়েন্টকে সহায়তা করা।
ঘ. ক্লায়েন্ট বিশেষ কোনো চাদিহা সম্পন্ন হলে সেটি বিবেচনায় আনা।

E: Exploration (চাহিদা নিরূপন): সম্পর্ক স্থাপনের পর দ্বিতীয় স্তরে ক্লায়েন্টকে তার সমস্যাটি ঠিক কী তা গভীরভাবে চিন্তা করে কাউন্সিলরের নিকট উপস্থাপন অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। এই স্তরে ক্লায়েন্টের দ্বায়িত্ব অনেক বেশি। সমস্যার স্বরূপটি যতটা সহজ ও সুন্দরভাবে সে তুলে ধরতে পারবে কাউন্সেলরের পক্ষেও তাকে সাহায্য করা ততটা সহজ ও সুবিধাজনক হবে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণে নিম্নলিখিত স্তরগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

ক) সমস্যার সংজ্ঞা প্রদানঃ ক্লায়েন্টের সাথে সহমর্মী ও সমমনস্ক হয়ে সমস্যাটি বস্তুনিষ্ঠভাবে এবংবিশেষায়িত করে বর্ণনা ও চিহ্নিত করা হয়। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্লায়েন্ট ও কাউন্সিলর যেন সমস্যাটি বস্তুনিষ্ঠভাবে একই দৃষ্ঠিকোণ থেকে নিরীক্ষন করে।

খ) সমস্যাটির বিভিন্ন দিক খুটিয়ে দেখাঃ সমস্যাটি ভালোভাবে বুঝার জন্য যে সব তথ্য সংগ্রহ করা দরকার সেগুলো এই স্তরে সংগ্রহের উপায় ভাবা হয়। কে, কীভাবে ও কত সময়ের মধ্যে এই তথ্যসমূহ সংগ্রহ করতে পারবে ইত্যাদিরও চিন্তা ভাবনা করা হয় এই স্তরে।

গ) তথ্যের সমন্বয়সাধনঃ এই স্তরে গৃহীত সমস্ত তথ্য সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে ক্লায়েন্টের সমস্যার স্বরূপট উদঘাটিত করা হয়।

D: Decision making (সিদ্ধান্ত গ্রহণ): ক্লায়েন্ট কেন কাউন্সেলিং-এর জন্য এলেন সে বিষয়ে যখন কাউন্সলর সমস্ত তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হলেন এবং ক্লায়েন্টও সমস্যার রূপরেখা বুঝতে পেরে তা সমাধানে তৎপর হলেন, তখন কাউন্সিলর ও ক্লায়েন্টের যৌথ উদ্যোগে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা তৈরি হবে। সমস্যা সমাধানের স্তরসমূহ নিম্নরুপঃ

ক) সম্ভাব্য সকল সমাধানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও নথিভুক্তকরনঃ ক্লায়েন্ট ও কাউন্সিলর ব্রেইনস্টর্মিং-এর মাধ্যমে যতরকম সমাধান সূত্র বের করা যায় তার চেষ্টা করবেন। অবশ্য ক্লায়েন্টকে এ ব্যাপারে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। সমস্যা সমাধানের সূত্রসমূহ নথিভুক্তকরণের সময় এমন কোনো সমাধানসূত্র বাদ দেওয়া চলবেনা যা প্রথমদৃষ্টিতে মনে হবে যেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

খ) এ স্তরে কাউন্সিলরের পরামর্শ অনুযায়ী ক্লায়েন্ট প্রতিটি সমাধানের পথ কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তা খতিয়ে দেখবেন। এ সময় ক্লায়েন্টের কাছে কিছু কিছু পথ জটিল মনে হতে পারে আবার কিছু কিছু উপায় বাস্তবে প্রয়োগ করা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হবে। তারপরেও সবগুলো সম্ভাবনা খুব যত্নসহকারে যাচাই করে দেখতে হবে।

গ) ক্লায়েন্ট কাউন্সিলরের পরামর্শ অনুযায়ী এবার সমাধানের উপায় গুলোকে সহজতম থেকে কঠিনতম ক্রম পর্যায়ে সাজাবেন। এরপর সবচেয়ে সুবিধাজনক একটি সমাধানের পথ স্থির করা গেলে সেটি কতটা কার্যকরী হতে পারে সেটি পর্যালোচনা করে দেখবেন। সুবিধাজনক সমাধানের প্রয়োগ ও কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষনা- উভয়ের দায়িত্ব খুবই পরিষ্কার। ক্লায়েন্টের দায়িত্ব হলো গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা এবং কাউন্সিলরের কাজ হলো কাউন্সেলিং এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষনা করা। পরবর্তীতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে ক্লায়েন্ট কাউন্সিলরের দ্বারস্থ পুনরায় হতে পারেন।

I: Implementing the Decision (সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন): কাউন্সেলিং-এর এই এপ্রোচের সর্বশেষ ধাপটি হচ্ছে গৃহীত সিদ্ধান্তের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই সেটি অনযায়ী কাজ করতে হবে, নিজেকে ট্র্যাকে রাখতে হবে এবং কতটা ভালো করেছেন তা নিয়মিত নির্ধারণ করতে হবে। এই স্তরগুলোকে আমরা অ্যাকশন, নিশ্চিতকরণ ও মূল্যায়ন বলি। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা হলে ব্যক্তিকে কাউন্সিলরের সহযোগীতা আবার নিতে হবে। কাউন্সিলর তখন সম্পূর্ন পদ্ধতিটি আবার পরীক্ষা করে দেখে সঠিক পথ খুঁজে পেতে ব্যক্তিকে সহযোগীতা করবেন। কাউন্সেলিং-এর অপর আরেকটি এপ্রোচ হলো GATHER. কাউন্সেলিং-এর মূলনীতি এক্ষেত্রেও মূলত একই।

৩.২.৩ বিভিন্ন ধরনের কাউন্সেলিং মেথডঃ

১। ফ্যামিলি বা পরিবার থেরাপি (Family Therapy): পারিবারিক থেরাপি হল এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ (সাইকোথেরাপি) যা পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগ উন্নত করতে এবং দ্বন্দ্ব সমাধান করতে সহায়তা করতে পারে।

২। হিউম্যানিষ্টিক বা মানবতামূলক (Humanistic Therapy): হিউম্যানিস্টিক থেরাপি একটি মানসিক স্বাস্থ্য পদ্ধতি যা সর্বাধিক পরিপূরক জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তির প্রকৃত নিজ সত্ত্বার গুরুত্বকে জোর দেয়। 'প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব একটা ধরন আছে পৃথিবীকে দেখার ও বুঝার'-এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এই ধরনের থেরাপি পরিচালিত হয়।

৩। মাইন্ডফুলনেস (Mindfulness)**:** মাইন্ডফুলনেস মানে হ'ল মৃদু, লালনশীল দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, শারীরিক সংবেদন এবং পার্শ্ববর্তী পরিবেশের সচেতনতা প্রতিটি মূহুর্তে বজায় রাখা। যখন আমরা মননশীলতা অনুশীলন করি, আমাদের ধারণাগুলো তখন অতীতের পুনর্বিবেচনা বা ভবিষ্যতের কল্পনা করার পরিবর্তে বর্তমান মুহূর্তে আমরা কী নিয়ে সংবেদনশীল সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করে।

৪। পারসন সেনটার্ড বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক থেরাপি (Person Centered Therapy): এক্ষেত্রে কাউন্সেলিং-এর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগিয়ে কাউন্সেলর এর দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাভাবনাকে প্রধান্য না দিয়ে ব্যক্তি বা সেবাগ্রহীতা কিভাবে নিজেকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করে সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তি কেন্দ্রিক থেরাপি বা কাউন্সেলিং এমন একটি কৌশল যেখানে ব্যক্তিকে একজন এক্সপার্ট হিসেবে দেখা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ইনফরমশন শিট ২ এ।

৫। প্রাইমাল বা প্রাথমিক/আদিম থেরাপি (Primal Therapy):

সাইকোথেরাপির একটি ফর্ম যা রোগীর জীবনের শুরুর দিকের আবেগগত অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং শৈশবকালীন দুর্ভোগের মৌখিক প্রকাশকে উৎসাহ দেয়। সাধারণত খালি চেয়ার ব্যবহার করে বা অন্য কোনোওভাবে যেই অভিভাবকরে প্রতি তার ক্রোধ বিদ্যমান আছে সেই অভিভাবককে কাল্পনিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করানোর মাধ্যমে এটি করা হয়।

৩.২.৪ একজন ভালো কাউন্সিলরের গুনাবলি:

- আন্তরিক ও যত্নশীল ব্যবহার
- দায়িত্বশীলতা, সততা
- পক্ষপাতহীন মনোভাব
- আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মসচেতনতা
- ইতিবাচক জীবনধারা, খোলামন
- অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল
- উষ্ণ আন্তরিকতা, নমনীয়তা, সহানুভূতিশীলতা

৩.২.৫ ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং

কাউন্সেলিং-এর প্রাথমিক ধারণা নেয়ার পরে এখন আমাদেরকে এর কিছু ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে একজন কেয়ারগিভারকে অনেকের সাথে কাজ করতে হয়। কেয়ারগিভার সহকর্মী, ডাক্তার, নার্স, কেয়ার সুপারভাইজার বা ইনচার্জ- এই লিষ্টটি হতে পারে অনেক লম্বা। কেয়ারগিভারের প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে প্রয়োজন ও সুযোগ পাওয়া গেলে কাউন্সেলিং করার প্রয়োজন হতে পারে যেকোনো সময়ে। মূলত

কেয়ারগিভারের কাজের বা সেবা প্রদানের সামগ্রিক কাজের একটি অন্তর্নিহিত অংশ হচ্ছে কার্যকর যোগাযোগ, রোগীকে অনুপ্রেরনা যোগানো ও কাউন্সেলিং করা। বয়স্ক ব্যক্তিটি পরিবার বা নার্সিং হোম যেখানেই সেবা নিয়ে থাকুক না কেনো, এই কয়েকটি বিষয় প্রায় প্রতিনিয়তই করতে হয়। প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করা থেকে শুরু করে বড় ধরনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা; যেকোনো প্রয়োজনে কাউন্সেলিং একটি অতি প্রয়োজনীয় লাইফ স্কিল। এই ইনফরমেশন শীটে ক্লায়েন্ট বা ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৩.২.৫.১ ক্লায়েন্ট কাউন্সেলিং বলতে কি বুঝায়?

আমরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছি যে ক্লায়েন্ট বলতে মূলত কি বুঝায়। এক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট কাউন্সেলিং বলতে আমাদের সেবাগ্রহীতা ব্যক্তিকে তার প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কাজে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সেবাকে বুঝিয়ে থাকে।

১। ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাউন্সেলিং

ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাউন্সেলিং আমাদের ক্ষেত্রে মূলত বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়ে পরিচালিত হয় যেটা বস্তুত একধরনে টক বা কথা বলা থেরাপী। এই পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুনগত বিষয়ের উপর দন্ডায়মান আর সেটি হচ্ছে, নিঃশর্ত ইতিবাচক মনোভাব। কোনোভাবেই রোগীকে বিচার বা বিশ্লেষণ করা যাবে না অর্থাৎ, ব্যক্তিকে ঠিক তার মত করেই গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কেয়ারগিভারের একটি গুরুদায়িত্ব হচ্ছে রোগীর কাছে নিজেকে একটি পরিপূর্ণ আস্থা ও সহযোগীতার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা। রোগীর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারলে সেবা প্রদান করার কাজটি অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। এর কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরুপঃ

- ব্যক্তিগত বৃদ্ধি ও বিকাশ ত্বরান্বিত করা
- উদ্বেগানুভুতি দুর করা বা প্রশমিত করা
- আত্মবিশ্বাস ও খোলামনে কথা বলার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা
- নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি করা

ব্যক্তি কেন্দ্রিক থেরাপি বা কাউন্সেলিং এমন একটি কৌশল যেখানে ব্যক্তিকে একজন এক্সপার্ট হিসেবে দেখা হয়।

ব্যক্তি কেন্দ্রিক কাউন্সেলিং-এর মূল শর্ত তিনটিঃ

- কাউন্সিলর সেবাগ্রহীতের সাথে ঐকমতে পৌঁছাবে।
- থেরাপিস্ট ক্লায়েন্টকে নিঃশর্তভাবে ইতিবাচক সম্মান প্রদর্শন করবে।
- থেরাপিস্ট ক্লায়েন্টের প্রতি একটি সহানুভুতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দেখাবে।

একজন ক্লায়েন্টের "পুরোপুরি কার্যক্ষম ব্যক্তি" হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা একজন থেরাপিস্টের কাজ। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এই ধারণাকে যে, একজন ব্যক্তি নিজের বাস্তবতা অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট যেখান

থেকে তাকে আত্ম সচেতনতার একটি জায়গায় পৌছানো সম্ভব। ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো খুবই কার্যকরীঃ

- রোগীকে কোনো প্রকার আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করা যাবে না।
- নিঃশর্ত ইতিবাচক মনোভাব মনোভাব প্রদর্শন কর।
- রোগীকে নিজের সত্যিকারের ব্যক্তিসত্তা উন্মোচনা সহায়তা কর।
- কথা বলা ও শোনার ক্ষেত্রে সহনশীলতা প্রদর্শন কর।
- নেতিবাচক আবেগগুলোকে সাদরে গ্রহণ কর
- খুবই সক্রিয়ভাবে রোগীর কথা শুনতে হবে।
- সঠিক বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বজায় রাখুন।
- রোগীর কথার অর্থ না পাল্টিয়ে পুনরাবৃত্তি কর।
- রোগীর কথা আপনি যে বুঝেছেন সেটা তাকে বুঝতে দিন। এক্ষেত্রে তার কথাটিকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতে পারেন, যেটাকে বলা হয় প্যারাফ্রেস করা।
- উচ্চস্বরে মোটেও কথা বলা যাবে না। কথা সমান তালে বলতে চেষ্টা কর ও এর মাধ্যমে সহযোগীতামূলক মনোভাব ফুটিয়ে তুলুন।
- ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন কর, অর্থাৎ, রোগীকে তার মনের কথা সম্পূর্নরূপে বলতে দিন।
- শোনার আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। রোগীকে বুঝতে দিন যে আপনি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন এবং শেষ পর্যন্ত শুনতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে ভার্বাল ও নন-ভার্বাল উভয়ভাবেই প্রকাশ করা যায়। যেমন, মৌখিক প্রকাশের জন্য বলতে পারেন যে, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি বা শুনতে ভালো লাগছে অথবা, আপনার কোনো অসুবিধা না থাকলে আপনি বলতে পারেন, আমি শুনতে ইচ্ছুক। অনেক সময় আমরা শুধু মাথা নাড়িয়েও আমাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারি যেটি নন-ভার্বাল কৌশলের একটি উদাহরণ।

৩.২.৫.২ ফ্যামিলি বা পরিবার কাউন্সেলিং

সমস্যা সমাধানের জন্য বয়স্ক ব্যক্তিটির তার পরিবারের সহায়তা লাগাটা খুবই স্বাভাবিক। কেয়ারগিভার একজন ব্যক্তি অথবা পুরো পরিবার, যেই সেটিংসেই কাজ করুক না কেনো, কাউন্সেলিং দক্ষতা খুবই কার্যকরী। ফ্যামিলি কাউন্সেলিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একজন কেয়ারগিভার একটি পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যদকে একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

ফ্যামিলি কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে মাথায় রাখতে হয়ঃ

- কনসার্ন ফ্যামিলি মেমবার সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা, এক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তি ও তার বিভিন্ন সমস্যাকে বুঝানো হয়েছে।
- বয়স্ক ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমগ্র পরিবারের ভারসম্য ও সামর্থ্য
- পরিবারের আকার ও সদস্য সংখ্যা

- প্রতিটি মেম্বারের ভূমিকা রাখার যায়গা
- পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্ববোধ

ফ্যামিলি কাউন্সেলিং-এর প্রকারভেদঃ

ফ্যামিলি কাউন্সেলিংকে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রকারে আলোচনা করা যেতে পারেঃ

ক। সম্মিলিত ফ্যামিলি কাউন্সেলিং: এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের লক্ষে কেয়ারগিভার পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নিয়ে একসাথে সেশন পরিচালনা করেন, যার মূল লক্ষ হচ্ছে বয়স্ক ব্যক্তির বিষয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উৎকণ্ঠা চিহ্নিত করা ও তা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

খ। কনকারেন্ট বা সমসাময়িক ফ্যামিলি কাউন্সেলিং: এক্ষেত্রে কেয়ারগিভারকে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বসতে হয়।

গ। সহযোগিতামূলক কাউন্সেলিং: এক্ষেত্রে পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন কেয়ারগিভারের সাথে কথা বলেন ও কেয়ারগিভাররা পরবর্তীতে একসাথে আলোচনা করেন। এ পদ্ধতিটি ছোট বা মাঝারী আকারের পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ফ্যামিলি কাউন্সেলিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- পরিবারের সকল সদস্য ও বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা।
- প্রতিটি সদস্যের স্বাধীনভাবে কিন্তু সমন্বয়ের সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা
- বয়স্ক ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো ভাগাভাগি করে নেয়া
- বয়স্ক ব্যক্তির বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মনমালিন্য দূর করা
- বয়স্ক ব্যক্তির বেদনা ও উদ্বীগ্নতা হ্রাস করে উন্নত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

বয়স্ক ব্যক্তি ও তার পরিবারকে কাউন্সেলিংয়ের নিয়মঃ

নিচে একটি সিনারিও উল্লেখ করা হলো যেখানে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় রোগীকে এবং তার পরিবারকে উপদেশ এবং বল প্রয়োগ করার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছেঃ

> সকালের শিফটে হোম ভিজিটের সময় কেয়ারগিভার রাহেলা দেখলো যে, তার রোগী জনাব জলিল সাহেব রাতের ঔষুধ সেবন করেন নি এবং উনি মাঝে মাঝেই এমনটি করে থাকেন। যে কারণে রাহেলা একটু রুক্ষভাবে রোগীকে তার ছেলের বউয়ের সামনেই গজ গজ করে বলতে লাগলো, "আপনি রাতের ঔষুধ খান নি কেনো? বাসার লোকেরাও কি একটু খেয়াল করতে পারলোনা বিষয়টা?"
>
> ছেলের বউ 'আসলে খেয়াল করিনি' এই কথা বলাতে রাহেলা বলেই ফেললো যে, "এই জন্যেই আপনাদেরকে বলেছি উনাকে আমাদের নার্সিং হোমে রাখতে। আমাদের ওখানে রাখলে এই সমস্যা আর হতোনা। প্রায়ই উনার রাতের ঔষধ খাওয়া হয়না"।
>
> রাহেলা এই ভাবে ব্যাখ্যা করাতে রোগীর ছেলের বউ একটু বিব্রত বোধ করলো। তিনি অনেকটা বিরক্ত হয়েই বললেন যে, "দেখুন উনাকে নার্সিং হোমে না দেওয়ার পিছনে আমাদের অনেক পারিবারিক কারণ আছে। আর আমরা চেষ্টা করি উনাকে বাসাতেই দেখভাল করতে"।

উপরের সিনারিও থেকে এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আমাদের উল্লেখিত কেয়ারগিভার কাউন্সেলিং-এর কৌশলগুলো সম্পর্কে মূলত কিছুই জানেনা। যদি জানতো তাহলে সে অবশ্যই নিচের সহজ নিয়মগুলো অনুসরণ করতোঃ

কাউন্সেলিং-এর সময় যে সব বিষয় মনে রাখতে হবে (বিবেচ্য বিষয়)

- **ব্যক্তির সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়াঃ** কাউন্সেলরের উচিত সেবাগ্রহীতাদের সম্মান দেখানো এবং তার বোঝার সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে তাকে গুরুত্ব দেওয়া।
- **ব্যক্তির পর্যায়ে গুরুত্ব দেয়াঃ** প্রত্যেক সেবাগ্রহীতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সে যে অবস্থানেরই হোক না কেন ব্যক্তি হিসাবে তার যে সম্মান আছে সে সম্মান তাকে দিতে হবে।
- **গোপনীয়তা রক্ষা করা:** কাউন্সেলরকে গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। একজনের সমস্যা অন্যের কাছে কখনই প্রকাশ করা যাবে না।
- **ব্যক্তিগত পছন্দঃ** কাউন্সেলরের নিজস্ব মতামত, পছন্দ, অপছন্দ কখনও সেবাগ্রহীতার উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত না। সেবাগ্রহীতাদের সমস্ত তথ্য ভালোভাবে জানিয়ে তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে যথাসম্ভব মূল্য দিতে হবে ।
- **ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি সহমর্মী হোয়াঃ** কাউন্সেলরের এমন কিছু বলা বা করা উচিত হবে না যা সেবাগ্রহীতার মনে আঘাত করে। সেবাগ্রহীতাদের অনুভূতির প্রতি (বাচনিক ও অবাচনিকভাবে) সহানুভূতি প্রদর্শন করার চেষ্টা করতে হবে।
- **ব্যক্তিগত পক্ষপাত না করা:** সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রে কাউন্সেলরের কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়।

অনুশীলনঃ

এখন যেহেতু কাউন্সেলিং-এর বেসিক বা মৌলিক নিয়ম বা উপায়গুলোকে সম্পর্কে তুমি জেনেছো, জলিল সাহেবের চিত্রটা আরেকবার কল্পনা কর এবং নিচের প্রশ্নগুলো আলোকপাত কর:

- কেয়ারগিভার রাহেলা কিভাবে তার হোম ভিজিটের উক্ত ঘটনাটির আরো ভালো সূচনা করতে পারতো?
- জলিল সাহেবের সমস্যা সঠিকভাবে বুঝার জন্য কি ধরনের মন্তব্য বা প্রশ্ন করা যেতে পারতো?
- বাড়ির অন্য সদস্যদেরকে কিভাবে আরো ভালোভাবে সংযুক্ত করা যেতে পারতো?
- দৃশ্যপটে উদীত সমস্যাটির সম্ভাব্য বিকল্প সমাধান আর কি হতে পারতো?

হোম ভিজিটে কাউন্সেলিং: কাউন্সেলিং স্বাস্থ্য সেবা দানের উপযোগী যে কোনো পরিবেশেই করা যায়। তবে হোম ভিসিটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কেয়ারগিভারের জন্য এই ধরনের সেটিংসেই মূলত বিভিন্ন ধরনের কাউন্সেলিং এর সুযোগ তৈরি হয়। হোম কেয়ারে নিয়োজিত কেয়ারগিভাররা সাধারণত একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে সেবা দান করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট একটি বাসায় নির্দিষ্টভাবে নিয়মিত যাতায়ত করেন। কাউন্সেলিং এপ্রোচ এক্ষেত্রে পুরো হোম কেয়ার সার্ভিসটাকেই সাফল্যমন্ডিত করতে পারে কেননা এক্ষেত্রে এর ফলে নিম্নোক্ত সুযোগ বা উপকারিতাগুলো তৈরি হয়ঃ

- বয়স্ক ব্যক্তি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে একটি সুসম্পর্ক তৈরি হয়, যা কিনা একটি নিরাপদ ও সহযোগীতাপূর্ণ হোম কেয়ার সার্ভিসের জন্য খুবই প্রয়োজন।
- সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে ব্যক্তি ও পরিবারকে উৎসাহ প্রদান করা যায়
- ছোটখাট অনেক ধরনের সমস্যাকে আগে ভাগেই নির্নয় ও সমাধান করা যায় বলে বড় কোনো সমস্যা পরিহার করা সম্ভব হয়
- পরিবারের অসুস্থ ব্যক্তিটির শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন বা অগ্রগতি-অবনতি খুব সহজেই নিয়মিতভাবে মনিটর করা সম্ভব হয়।

- অসুস্থ ব্যক্তিটিকে কিভাবে সহায়তা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে খোলা মেলা আলোচনা করা যায়।
- বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানাদিতে বা কর্মকান্ডে কিভাবে বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তিটিকে সংশ্লিষ্ট করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা করা যায়।

হোম ভিসিটে নিয়োজিত কেয়ারগিভার হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাতিক এবং সমগ্র পারিবারিক তথ্যের আধার। যেখান থেকে স্বাস্থ্য সেবা টীমের অন্যান্য সদস্যারা অনেক কিছুই জানতে পারেন। এছাড়াও আমরা খুব প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারি পারিবারিক পরিবেশ কিভাবে একজন বয়স্ক ব্যক্তির আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবারের কি ধরনের সুযোগ বা সামর্থ্য আছে? পরিবারে কারা কারা বসবাস করছেন? তারা কি ব্যক্তির সেবায় কোনোরূপ সহায়তা করছেন নাকি উল্টো সমস্যার কারণ হয়ে উঠছেন প্রভৃতি।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি যখন নিজের বাড়িতে বসবাস করে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে থাকেন তখন তিনি সাধারণত অনেক বেশি ভালো ও নিরাপদ বোধ করেন। কেয়ারগিভার দেখতে পারবে যে ব্যক্তি তার নিজের বাড়িতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামনে কথা বলতে হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে থাকাকালীন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করছেন। হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে তারা পরিবেশগত নানাবিধ কারণে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে পারেন অথবা তাদের গোপন কথা অন্যের কানে চলে যাওয়ার আশংকা বোধ করতে পারেন। মানুষটি তার নিজের বাড়িতে কথা বলতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেন কেননা তিনি নিরাপদ বোধ করছেন। একজন বয়স্ক ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় অনেক বেশি ভয় পেয়ে থাকতে পারেন। তাই, সেবা প্রদান ও কাইন্সেলিং করার পূর্বে একজন কেয়ারগিভারের উচিৎ হবে অবশ্যই তার আস্থা অর্জন করা এবং তাকে সর্বাত্মনভাবে নিরাপদ বোধ করতে সহায়তা করা।

কিছু কিছু পদ্ধতি বা কাজের পূর্নাজ্ঞ প্রদর্শন হোম সেটিংসেই ভালোভাবে দেখানো সম্ভব। যেমন পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়। আপনি হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে হয়তোবা ব্যালেন্সড ডায়েট হিসেবে রোগীকে কাপে করে নিয়মিত গরুর দুধ পান করার জন্য বলতে পারেন, কিন্তু সব পরিবেশে সেটি অর্জন বা সম্পাদন করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। কিন্তু, নিজের বাসায় এধরনের প্রাত্যহিক কিংবা বিশেষ প্রয়োজন সহজেই সম্পাদন করা যায়।

একটি নমুনা কাউন্সেলিং সেশন বা অধিবেশনঃ এখানে কাউন্সেলিং সেবার প্রয়োজন এমন একটি সমস্যার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

> "একজন কেয়ারগিভারকে তার নিয়োগকর্তা হোম কেয়ারের একজন ক্লায়েন্টের ছেলের সাথে কথা বলার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। নিয়োগকর্তা কেয়ারগিভারকে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো সরবরাহ করেনঃ ছেলেটির বয়স ২৩ বছর এবং সে এই সালে তার ভার্সিটির শেষ বর্ষে। ছেলেটি যদিও মেধাবী ছাত্র, ইদানীং সেই প্রায়সই তার ভার্সিটিতে যায়না বা দেরি করে যায় এবং লেখাপড়ার অমনোযোগীতার কারণে তার কোর্স কো-অর্ডিনেটর তার মায়ের কাছে তার উদ্বিগ্নতার কথা জানান। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজে কেয়ারগিভারের সহায়তা নেয়া শারীরিকভাবে অসুস্থ মা বিষয়টি জানতে পেরে খুবই দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং আশঙ্কা করলেন যে তার ছেলে হয়তোবা ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষায় পাস করবেনা। এমতাবস্থায় তিনি চাচ্ছেন তার ছেলেকে কাউন্সেলিং সেবার মাধ্যমে পুর্বের অবস্থায় নিয়ে যেতে কেয়ারগিভারের সহায়তা।"

এরপরে আলোচনায় দেখা যাবে যে এই পরিস্থিতিতে আমাদের কেয়ারগিভার ঠিক কি করতে পারেন।

নির্দেশনাঃ তিনি যা বলেন তার প্রতি মনোযোগ দাও। খেয়াল কর যে ছেলেটিকে নির্দ্বিধায় খোলা মনে কথা বলা শুরু করতে উৎসাহ দিতে গিয়ে আমাদের কেয়ারগিভার কি কি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। তিনি প্রথমেই ছেলেটিকে শুভেচ্ছা জানান এবং একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ছেলেটি যা বলে সেটি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। যতক্ষণ না এই কেয়ারগিভার ছেলেটির সমস্যার পিছনের পুরো কাহিনীটি শোনেন ততক্ষণ কোনোও পরামর্শ দেওয়া হয়নি। এছাড়াও কেয়ারগিভার ছেলেটিকে সমস্যাটি সম্পর্কে সাবধানতার সাথে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে যাতে সে কারণটি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং নিজের জন্য কিছু সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আসতে পারে। মনে রাখবেন যে সমস্যা সমাধান বিকাশে অংশ নিলে ব্যক্তি তার সমস্যা সমাধানে আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

চাইলে ক্লাসের অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীর সাথে এই কাউন্সেলিং সেশনটি একটি ছোট নাটক হিসাবে অনুশীলন করা যেতে পারে। সবাই একবারে আলোচনাটি পড়ে নিয়ে দু'জন স্বেচ্ছাসেবক খুঁজে ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে একজন কেয়ারগিভারের অংশটি জোরে জোরে পড়বে, অন্যজন ছেলেটি কী বলবে তা জোরে জোরে পড়বে। কাউন্সেলিং অনুশীলনের জন্য এটি একটি ভালো উপায় হতে পারে।

কেয়ারগিভার:	সুপ্রভাত। আমি আশা করি আপনার এবং আপনার মায়ের সবকিছু ভালো চলছে।
ছেলেঃ	ধন্যবাদ। মায়ের কিছুটা কোমরের ব্যথা আছে, তা বাদে সবাই ভালো আছি।
কেয়ারগিভার:	ভালো। আপনার মায়ের কোমরের ব্যথা আগের চেয়ে কমছে। নতুন শিডিওলে ফিজিওথেরাপীটা অনেক ভালো কাজ করছে।
ছেলেঃ	জ্বি। আমারও তাই মনে হচ্ছে। ভালো।
কেয়ারগিভার:	মনে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশনে এটি আপনার শেষ বছর। আপনার পড়াশোনা কেমন চলছে?
ছেলেঃ	জ্বি। আমি সাধারণত ভার্সিটিতে ভালোই করছি, তবে আপনি জানেন তো শেষ বছরটি সবসময়ই কঠিন!
কেয়ারগিভার:	ইদানীং আপনার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন যাচ্ছে?
ছেলেঃ	আসলে, আমি কিছুটা দুর্বল বোধ করছি এবং ইদানীং খুব মাথাব্যথা করছে। আমি ধারণা করছিলাম এটি সম্ভবত কোভিড১৯, তবে আমি নিশ্চিত নই।
কেয়ারগিভার:	এ বছর তো করোনার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আপনি করোনার পরীক্ষা করিয়েছেন?
ছেলেঃ	আসলে এখনো করা হয়নি।
কেয়ারগিভার:	আপনার কি আর কোনো লক্ষণবা উপসর্গ আছে বলে অনুভব করছেন?
ছেলেঃ	না, আসলে আর কোনো সমস্যা অনুভব করছিনা।
কেয়ারগিভার:	ভালো। করোনা আসলে সাধারণ ফ্লুয়ের মতই যদি না বড় ধরনের কোনো উপসর্গ না থাকে। তবুও সতর্ক থাকা ভালো। আপনি কোনো ওষুধ খাচ্ছেন?
ছেলেঃ	আমি এখন পর্যন্ত প্রায় তিনবার পেইনকিলার ট্যাবলেট নিয়েছি, তবে আমি কখনই পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠছি বলে মনে হচ্ছেনা।
কেয়ারগিভার:	এসব ক্ষেত্রে ওষধ প্রয়োজনীয়, তবে একমাত্র ওষুধই আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারে না। আপনি ভালোভাবে খাওয়া-দাওয়া করছেন তো?
ছেলেঃ	মনে তো হচ্ছে করছি।

কেয়ারগিভার:	দয়া করে বলুন, গত কয়েকদিন ধরে আপনি কী খাচ্ছেন?
ছেলেঃ	আমার মা সবসময় আমাদের একটি ভালো প্রাতঃরাশ করতে বলেন, তাই আমি নিজের এবং ভাইদের জন্য রুটি ও সকালের নাস্তা তৈরি করি। তারপরেও আমি সবসময় ফলমূল কেনার চেষ্টা করি।
কেয়ারগিভার:	আপনি বলছেন যে আপনি কিছুটা রান্না এবং শপিং করেন?
ছেলেঃ	এই কাজগুলো করা খুবই দরকার। আপনি তো জানেন যে কয়েক বছর আগে আমার মা তার পিঠে আঘাত পায় যা এখন তাকে অনেক ঝামেলা দিচ্ছে। ডাক্তার বলছেন যে তিনি বয়স্ক হয়ে যাচ্ছেন এবং আরও অনেক কিছু এ অবস্থায় চাইলেও করা যায় না। তারা তার ব্যথা-উপশম করার জন্য চিকিৎসা দেয়, তবে চিকিৎসক আমাদের সকল ভাইদেরকে বলেছিলেন যে কোনোওভাবে মাকে সাহায্য করা ও ঘরের টুকিটাকি কাজ করা। যেহেতু আমি সবার বড়, বেশিরভাগ দায় আমার উপরই পড়ে।
কেয়ারগিভার:	আপনি আর কি কি কাজ করছেন সংসারে?
ছেলেঃ	আমি সন্ধ্যার খাবার প্রস্তুত করি। আমার ছোট ভাইকে ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য পেয়েছি, তবে সে এটি ভালোভাবে করতে পারছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হয় ও তাকে সহায়তা করতে হয়।
কেয়ারগিভার:	এই সমস্ত কাজের ফাকে আপনি কখন, কিভাবে পড়া-লেখার জন্য সময় বের করেন?
ছেলেঃ	এটি একটি সমস্যা। কাজকর্ম না হওয়া এবং ছোট ভাই দুটি রাতে ঘুমাতে না যাওয়া পর্যন্ত আমি সত্যিকার অর্থে ভালোভাবে সুযোগ করে উঠতে আসলে পারিনা। তারপরেও আমি যত ঘণ্টা সম্ভব পড়ি, বা টেবিলে ঘুমিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পড়া শুনা করি।
কেয়ারগিভার:	আপনি আসলে কোথায় পড়াশোনা করেন?
ছেলেঃ	আপনি তো জানেন যে, আমাদের বাসায় থাকার জন্য কেবল দুটি ঘর রয়েছে। একটিতে মা থাকেন। অন্যটি খাওয়ার জন্য এবং বাচ্চাদের শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই কারণেই ছোটদের ঘুম না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার পড়াশোনায় মন দিতে পারি না। আমি এমনকি বাতিটি খুব বেশি উজ্জ্বল না করার চেষ্টা করি যাতে তারা জেগে না উঠে।
কেয়ারগিভার:	আমি দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসগুলো এখন আপনার পক্ষে সত্যিই কঠিন। আপনি যা বলেছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট যে আপনি অনেক চাপের মধ্যে রয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি যে আপনার পরিবারের জন্য অবশ্যই আপনার দায়িত্ব পালন করা উচিত। তবে আমার মনে হচ্ছে যে এই অতিরিক্ত কাজ এবং গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা আপনার দুর্বলতা এবং মাথা ব্যথার অনুভূতিতে ভূমিকা রেখেছে। আপনার কি মনে হচ্ছে?
ছেলেঃ	আমার ধারণা আমি এর আগে এটা নিয়ে কখনই ভাবিনি, তবে মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক। বোঝা যায়। তবে আমি চিন্তিত, যেমনটি আপনি বলেছিলেন। আমাকে আমার বাড়িতে কাজ করতে হবে। আমি কীভাবে এই সমস্যাটি মোকাবেলা করতে পারি?
কেয়ারগিভার:	প্রথমত, আপনি আসলে কী অর্জন করতে চান?
ছেলেঃ	আমি এই বছর আমার পরীক্ষায় পাস করতে চাই, তাই আমার সম্ভবত আরও বেশী পড়াশোনা করা প্রয়োজন।
কেয়ারগিভার:	এবং আরও অধ্যয়ন করতে সক্ষম হতে আপনাকে সুস্থ থাকতে হবে এবং বিশ্রাম নিতে হবে।
ছেলেঃ	এটি সত্য, তাই আরও বিশ্রাম কীভাবে নিব সেটি আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

কেয়ারগিভার:	আপনি কখন অধ্যয়নের জন্য আরও সময় পেতে পারেন সে সম্পর্কে কি মনে করছেন? আপনি বলেছেন আপনি সন্ধ্যায় খাবার প্রস্তুত করেন এবং বাজার ঘাট করেন। আপনি ভার্সিটি ছাড়ার সময় এবং খাবার প্রস্তুত করার সময়টির মধ্যে কী করেন?
ছেলেঃ	সাধারণত ভার্সিটির পরে আমি সন্ধ্যার খাবারের প্রয়োজন হতে পারে এমন কিছু কেনাকাটা করতে বাজারে যাই। সেখানে আমি একটু বন্ধুদের সাথে দেখা করি এবং আমরা কিছুক্ষণ কথা বলি এবং একটু আড্ডা দেই। তারপর যখন দেখি সূর্য ডুবে যাচ্ছে তখন আমি বাড়িতে যাই।
কেয়ারগিভার:	আপনার শরীর ও মন ভালো রাখতে এগুলো দরকার। তবে আপনি কি মনে করেন যে সপ্তাহে দুদিন একটু ভালোভাবে পড়ার জন্য ভার্সিটিতে কিছুটা সময় ব্যয় করা সম্ভব? রাতের বেলা হালকা আলোতে পড়ার চেয়ে দিনের আলোতে পড়া আপনার চোখের জন্যেও ভালো।
ছেলেঃ	এটা বোধগম্য। যদিও আমি সন্ধায় বন্ধুদের সাথে একটু আড্ডা দিতে পছন্দ করি।
কেয়ারগিভার:	আমি বলছি না যে আপনার বন্ধুদের সাথে আড্ডা বন্ধ করা উচিত, কারণ এটি আপনার জন্য ভালো। তবে আপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী তা আপনাকে ভাবতে হবে। আপনি আপনার ভার্সিটির কাজ নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না। আপনার নিজের পড়াশুনার জন্য কি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তা আপনার নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন যেমন আপনি আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন।
ছেলেঃ	আমি কখনই সেভাবে ভাবিনি, তবে আপনি ঠিক বলেছেন, আমি আমার পড়াশুনাকে গুরুত্ব দিই এবং যদি আমার স্বাস্থ্য ভালো না থাকে তবে আমি ভার্সিটিতে ভালো করতে পারি না। আমি নিশ্চিত যে আমি আরও কিছু ঘণ্টা ভার্সিটির ক্লাসের পরে থাকতে পারি এবং আমাদের লাইব্রেরিতে পড়তে পারি। তখন কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না, বরং শিক্ষকরা ও ক্লাসমেটরা আমাকে পড়াশুনায় সাহায্য করতে পারে। আমার যে কোনোও প্রশ্নে তারা আমাকে সহায়তা করতে পারে। আমার বন্ধুরা আমাকে কেবল এক ঘণ্টার জন্য খুব বেশী মিস করবে না, তাই আমি পরে তাদের সাথে যোগ দিতে পারি। আমি আশা করি লাইব্রেরিতে থাকতে চাইলে তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবেনা।
কেয়ারগিভার:	আপনার বন্ধুরা কী আপনার বাড়ির সমস্যাগুলো বোঝে?
ছেলেঃ	অবশ্যই, তারা সবসময় আমার মায়ের খোজ-খবর নেয় এবং তিনি কেমন আছেন জানতে মাঝে মাঝে বাড়িতেও আসে। আমার ধারণা তারা আমার সাথে ঠাট্টা করবে না এবং বুঝবে।
কেয়ারগিভার:	এখন সপ্তাহান্ত সম্পর্কে। আপনি কি পড়াশোনার জন্য সময় বের করতে পারবেন?
ছেলেঃ	শনিবার সকালে সাধারণত কাজকর্ম নিয়ে বাইরে যাওয়া হয়। এবং তার উপর ঘরটি কখনও শান্ত থাকে না। ছোট বাচ্চারা সবসময় বাইরে চলে আসে এবং তারপরে সেখানে লোকজনও থাকে।
কেয়ারগিভার:	পড়াশোনার জন্য বাড়িতে থাকতে হবে?
ছেলেঃ	হয়তো আমি লাইব্রেরি খোলা পাবো, আর নাইলে আমি ভার্সিটির মাঠে যেতে পারি। এটি সর্বদা শান্ত থাকে। আমি কিছু স্ন্যাকস নিয়ে গাছের নীচে ছায়ায় বসে পড়তে পারি।

কেয়ারগিভার:	এটি ভালো যে আপনি এই সমস্যার এতগুলো সমাধান সম্পর্কে ভাবতে সক্ষম হয়েছেন। আপনার মা ঠিকই বলেছেন। আপনি একটি উজ্জ্বল ছেলে। এখন আমি আপনার ছোট ভাইদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাদের বয়স কত?
ছেলেঃ	আমার পরের জনের বয়স তের, এবং তারপরে দুই জন ৭ বছর, তারা জমজ।
কেয়ারগিভার:	যিনি তের বছর করছেন ভালো তিনিও কি স্কুলে -?
ছেলেঃ	সে খুব চেষ্টা করে। তার গ্রেডগুলো আমার মতো প্রায় ভালো হয়েছে। সে সম্ভবত আরও ভালো করতে পারে।
কেয়ারগিভার:	যখন আপনার মায়ের পিঠে সমস্যা শুরু হয়েছিল তখন আপনার বয়স কত ছিল?
ছেলেঃ	প্রায় চৌদ্দ।
কেয়ারগিভার:	আর আপনাকে সেই বয়স থেকেই সমস্ত কাজ শুরু করতে হয়েছিলো?
ছেলেঃ	জ্বি।
কেয়ারগিভার:	আমি কেবল ভাবছিলাম যে আপনার ভাইটিও যদি আপনার মত মেধাবী ছেলে হয় এবং যেহেতু সে প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সী, সম্ভবত সে বাড়ির আরও বেশী দায়িত্ব নেয়া শুরু করতে পারে। আপনি এ ব্যপারে কী ভাবছেন?
ছেলেঃ	আমি সবসময় তাকে খুব অল্প বয়সী বলেই ভেবেছি। তবে, আমি যদি তার বয়সে কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারি আমি নিশ্চিত যে সেও সামলে নিতে পারবে। সম্ভবত আমরা রান্না এবং অন্যান্য কাজ ভাগাভাগি করে নিতে পারি। আমার পক্ষে আরও বিশ্রাম এবং অধ্যয়নের জন্য আরও সময় পাওয়ার এটি অন্য উপায়।
কেয়ারগিভার:	উল্লিখিত সমস্ত বিকল্প সমাধান মাথায় রেখে আমি নিশ্চিত যে আপনার পড়াশোনা নিয়ে আর কোনোও সমস্যা হবে না তবে আপনি বা আপনার পরিবারের কোনোও সদস্যের সমস্যা থাকলে দয়া করে আমার কাছে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। এখন, আপনি চলে যাওয়ার আগে দয়া করে আপনার সমস্যাগুলো সমাধান করতে আপনি যা করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে আমাকে মনে করিয়ে দিন। এটি আমাদের নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে যে আমরা কোনোও কিছুই ভুলে যাইনি এবং আমরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে আমরা সন্তুষ্ট।
ছেলেঃ	প্রথমে আমার আরও বিশ্রাম নেওয়া এবং পড়াশোনার জন্য আরও ভালো সময় বের করা দরকার। আমি প্রায় এক ঘণ্টা ক্লাসের পরে থাকব যাতে আমি দিনের আলোতে পড়তে পারি। তারপর সপ্তাহান্তে আমি ভার্সিটির লাইব্রেরী বা মাঠে পড়তে যাব। বাড়িতে আমি আমার ছোট ভাইকে আমার সাথে রান্না করা এবং অন্যান্য কাজকর্ম করার জন্য সময় ভাগ করে নিবো।
কেয়ারগিভার:	ধন্যবাদ। সেটা খুব ভালো। আপনার মাকে আমার শুভেচ্ছা দিবেন।
ছেলেঃ	জ্বি অবশ্যই। আপনার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বিদায়।

মন্তব্য: এই উদাহরণে কেয়ারগিভার কখনই ধরে নেননি যে তিনি পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত ছেলেটির সমস্যা বুঝতে পেরেছেন। তিনি কখনই ছেলেটিকে পরামর্শ নিতে বাধ্য করেননি। তিনি ছেলেটিকে সর্বদা তার সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যা সমস্যাটির কারণ সম্পর্কে ছেলেটিকে সাবধানে এবং গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে সহায়তা করেছিল।

আরো কিছু কাউন্সেলিং সেশনের চর্চাঃ যে কোনোও দক্ষতার মতো, অনুশীলনের মাধ্যমে কাউন্সেলিং দক্ষতাও আরো ভালো করা সম্ভব। একেবারে কাউন্সেলিং পেশাজীবীদের মত না হলেও মোটামুটি স্বাভাবিক কিছু ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং সেবা দেওয়ার জ্ঞান ও দক্ষতা কেয়ারগিভারদের থাকাটা জরুরি। ক্লাসের আরো একজন সহপাঠী সাথে নিম্নের কেইস সিনারিওটিকে নিয়ে একটি ভূমিকাভিনয় খেলুন। আপনারা একজন কাউন্সিলর হবেন। অন্যজন হবেন সিনারিওতে উল্লেখিত একজন বয়স্ক ব্যক্তি। বাকি সহপাঠিরা শ্রোতা হবে। তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে: তাদের ভূমিকাভিনয়টি সাবধানতার সাথে দেখা এবং শেষে তারা অংশগ্রহণকারীদের কাউন্সেলিং দক্ষতার উন্নতির বিষয়ে পরামর্শ দিবেন এবং পরবর্তীতে নিজেরাও ভূমিকাভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন।

কেইস সিনারিওঃ

> **সমস্যাঃ** একটি নার্সিং হোমে চাকুরিরত একজন অভিজ্ঞ কেয়ারগিভারকে তার কেয়ার সুপারভাইজর ঐ নার্সিং হোমে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি নিতে আসা একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাথে কথা বলতে বলেছিলেন। কেয়ার সুপারভাইজার ঐ কেয়ারগিভারকে প্রবীন ব্যক্তিটি সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য শেয়ার করলো যেটা এরকমঃ ব্যক্তির বয়স ৭০ বছর এবং গত ৫ বছর ধরে উনি আর্থ্রাইটিস বা বাতের ব্যথায় ভুগছেন। এছাড়াও তিনি তীব্র কোমর ব্যথা ও মেরুদন্ডের ডিজেনারেটিভ ডিজর্ডারে ভুগছেন। ডাক্তার উনাকে বছরখানেক আগে সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিতভাবে ফিজিওথেরাপি নেয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এর পর থেকে উনি প্রায় নিয়মিতই নার্সিং হোমের জেরিয়াট্রিক সাপোর্ট প্রোগ্রামের আউটডোরে ফিজিওথেরাপি সেবা নিয়ে আসছেন। কিন্তু সম্প্রতি উনি আগের মত আর নিয়মিত আসতে চাচ্ছেন না। উপরন্তু, ব্যক্তির বড় ছেলের কাছ থেকে আপনি জানতে পারলেন যে ফিজিওথেরাপি নিতে তিনি আর একদমই আসতে চাচ্ছেন না এবং উনাকে অনেক কষ্ট করে বুঝিয়ে শুনিয়ে মাসে মাত্র দুই-একবার আনা সম্ভব হয়।

যে ব্যক্তি বয়স্ক ব্যক্তির ভূমিকা পালন করে তার জন্য পরামর্শঃ আপনাকে একজন সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তির মতো আচরণ করা উচিত। কাউন্সিলর বয়স্ক ব্যক্তির পরিবার, জীবনযাপন এবং পেশা সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারেন। নিজের সম্পর্কে একটি গল্প তৈরি কর, যাতে আপনি কাউন্সিলরকে বাস্তবসম্মত উত্তর দিতে পারেন। আপনি বয়স্ক অনেক ব্যক্তিকেই নার্সিং হোমে আসতে দেখেছেন। কখনও কখনও তারা চিন্তিত এবং নিরস হয় আবার নির্লিপ্তও হতে পারে। আপনার দেখা বয়স্ক ব্যক্তির মতোই আচরণ কর। এটি ভূমিকাটি আরও ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলবে।

কাউন্সেলিংয়ে তাড়াহড়া করা যাবেনাঃ অধিবেশনটি প্রথমে ধীরে ধীরে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রচুর অনুশীলন এবং আসল সেশন করার পরে, তোমার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। সমস্যাগুলো আরও দ্রুত বুঝতে সক্ষম হবে এবং আরও সহজে শিক্ষাগত পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারবে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মনে রাখবে কাউন্সেলিং নিম্নলিখিত চারটি পদক্ষেপকে বোঝায়:

- ক্লায়েন্টকে সমস্যাটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করা
- ক্লায়েন্টকে এটি কেন সমস্যা তা আবিষ্কার করতে সহায়তা করা।
- ক্লায়েন্টকে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলো দেখার জন্য উৎসাহ দেওয়া।
- ক্লায়েন্টকে সর্বাধিক উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করা।

এবার, এরকম আরো কিছু কেইস সিনারিও নিয়ে নিজেরা একইভাবে চর্চা করতে পারো। আবার বাস্তব কর্ম পরিবেশে শিক্ষক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় কাউন্সেলিং-এর সেশন পরিচালনা করা যেতে পারে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হ্যাল্‌থ কেয়ার টীমের ৫ জন সদস্যের নাম লিখুন।

২. ক্লায়েন্ট কাউন্সেলিং বলতে কি বুঝায়?

৩. ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাউন্সেলিং-এর শর্তগুলো লিখুন?

৪. ফ্যামিলি কাউন্সেলিং কত প্রকার ও কি কি?

৫. ক্লায়েন্ট কাউন্সেলিং কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যোগাযোগ বলতে কি বুঝায়? যোগাযোগ কত প্রকার ও কি কি?

২. বয়স্ক ব্যক্তির সাথে কিভাবে ভালোভাবে যোগাযোগ করা যায়? সংক্ষেপে লিখ।

৩. কঠিন বা স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলার উপায় কি? সংক্ষেপে লিখ।

৪. একজন ভালো কাউন্সিলরের গুনাবলী কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. যোগাযোগের মাধ্যম বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২. কার্যকর যোগাযোগ বলতে কি বুঝায়? কার্যকর যোগাযোগের উপায় কি?

৩. কাউন্সেলিং কি? এর মূলনীতি ব্যখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির কেয়ার গিভিং

Caregiving to people with special needs

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আলাদা করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সেবার জন্য পরিবেশ দরকার হয়। এক্ষেত্রে চাহিদার পরিধি অনেক ব্যাপক হতে পারে বিধায় আমরা এই অধ্যায়ে তুলনামূলক ভাবে বহুল ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখবো। এর মধ্যে মূত্রনালির ক্যাথেটার, কোলোস্টোমি ব্যাগ, নাকের নল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ অধ্যায় আমরা উল্লেখিত এই সরঞ্জামাদির কাজ, গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বিভিন্ন ধরনের মূত্রনালির ক্যাথেটারের দেখে চিনতে পারব।
- কোলোস্টোমি ব্যাগের ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- নাকের নলের সাহায্যে রোগীকে খাওয়ানোর পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে মূত্রনালির ক্যাথেটার, কোলোস্টোমি ব্যাগ, নাকের নলের কার্যাবলি, আকৃতি, কাঠামো সনাক্ত করা, কার্যাবলি উল্লেখ করা, এর ব্যবহার, গুরুত্ব ও কাজ উল্লেখ করা এবং এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারব। জবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয় সমূহ জানব।

৪.১ বিশেষ চাহিদা সেবা

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিঃ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি এমন এক ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোনো কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুঃ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলতে সেইসব শিশুদের বুঝায় যারা সমবয়সীদের তুলনায় বুদ্ধি সংবেদন, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ভাব বিনিময় ক্ষমতা ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অপরিপক্ক বা মাত্রাতিরিক্ত সংবেদনশীল। অর্থাৎ যারা সাধারণের বাইরে তারাই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির সেবাদানের মূলনীতিঃ

- প্রতিদিন বিশেষ চাহিদা উপকরণের যত্ন নেয়া,
- বিশেষ চাহিদা উপকরণ পরিষ্কার রাখা,
- বিশেষ চাহিদা উপকরণ পরিষ্কার করা।
- সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করা,
- পানি স্বল্পতা রোধ করা,
- বিশেষ চাহিদা উপকরণ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তা খেয়াল রাখা।
- বিশেষ চাহিদা উপকরণ থেকে যেন ব্যবহারকারীর কোনো ক্ষতি নাহয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা, কোনো জটিলতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা,
- বিশেষ চাহিদা উপকরণ থেকে জটিলতা সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞ প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য নিশ্চিত করা।

৪.২ ক্যাথেটার:

মুত্রনালির ক্যাথেটার সাধারণত ব্যবহার বিধির উপর ভিত্তি করে ৩ প্রকার হয়ে থাকে

১. আভ্যন্তরিন ক্যাথেটার

২. সবিরাম ব্যবহৃত ক্যাথেটার

৩. কনডম ক্যাথেটার

চিত্র ৪.১- বিভিন্ন ধরনের মুত্রনালির ক্যাথেটার

এছাড়াও গঠন উপাদানের উপর ভিত্তি করে আর ৩ ভাগে বিভক্ত

১. ধাতব

২. রাবার

৩. সিলিকন

৪.২.১ প্রয়োজনীয়তা:

- নির্দিষ্ট স্যাম্প চিকিৎসায়
- মুত্রনালি পথ বন্ধ
- গুরুতর রোগির সুবিধার্তে
- সুচারু প্রস্রাবের হিসাবের সার্থে

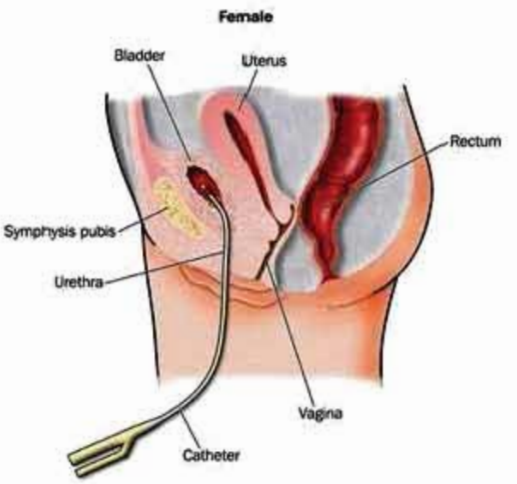

চিত্র ৪.২- মুত্রনালির ক্যাথেটারে অবস্থান

ক্যাথেটারের মাপ নির্ধারনঃ সর্বকনিষ্ঠ ৮ Fr থেকে শুরু করে সর্ববৃহৎ ৩৬ Fr পর্যন্ত হতে পারে

৪.২.২ কেয়ার গিভারের ক্যাথেটার দায়িত্বঃ

- প্রতিদিন ক্যাথেটারের যত্ন নেয়া, পরিষ্কার রাখা
- ইউরোব্যাগ খালি করা ও পরিষ্কার করা।
- পানি স্বল্পতা রোধ করা,
- ক্যাথেটার যেন টানা ও মোচড়ানো না হয়।
- জটিলতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা

ক্যাথেটার থেকে কিভাবে প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহ করা হয়?

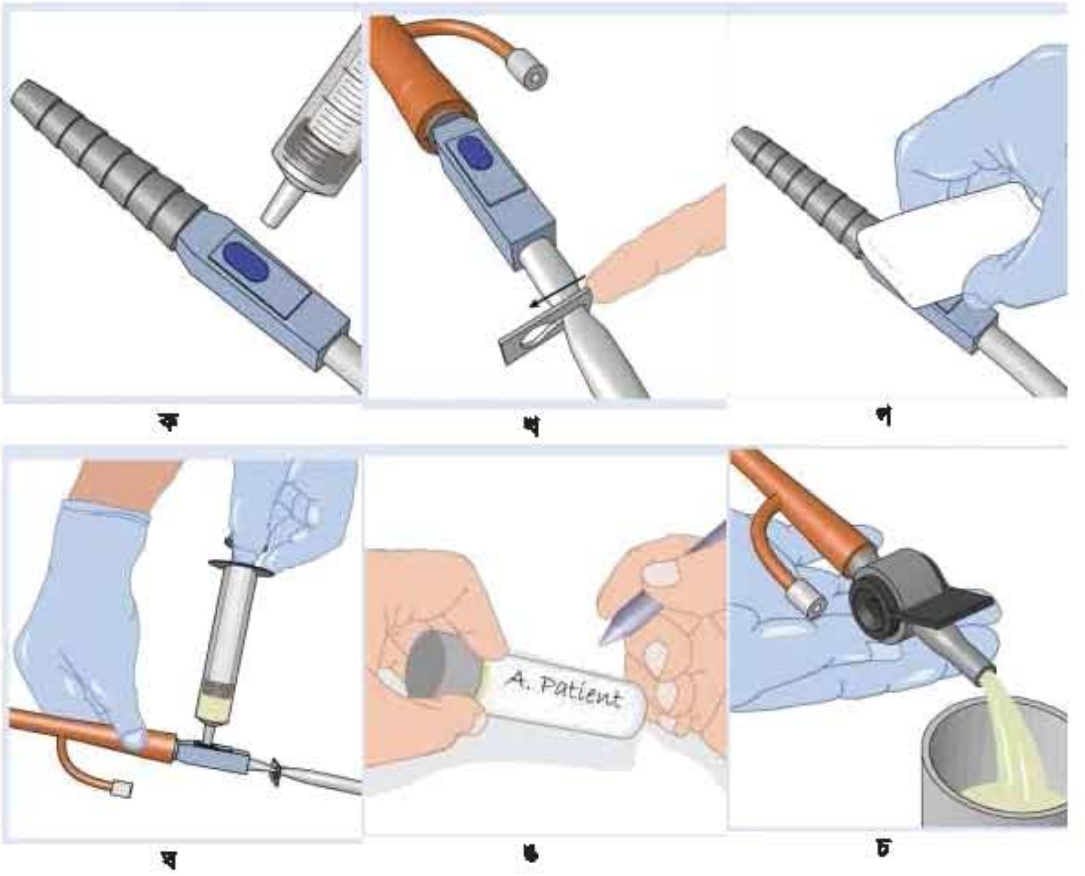

চিত্র ৪.৩- ক্যাথেটার থেকে প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি

৪.৩ কোলস্টোমি ব্যাগঃ

মলত্যাগের পথ অর্থাৎ পায়ুপথ ও মলদ্বার যখন কোনো রোগে অকার্যকর হয়ে পড়ে তখন অপারেশন করে এই অংশটি কেটে ফেলে দেওয়া হয়। অতপর খাদ্যনালীর অবশিষ্ট অংশকে পেটের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়- যেখান থেকে পায়খানা বের হতে পারে।

৪.৩.১ ব্যাগ লাগানোর নিয়ম

- কলোস্টমির স্থানটির পাশের (৭-৮ সেমি/৩ ইঞ্চি) বেশ কিছু জায়গা পানি বা স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে ফেলতে হবে।
- চামড়ার ওপর যেন কোনোরূপ ময়লা না থাকে। এরপর যে অংশটি গায়ে লেগে থাকে সেটির মাঝখানের অংশটি কলোস্টমির আকৃতি অনুযায়ী কাটতে হবে।
- আঠাল অংশের ওপর একটি পাতলা কাগজ লাগানো থাকে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। মাঝখানে কাটা অংশের ভেতর দিকে চতুর্দিকে কলোস্টমি পেস্ট লাগাতে হবে।

- এরপর ওয়েফারটি পেটের সাথে লাগিয়ে এক মিনিট চেপে রাখতে হবে। কলোস্টমি ব্যাগটি এবার ওয়েফারের সাথে চাপ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।
- এই ব্যাগটি মাঝে মাঝে খুলে বাথরুমে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- এই পুরো প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক পর্যায় একজন কলোস্টমি কেয়ার গিভার দেখিয়ে দেবেন।

যাদের স্থায়ী কলোস্টমি থাকে তাদের কখনো কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। অনেকের বহু বছর ব্যবহারের পরও কোনো সমস্যা হয় না।

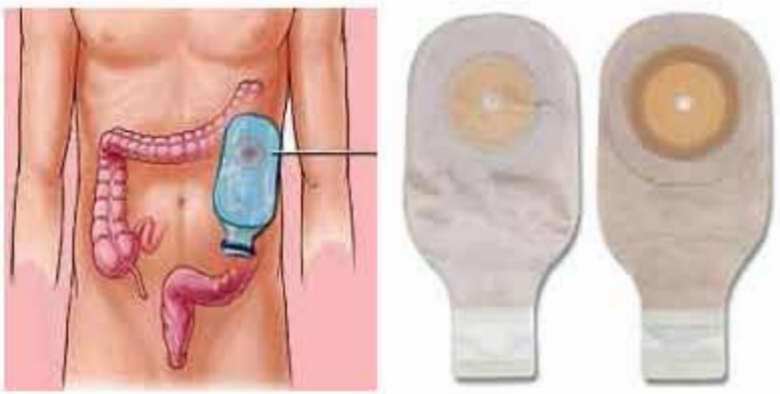

চিত্র ৪.৪- কলোস্টমি ব্যাগ ও এর অবস্থান

৪.৩.২ কলোস্টোমি ব্যাগের পরিচর্যা

ইরিগেশন পদ্ধতি:

- সাধারণত কলোস্টমি ব্যাগ পেটের ওয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখা হয়, যার মধ্যে মাঝে মধ্যে পায়খানা ও গ্যাস জমা হয়।
- এ পদ্ধতির অসুবিধা হলো দিনে তিন-চার বার এটি পরিষ্কার করতে হয়। বিশেষ ধরনের একটি ব্যাগের ভেতর দুই লিটার সিদ্ধ পানি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ভরে একটি পাইপের সাহায্যে কলোস্টমির মুখ দিয়ে খাদ্যনালীর ভেতর ঢুকাতে হয়।
- এতে পায়খানা নরম হয় এবং খাদ্যনালীর বিশেষ ধরনের প্যারিসটালটিক মুভমেন্টের মাধ্যমে ভেতরের পায়খানা বেরিয়ে আসে।
- এই কাজটি টয়লেটের ভেতর করতে হবে। পাইপের একটি অংশ 'ড্রেনেজ পাইপ' হিসেবে কাজ করে। যার মাধ্যমে পায়খানা পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং টয়লেটে চলে যাবে।
- এ কাজের জন্য একটি ব্যাগ ও একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র দরকার যাতে একটি ব্যাগ ও একটি পাইপ থাকে যার নাম ইরিগেশন সেট।
- এ কাজটি সমাধা করতে রোগীর ৩০ মিনিট লাগে।
- এতে রোগীর আগামী ২৪ ঘন্টায় স্বাভাবিক আর কোনো পায়খানা বা বায়ু এ পথে বের হয় না।

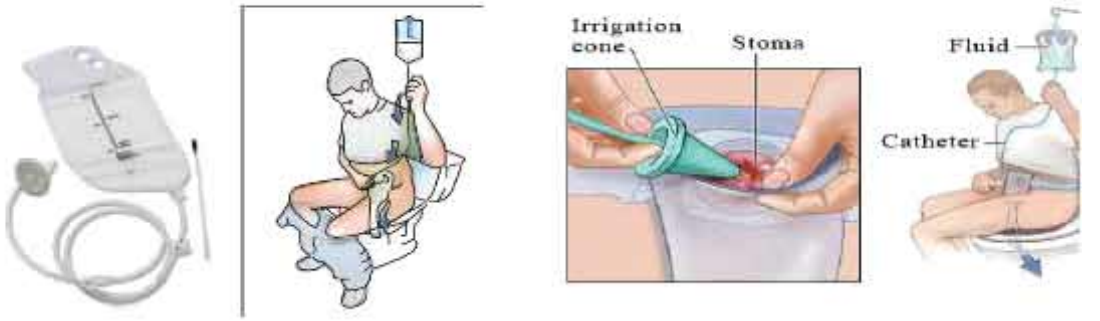

চিত্র ৪.৫- কলোস্টমি ইরিগেশন

৪.৩.৩ কেয়ার গিভারের দায়িত্বঃ

- প্রতিদিন কলোস্টোমি ব্যাগের যত্ন নেয়া,
- কলোস্টোমি ব্যাগ পরিষ্কার করা,
- কলোস্টোমি ব্যাগে যেন টান না লাগে,
- জটিলতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা

৪.৪ এন জি নল বা নাকের নলঃ

Nasogastric বা এনজি নল হল রাবার বা প্লাস্টিকের একটি নমনীয় নল যা নাক মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে গলার খাদ্যনালির মাধ্যমে এবং পেটের পাকস্থলিতে পৌছে। NG টিউব শুধুমাত্র একটি অস্থায়ী ভিত্তিতে ব্যবহার করা, হয় দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীর জন্য এনজি টিউব প্রয়োজন হয়।

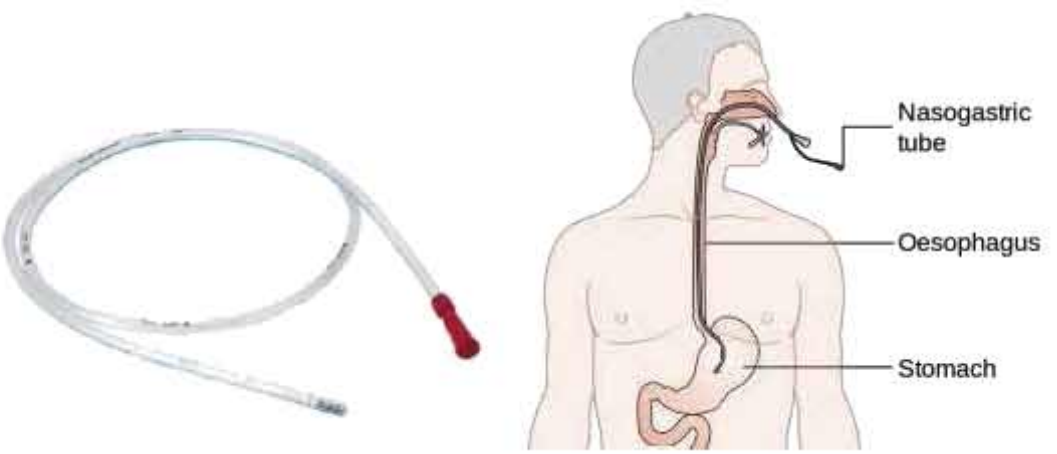

চিত্র ৪.৬- এনজি টিউব পরানো

৪.৪.১ ব্যবহার:

পুষ্টি বা ঔষধ প্রবেশের পথ

- পেট থেকে তরল বা বায়ু অপসারণ
- এক্স রে জন্য পেট রঞ্জন যোগ করা
- অস্ত্রোপচারের পরে বা অন্ত্র বিশ্রামের সময় অন্ত্রকে রক্ষা করা
- কিছু ক্ষেত্রে, যখন মুখের মাধ্যমে কঠিন খাবার সহ্য করতে না পারে

টিউবটির বাইরে চামড়ার উপর নিচে টেপ দিয়ে স্থাপন করা হবে যাতে এটি অকার্যকর হয়ে না যায়।

৪.৪.২ কেয়ার গিভারের এনজি নল দায়িত্বঃ

- প্রতিদিন এনজি নলের যত্ন নেয়া,
- প্রতিবার ব্যবহারের পর বা প্রতি ৪ ঘণ্টা পর ১০ এমএল ডিসটিল্ড ওয়াটার বা নরমাল স্যালাইন দিয়ে নলটি পরিষ্কার করা,
- ফিতা দিয়ে নাকের বাইরের অংশ মাপা ও স্থলন নির্ণয় করা। প্রতিবার খাওয়ানোর পর ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে তারপর চিৎ করে শোয়ানো যায়।
- নাকে ও ঠোটে লিপ বাম দিয়ে যত্ন নেয়া
- নাকের ফুটা ও নলের চারপাশ প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর পরিষ্কার করা।
- এনজি নলের যেন টান না লাগে লক্ষ্য রাখা,
- জটিলতার দিকে স্বজাগ দৃষ্টি রাখা
- কোনো জটিলতার দেখা দিলে অতিসত্তর নার্স বা যথাযথ ব্যক্তিকে জানানো।

৪.৪.৩ এন জি নল জটিলতা:

- নাকের রক্তপাত
- শ্বাসনালীতে খাদ্য প্রবেশ
- নাক ও ঠোটের ত্বকের শুষ্কতা
- নল বের হয়ে আসা
- নল বন্ধ হয়ে যাওয়া

জব ১| মুত্রনালীর ক্যাথেটার চিহ্নিত করে এর পরিচর্যা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামুলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্টও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- মুত্রনালীর ক্যাথেটার চহ্নিতি করা।
- মুত্রনালীর ক্যাথেটারের যত্ন নেয়া।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলি সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools & Equipment)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	ক্যাথেটার	নমুনা মতাবেক	১টি
৪)	ইউরোব্যাগ	নমুনা মতাবেক	১ টি

ক্যাথেটার চিহ্নিত ও পরিচর্যা করার কৌশলসমূহঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত ক্যাথেটার সনাক্ত করা
২. সনাক্তকৃত ক্যাথেটারের নাম পাশে লিখা
৩. ক্যাথেটারের পরিচর্যা উল্লেখ করা

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনিযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী সনাক্ত করার ক্যাথেটার বুঝে নাও;
- সেবাগ্রহিতা হলে নিজ পরিচয় দাও;
- অনুমতি নাও;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;

- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ সনাক্ত কর;
- সনাক্ত করার পর এর পরিচর্যা কর;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল চেক লিস্ট মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও

কাজের সতর্কতা: নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।
অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৩| কলোস্টোমি ব্যাগ সনাক্ত ও এর পরিচর্যা করার দক্ষতা অর্জন করণ।

পারদর্শিতার মানদন্ডঃ

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োাজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্টও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- কলোস্টোমি ব্যাগ চিহ্নিত করা।
- কলোস্টোমি ব্যাগের পরিচর্যা করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলি সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম **(PPE):** প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি **(Tools & Equipment)**

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	নমুনা ছবি বা ক্ষত	নমুনা মতাবেক	১টি
৪)	কলোস্টোমি ব্যাগ	নমুনা মতাবেক	১ টি
৫)	নরমাল স্যালাইন	নমুনা মতাবেক	১টি
৬)	বেড প্যান	কমোডের বিকল্পে	১ টি

কলোস্টোমি ব্যাগ সনাক্ত ও এর পরিচর্যা করার কৌশলঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত কলোস্টোমি ব্যাগ সনাক্ত করা
২. সনাক্তকৃত কলোস্টোমি ব্যাগ পরিষ্কার করা
৩. কলোস্টোমি ব্যাগ পুনরায় স্থাপন করা

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনিযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী সনাক্ত করার ক্যাথেটার বুঝে নাও;
- সেবাগ্রহিতা হলে নিজ পরিচয় দাও;
- অনুমতি নাও;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;
- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ সনাক্ত কর;
- সনাক্ত করার পর এর কলোস্টোমি ব্যাগ পরিষ্কার কর;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল চেক লিস্ট মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও।
- প্রয়োগ করতে পারবে।

কাজের সতর্কতা: নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।
অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৪| এন জি টিউব সনাক্ত ও এর পরিচর্যা করার দক্ষতা অর্জন করণ।

পারদর্শিতার মানদন্ডঃ

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োাজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্টও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- এনজি টিউব চিহ্নিত করা।
- এনজি টিউব পরিচর্যা করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলি সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools & Equipment)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	নমুনা ছবি বা ক্ষত	নমুনা মতাবেক	১টি
৪)	এন জি টিউব	নমুনা মতাবেক	১টি
৫)	নরমাল স্যালাইন	নমুনা মতাবেক	১টি
৬)	১০এমএল সিরিঞ্জ	ডিসপোসিবল	১টি

এন জি টিউব সনাক্ত ও এর পরিচর্যা করার কৌশলঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত এন জি টিউব সনাক্ত করা

২. সনাক্তকৃত এন জি টিউবের পরিচর্যা করা

৩. এন জি টিউব পরিষ্কার করা

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- হুকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনিযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী সনাক্ত করার ক্যাথেটার বুঝে নাও;
- সেবাগ্রহিতা হলে নিজ পরিচয় দাও;
- অনুমতি নাও;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;
- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ সনাক্ত কর;
- সনাক্ত করার পর এর কলোস্টোমি ব্যাগ পরিষ্কার কর;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল চেক লিস্ট মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- ফলাফল বিশ্লেষণ/বক্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. কেয়ার গিভারের ক্যথেতার দায়িত্বগুলো কি কি?
২. কোলোষ্টোমি ব্যাগ লাগানর নিয়মগুলো কি?
৩. এনজি নলের ব্যবহার উল্লেখ কর।
৪. এনজি নলের জটিলতা উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি বলতে কি বুঝায়?
২. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কারা?
৩. বিশেষ চাহিদার সেবা দানের ক্ষেত্রে মূলনীতি কি?
৪. কিভাবে কোলোষ্টোমি ব্যাগ পরিষ্কার করা হয়?
৫. মূত্রনালীর ক্যাথেটার কি? এর ব্যবহার উল্লেখ কর।
৬. কেয়ার গিভারের এঞ্জি নলের দায়িত্ব উল্লেখ কর।

সমাপ্ত

তৈরি পোশাক শিল্প: উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আকাশ ছোঁয়ার বাসনা

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক শিল্প হতে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় (জুন, ২০২২)। এই তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত মোট কর্মীর প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশ তৈরি পোশাক শিল্প থেকে আসে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি এবং বিপুল সম্ভাবনার এই শিল্পের মান উন্নয়ন ও শ্রমিকদের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোক্তাবৃন্দ একযোগে কাজ করছেন।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য